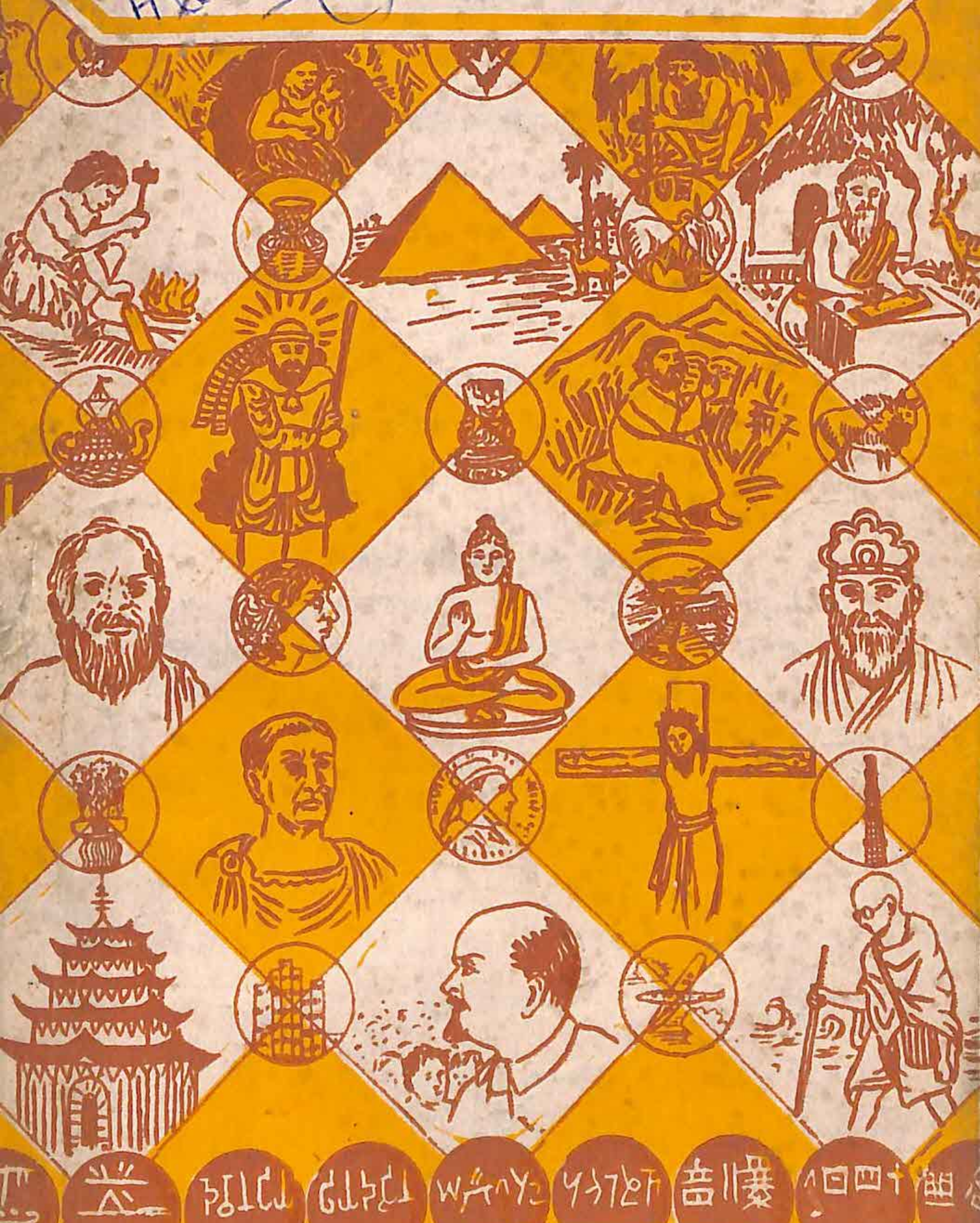
# সভ্যতার ইতিহাস





পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক নূতন পাঠ্য-সূচী অনুযায়ী অষ্টম শ্রেণীর জন্য লিখিত [ দাখিলীকৃত নং Syll./H./VIII/82/15 তাং 28.12.82 ]।

# সভ্যতার ইতিহাস

## ( আধুনিক যুগ )

[ অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্য ]

শ্রীনির্মলকুমার বসু
সদ্-গ্রন্থ-রচনার জন্য ভারত সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত
এবং বিবিধ পাঠ্য-পুস্তক রচয়িতা।

ও

শ্রীঅনিলকুমার দাশ
এম. এ. ( ইতিহাস ও ইংরাজী ), বি. টি., ডিপ্লোমা. ইন ই. এল. টি.
প্রধান শিক্ষক, খিলা গোপীমোহন শিক্ষাসদন ( উচ্চ মাধ্যমিক ), হাওড়া ;
ভূতপূর্ব শিক্ষক, চালতাখালী রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র ইনস্টিটিউশন, হাওড়া।



প্রাপ্তিস্থান :

ভারতী বুক স্টল
প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা
৬ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট; কলিকাতা-৯
ফোন ৩৪-৫১৭৮ • পিন ৭০০০০৯

প্রকাশক ঃ
শ্রীপ্রসূন দে
কলিকাতা-৭০০ ০০৯





প্রথম মুদ্রণ ঃ ডিসেম্বর, ১৯৮১
দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ জানুয়ারি, ১৯৮২
তৃতীয় মুদ্রণ ঃ জানুয়ারি, ১৯৮৫
চতুর্থ মুদ্রণ ঃ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৬

মূল্য ঃ ষোল টাকা মাত্র।

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীশুভেন্দু রায়
ঊর্ষা প্রেস
৩২এ, শ্যামপুকুর স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০০৪

## সূচীপত্র

---

## প্রথম অধ্যায়

# আধুনিক যুগ ঃ ইউরোপীয় অর্থনীতিতে পরিবর্তন

**আধুনিক যুগ ঃ** মধ্য যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল সামন্ততন্ত্র। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সামন্ততন্ত্রে ভাঙন ধরে। ভূমিদাস-প্রথার ভিত্তিতেই সামন্ততন্ত্র গড়ে উঠেছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির ফলে নূতন নূতন শহর গড়ে উঠেছিল। শহরগুলিতে ধনিক শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল। অর্থই হয়ে উঠেছিল সমাজে প্রধান শক্তি। সমাজে ধনতন্ত্রের সূচনা ও বিকাশ ঘটেছিল। এইভাবে সূচনা হয়েছিল আধুনিক যুগের। ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে অটোমান তুর্কীরা কনস্টাণ্টিনোপল অধিকার করেছিল। ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দকেই ইউরোপে আধুনিক যুগের আরম্ভকাল ব'লে ধরা হয়।

**সামন্তপ্রথার অবক্ষয় ঃ** মধ্য যুগের শেষভাগে একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে যে ক্রুশেড বা ধর্মযুদ্ধ হয়েছিল, তাতে বহু সামন্তপ্রভু নিহত হয়েছিলেন, অনেকে ক্রুশেডের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন। পরে ইউরোপে দীর্ঘকালব্যাপী যেসব যুদ্ধ হয়েছিল—যেমন ফ্রান্সের সঙ্গে ইংলণ্ডের শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ, ইংলণ্ডের সিংহাসন নিয়ে ল্যাঙ্কেস্টার ও ইয়র্ক পরিবারের মধ্যে 'গোলাপের যুদ্ধ' —সেগুলিতেও বহু সামন্তপ্রভু নিহত বা সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন। এই-ভাবে সামন্তপ্রথা ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

সামন্তপ্রথার প্রধান রক্ষাকর্তা ছিল নাইটরা। তারা ঘোড়ায় চড়ে বর্ম পরে তরবারি, বর্শা ও তীর-ধনুক নিয়ে যুদ্ধ করত। ইউরোপে মঙ্গোল আক্রমণের পর আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার প্রচলিত হয়েছিল। আগ্নেয়াস্ত্র নাইটশ্রেণীকে অকেজো করে দিয়েছিল। এখন সাধারণ মানুষদের নিয়ে সৈন্যবাহিনী গড়ে উঠেছিল। অর্থ দিয়ে দেশের রাজারা বড় বড় সৈন্যবাহিনী গড়ে তুললেন। সামন্তপ্রভু ও নাইট সম্প্রদায়ের উপর তাঁদের আর নির্ভর করতে হল না।

ক্রুশেডের সময় থেকে ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে দেশে বহু বড় বড় শহর গড়ে উঠেছিল। ঐসব শহর ক্রমেই সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী হয়ে প্রায় স্বাধীন হয়ে ওঠে। দেশে যে সমস্ত ধনিক শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল, তারা ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার জন্য দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও একই রাজার অধীনে একই রূপ মুদ্রার প্রচলন চেয়েছিল। তাই তারা রাজাদের অর্থ দিয়ে সাহায্য করত। এইভাবে ইউরোপে ধনতন্ত্রের সঙ্গে শক্তিশালী রাজতন্ত্রও গড়ে উঠেছিল।

**কৃষি-উৎপাদন প্রণালীতে কিছু উন্নয়ন ঃ** সামন্তপ্রথার যুগে কৃষি-উৎপাদন ম্যানরীয় ব্যবস্থায় ভূমিদাসদের উপর নির্ভরশীল ছিল। ক্রুশেডের সময় বহু ভূমিদাস হয় মারা গিয়েছিল, নয় শহরে আশ্রয় নিয়ে কাজকর্মে নিযুক্ত হয়েছিল। তার উপর চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ইউরোপে যে প্লেগ রোগের মহামারী দেখা দিয়েছিল, তাতে অসংখ্য কৃষক মারা গিয়েছিল। তাই ভূমিদাসের অভাব ঘটেছিল এবং ভূমিদাসরা অনেক সুযোগ-সুবিধা আদায় করেছিল। দেশে স্বাধীন কৃষকও দেখা দিয়েছিল।

শহরগুলির উন্নতি হওয়ায় বিক্রয়ের জন্য খাদ্যশস্যের ও কৃষিজাত দ্রব্যের চাহিদা খুব বেড়েছিল। ফলে কৃষিজাত দ্রব্য হয়ে উঠেছিল একটি প্রধান পণ্য। তাই সামন্তপ্রভুরা এখন চাষের উন্নতির দিকে খুবই নজর দিয়েছিলেন। তাঁরা নূতন নূতন জমি দখল করে চাষের জমি বাড়িয়েছিলেন। ভূমিদাসের চেয়ে রোজ মজুরিতে কৃষকদের কাজ করানো অনেক দিক থেকে উন্নত কৃষির সহায়ক ছিল। তাই, দেশে ভূমিদাসের সঙ্গে সঙ্গে ভূমিহীন কৃষকরাও কাজ করছিল।

দেশে অনেক নূতন শস্য, শাক-সব্‌জি ও ফলের চাষ প্রবর্তিত হয়েছিল। মদের ব্যবসা বেশ লাভজনক হওয়ায়, আঙ্‌ুরের চাষ খুব বেড়েছিল। লোকে তামাকের ব্যবহার শেখায় তামাকের চাষ প্রবর্তিত হয়েছিল। সেই সঙ্গে তুলোর এবং আলুর চাষও প্রবর্তিত হয়েছিল।

**শিল্প-উৎপাদনে উন্নয়ন ঃ** সামন্ততান্ত্রিক যুগে ভূমিদাসরাই ছিল কারিগর। তারা কৃষির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পকাজও করত। কিন্তু শিল্পজাত

পণ্যের চাহিদা ও ব্যবসা বাড়ায়, কারিগররা কেবল শিল্প-উৎপাদনে নিযুক্ত হতে পেরেছিল। দেশে খাদ্যাভাব দূর হওয়ায় তা সম্ভব হয়েছিল। অবশ্য, গোড়ার দিকে দেশে বড় বড় কারখানা স্থাপিত হয়নি, কুটির-শিল্পই ছিল প্রধান। তখন কুটিরশিল্পীদের ব্যবসায়ীরা কাঁচামাল ও মূলধন সরবরাহ করত। এইভাবে শিল্পে ধনতন্ত্রেরপ্রবেশ ঘটেছিল।

### প্রশ্নাবলী

১। আধুনিক যুগ বলতে কি বোঝ ?

২। ইউরোপে আধুনিক যুগের আরম্ভ কবে থেকে হয়েছে বলা হয় ?

৩। ইউরোপে সামন্তপ্রথার অবক্ষয় সম্পর্কে কি জান ?

৪। আধুনিক যুগের সূচনাকালে কৃষিতে কি উন্নতি হয়েছিল ?

৫। আধুনিক যুগের সূচনাকালে শ্রমশিল্পে কি উন্নতি ঘটেছিল ?

---

## দ্বিতীয় অধ্যায়
## ইউরোপে নবজাগরণ

**নবজাগরণের স্বরূপ** ঃ আধুনিক যুগের সূচনাকালে ইউরোপে শিক্ষা-দীক্ষা এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে যে জাগরণ দেখা দিয়েছিল, তাকেই **নবজাগরণ** বলা হয়। দ্বাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে নব-জাগরণের সূচনা হয়েছিল এবং ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে হয়েছিল তার পূর্ণ বিকাশ।

এই নবজাগরণের পিছনে অনেকগুলি কারণ ছিল। মধ্য যুগের শেষভাগে আরবদের মারফত ইউরোপ গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও চিন্তা-ধারার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল। ঐ সময়ে ইউরোপে গড়ে উঠেছিল অনেকগুলি বিশ্ববিদ্যালয়। সেগুলিও শিক্ষা-দীক্ষার বিস্তারে সহায়ক হয়েছিল। অবশেষে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে অটোমান তুর্কীরা পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল

অধিকার করে নিয়েছিল। কনস্টান্টিনোপল-ই এতোদিন ছিল গ্রীক ও রোমান শিক্ষা-দীক্ষা ও সাহিত্য-সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল। এখানকার গ্রন্থাগারগুলি গ্রীক-রোমান গ্রন্থে পূর্ণ ছিল। তুর্কীরা কনস্টান্টিনোপল অধিকার করে নেওয়ায় সেখানকার পণ্ডিতরা অসংখ্য গ্রীক ও রোমান গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি নিয়ে সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। দেশের চার্চ, রাজা-রাজড়া ও ধনী ব্যক্তিদের আশ্রয়ে থেকে তাঁরা প্রাচীন গ্রীক ও রোমানদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য-সংস্কৃতিকে ইউরোপীয়দের মধ্যে প্রচার করছিলেন। ঐ-সব বই দেশীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছিল এবং সর্বসাধারণের কাছে বোধগম্য হয়ে উঠেছিল। গোড়ার যুগে হস্তলিখিত পুঁথিই প্রচলিত ছিল। এক-একখানি পুঁথি হাতে লিখতে অনেক সময় লেগে যেত। ফলে, বছরে দু'তিন কপির বেশি বই তৈরী করা যেত না। তাই বইগুলির দাম হ'ত অনেক। তা ধনী ব্যক্তিরা ছাড়া অন্য কেউ সংগ্রহ করতে পারতেন না। কিন্তু ঐযুগে মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ায় বছরে এক এক-খানি বইয়ের বহু সংখ্যা ছাপা হতে লাগল। ফলে সেগুলির দাম কমল এবং সাধারণ মানুষও তা সংগ্রহ করার সুযোগ পেল। এইভাবে ইউরোপে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল।

এতোদিন ধর্মশাস্ত্র ও শাস্ত্রবচনকেই মানুষ অভ্রান্ত সত্য বলে মনে করত। কিন্তু তারা এখন প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সাহিত্য-দর্শনের সঙ্গে পরিচিত হ'ল এবং তাদের চিন্তাধারাতে পরিবর্তন এল। গ্রীক বিজ্ঞানী ও দার্শনিকরা বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কারের জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। এখন ইউরোপের মানুষও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় উদ্‌বুদ্ধ হ'ল, তারা বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কারের চেষ্টা করতে লাগল। তারা শাস্ত্রবচন ও ধর্মীয় অনুশাসনকেই ধ্রুব সত্য বলে বিনা বিচারে ও বিনা পরীক্ষায় সত্য বলে স্বীকার করল না।

চার্চ শিক্ষা দিত, এই বিশ্বসংসার ভগবান সৃষ্টি করেছেন, তাই বিশ্বসংসারে যা কিছু ঘটে, তাঁর ইচ্ছাতেই ঘটে। মানুষের একমাত্র কাজ পরলোকে মুক্তির জন্য সতত চেষ্টা করা। চার্চ মানুষের মধ্যে

এই ধারণাকে চিরস্থায়ী করে রাখতেই বদ্ধপরিকর ছিল; তাই মানুষের স্বাধীন চিন্তা ও বিচার-বুদ্ধি এবং বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কারের চেষ্টাকে চার্চ ধর্মদ্রোহিতা মনে করত।

গ্রীক সাহিত্য-দর্শন মানুষকে কেবল বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় উদ্‌বুদ্ধ করেনি, মানুষকে ইহজীবনের শ্রেষ্ঠতা সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছিল—তার মধ্যে জীবন ও সৌন্দর্যকে উপভোগ করার তৃষ্ণা জাগিয়ে দিয়েছিল। মানুষকে শিখিয়েছিল, মানবজীবন সামান্য নয়, মানুষের শক্তিও সামান্য নয়। মানুষের জীবনকে সৎ ও সুন্দর করে তোলা এবং মানবিক শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ ও প্রকাশ ঘটানো মানবজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাই এযুগে যে নূতন চিন্তাধারার জন্ম হয়েছিল, তার নাম হয়েছিল **মানবতাবাদ**। মানবতাবাদ নবজাগরণের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

**নবজাগরণে ইটালির নেতৃত্ব**ঃ নানা কারণেই ইটালিতে নবজাগরণের সূত্রপাত হয়েছিল। কনস্টাণ্টিনোপল থেকে যেসব পণ্ডিতরা পালিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের অনেকেই ইটালিতে আশ্রয় পেয়েছিলেন। ক্রুশেডের যুগে ইটালির নগর-বন্দরগুলি ব্যবসা-বাণিজ্য করে অগাধ ধনসম্পদের অধিকারী হয়েছিল। ঐসব নগর-বন্দরের ধনী সম্ভ্রান্তরা সামন্তপ্রভুদের মতো প্রাচীনপন্থী ছিলেন না। তাঁদের মন ছিল খুব উদার। তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ক'রে শিল্প, সাহিত্য ও দর্শনের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন।

এ বিষয়ে সর্বাধিক বিখ্যাত ছিলেন ফ্লোরেন্স নগর-রাজ্যের ধনী সম্ভ্রান্ত **মেদিচি** পরিবার। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় ফ্লোরেন্স নবজাগরণের ক্ষেত্রে অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছিল। কি সাহিত্যে, কি শিল্পে, কি বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় ফ্লোরেন্স ছিল সকলের আগে।

ফ্লোরেন্স থেকে এই নবজাগরণের ঢেড মিলান, রোম প্রভৃতি ইটালির অন্যান্য শহরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। রোমান চার্চ বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার বিরোধিতা করলেও তাঁরা নবজাগরণের যুগের চিত্রকলা, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক হয়ে উঠেছিলেন।

ইটালি থেকে নবজাগরণের ঢেউ ছড়িয়ে পড়েছিল আল্‌স্

পর্বতমালা পার হয়ে উত্তরে ও পশ্চিমে। নবজাগরণ দেখা দিয়েছিল জার্মানি, ফ্ল্যাণ্ডার্স, নেদারল্যাণ্ড্স, ফ্রান্স, স্পেন, পোর্তুগাল ও ইংলণ্ডে। ঐ-সব স্থানে নবজাগরণের ঢেউ কেবল ছড়িয়ে পড়েনি—পরিপূর্ণরূপে বিকাশ লাভ করেছিল।

**চিন্তায় নবজাগরণ বা মানবতাবাদ ঃ** নবজাগরণের যুগে চিন্তার ক্ষেত্রে যে নবজাগরণ হয়েছিল, তা রূপলাভ করেছিল ঐ যুগের কাব্যে, সাহিত্যে ও দর্শনে। মানুষের সুখ-দুঃখ, প্রেম-ভালোবাসা, উচ্চাশা, ব্যর্থতা, জয়-পরাজয়, দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম, সাধুতা-অসাধুতা, লোভ, ভণ্ডামি, অনাচার, ব্যভিচার—এককথায় মানুষের জীবনই হয়ে ওঠে কাব্য, কাহিনী, নাটক ও নিবন্ধের মূল বিষয়বস্তু। তাই নবযুগের চিন্তাধারাকে এককথায় বলা হয় **মানবতাবাদ**।

এতদিন ল্যাটিন ভাষাই ছিল সাহিত্য-দর্শনের ভাষা। শিক্ষিত সমাজে এই ভাষাই ছিল প্রচলিত। মধ্য যুগে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত আঞ্চলিক ভাষায় কাব্য-কাহিনী রচিত হতে শুরু করেছিল। পরে ঐসব ভাষা বিকাশ লাভ করেএক-একটি জাতীয় ভাষায় পরিণত হয়েছিল। এইভাবে ইটালীয়, ফরাসী, ইংরেজি, জার্মান, **স্পেনিশ** প্রভৃতি ভাষার উদ্ভব হয়। নবজাগরণের যুগে কবি ও কাহিনী-কারেরা ঐ-সব দেশীয় ভাষাকেই পরিমার্জিত করেন ও সুপরিণত রূপ দেন। ঐযুগে রচিত কাব্য, কাহিনী, নাটক প্রভৃতি সাধারণ মানুষের কাছে সহজবোধ্য হয়ে ওঠে এবং জনসাধারণ ঐ-গুলির রসগ্রহণে সমর্থ হয়।

নবজাগরণের যুগের সাহিত্যও প্রথমে ইটালিতে আত্মপ্রকাশ করে। তারপর তা ইউরোপের অন্যান্য স্থানে বিস্তার লাভ করে।

মধ্য যুগ ও আধুনিক যুগের সন্ধিক্ষণে ইটালির ফ্লোরেন্সে ইটালির মহাকবি দান্তে আলিঘিয়েরি জন্মেছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম ইটালীয় ভাষায় কাব্য রচনা করে নবজাগরণের কাব্য-সাহিত্যের সূচনা করেন। তাঁর রচিত **ডিভিনা কমেডিয়া** মহাকাব্য একটি অমর গ্রন্থ। তিনি ল্যাটিন সাহিত্যের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হ'লেও, তাঁর সাহিত্যে

আধুনিক চিন্তাধারা প্রথম প্রকাশ লাভ করে। তিনি স্বর্গ ও নরক দর্শনচ্ছলে এযুগের মানুষের চিন্তা, অনুভূতি, কল্পনা, পাপ-পুণ্যবোধ, সৌন্দর্যবোধ ও আদর্শকে তাঁর মহাকাব্যে প্রকাশ করেন। দান্তে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে জন্মেছিলেন। তাই তাঁর রচনায় মধ্য-যুগীয় চিন্তার প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে থাকলেও, তা যে আধুনিক যুগের প্রথম মহাকাব্য, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

দান্তের পরে ইটালীয় ভাষায় অমর কবিতা ও কাহিনী রচনা করেন **পেত্রার্ক ও বোকাচিও**। এঁরা দুজনেই ছিলেন দান্তের মতোই ফ্লোরেন্সের অধিবাসী। পেত্রার্কের সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতা ও গীতিকবিতাগুলি আজও অমর হয়ে আছে। তিনি ল্যাটিন ভাষাতেও সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি গ্রীকভাষা না জানলেও, গ্রীক সাহিত্য ও দর্শনের প্রতি তাঁর প্রীতি ছিল অসাধারণ।

বোকাচিও ঐ যুগের ইটালীয় ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক। তাঁর **ডেকামেরন** একটি সুবিখ্যাত গল্প-গ্রন্থ। এতে বহু মজার গল্প আছে ; সেগুলিতে তিনি তৎকালীন সামাজিক অবস্থা ও গির্জার পাদরিদের অসৎ ও দুর্নীতিপরায়ণ জীবনের কুৎসিত চিত্র অঙ্কিত করেন।

নবজাগরণের যুগের একজন প্রধান চিন্তানায়ক ছিলেন **মেকিয়া-ভেলি**। তিনি ফ্লোরেন্সের এক অভিজাত পরিবারে জন্মেছিলেন এবং ফ্লোরেন্সের প্রজাতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় একটি প্রধান অংশ নিয়েছিলেন। তিনি রাজনীতি ও কূটনীতিতে ছিলেন অতিশয় বিচক্ষণ ও অভিজ্ঞ। তিনি তাঁর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে **প্রিন্স** নামে একখানি বই লেখেন। তাতে তিনি ঐ যুগে প্রচলিত রাজনীতির নীতি ও আদর্শকে রূপ দেন। তাঁর মতে, রাষ্ট্র-পরিচালনায় সততার স্থান নেই এবং আদর্শ শাসক হতে হলে অসাধুতা, শঠতা ও কূটনীতির আশ্রয় নিতেই হয়। সাধারণ মানুষ যেসব নীতি ও আদর্শের দ্বারা পরিচালিত হয়, রাষ্ট্রনায়কের পক্ষে সেগুলির দ্বারা পরিচালিত হওয়া সম্ভব নয়।

নবজাগরণের যুগে ইংলণ্ডও সাহিত্য এবং মানবিক চিন্তার ক্ষেত্রে অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছিল। চতুর্দশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে ইংরেজী ভাষার

আদিকবি **জিওফ্রে চসারের** জন্ম হয়। তিনি ইটালি ভ্রমণ করে ঐযুগের চিন্তাধারা ও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন এবং তাঁর সুবিখ্যাত কাব্য **ক্যাণ্টারবেরি টেল্স্** রচনা করেছিলেন। তিনি এই কাব্যকাহিনীতে তৎকালীন সমাজের যে চিত্র দেন, তাতে সামন্ততান্ত্রিক রীতিনীতি এবং চার্চের দুর্নীতি ও ভণ্ডামিকে হাস্যরসের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে তুলে ধরেন।

ইংরেজি সাহিত্যে নবজাগরণের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে ষোড়শ শতাব্দীতে। ঐ সময়ে কবি **এডমাণ্ড স্পেন্সার** রচনা করেন তাঁর **ফেয়ারি কুইন** কাব্য। এই কাব্যে তিনি তৎকালীন ইংলণ্ডের রানী **এলিজাবেথের** প্রশস্তি রূপকচ্ছলে গাইলেও, এর ভাষার মাধুর্য, কল্পনা, অনুভূতি ও মানবিকতা আজও মানুষকে মুগ্ধ করে।

ঐ সময়েই জন্মগ্রহণ করেছিলেন ইংলণ্ডের তথা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার ও পৃথিবীখ্যাতকবি **উইলিয়াম শেক্স্পীয়ার**। তিনি গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন না, কিন্তু তিনি ইংরেজী ভাষাকে যে প্রকাশ-শক্তি, সৌন্দর্য ও মাধুর্য দেন, তার তুলনা নেই। মানব চরিত্র-চিত্রণে আজওতিনি পৃথিবীতে অতুলনীয়। তিনি হাস্যরস সৃষ্টিতেও ছিলেন অসাধারণ। তাঁর ফল্স্টাফ চরিত্রের মধ্যে তিনি হাস্যরসের মাধ্যমে সামন্ত-তান্ত্রিক সমাজকে যে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করেন, তার তুলনা নেই।



শেক্স্পীয়ার

হ্যামলেট, কিং লিয়ার প্রভৃতি তাঁর অমর নাট্যগ্রন্থ।

এই যুগে স্পেন এবং ফ্রান্সও সাহিত্যে খুবই উন্নত হয়ে উঠেছিল। স্পেনে জন্মেছিলেন সুবিখ্যাত সাহিত্যিক **সারভান্তিস্**। তাঁর রচিত

কাহিনীগ্রন্থ **ডন্ কুইক্সট**-এ তিনি তৎকালীন সামন্ততান্ত্রিক রীতি-নীতি ও আদর্শকে হাস্যরসের মাধ্যমে তীব্র কশাঘাত করেন। ঐযুগে ফ্রান্সে জন্মেছিলেন সুবিখ্যাত কবি **রাবেলে**। রাবেলে তাঁর রচনায় মধ্যযুগীয় রীতিনীতি ও আদর্শকে হেয় প্রতিপন্ন করেছিলেন। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে ও হাস্যরস সৃষ্টিতে ছিল তাঁর অসামান্য প্রতিভা।

এই যুগের মনীষীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন হল্যাণ্ডের **ইরাসমাস্**। তিনি রটারডাম শহরে জন্মেছিলেন। তিনি ল্যাটিন ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন এবং ল্যাটিন ভাষাতেই লিখতেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের নাম **প্রেইজ অব্ ফলি** বা নির্বুদ্ধিতার প্রশস্তি। এতে তিনি



ইরাসমাস্

চার্চের দুর্নীতিগুলিকে সুস্পষ্টভাষায় প্রচার করেন এবং রোমান চার্চের ঐসব দুর্নীতি ও ত্রুটি থেকে মুক্ত হতে উপদেশ দেন। তিনি ধর্মযাজকদের দুর্নীতিপরায়ণতার জন্যে তাদের কঠোর ভাষায় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেন। ঐযুগে তাঁর মতো আর কোনও ব্যক্তি মনীষা ও পাণ্ডিত্যের জন্য সারা ইউরোপে সম্মান পাননি।

**শিল্পের ক্ষেত্রে নবজাগরণ :** শিল্পের ক্ষেত্রে নবজাগরণেও অগ্রণী ছিল ইটালি এবং ইটালির ফ্লোরেন্স। চিত্র, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে এখানে ঐযুগের বহু অসামান্য প্রতিভার উদয় হয়েছিল। চিত্র ও ভাস্কর্যে এতোদিন ধর্মীয় বিষয়ই ছিল মুখ্য। মানুষের যে মূর্তি অঙ্কিত বা নির্মিত হত, তাতে মানবদেহের সৌন্দর্যের দিকে লক্ষ্য না দিয়ে, তাতে ধর্মীয় ও দৈবীভাব আরোপ করার চেষ্টা চলত। উদাহরণস্বরূপ, এতোদিন পর্যন্ত মেরীমাতার মূর্তিতে দেবত্ব আরোপেরই চেষ্টা হত ; কিন্তু এখন তাঁকে এক স্নেহময়ী জননীর মানবিক রূপে মূর্ত করা হ'ল। মানবদেহের গঠন সৌন্দর্যকে কি চিত্রে, কি মূর্তিতে নিখুঁতভাবে তুলে ধরা হল। এতোদিন নিসর্গ ছিল উপেক্ষার বস্তু। এখন নিসর্গ সৌন্দর্যও চিত্রকরদের একটা প্রধান বিষয় হ'ল। মানুষ, প্রকৃতি, প্রতিটি বস্তু, সকল কিছুকেই দেওয়া হ'ল বাস্তব জীবন্ত রূপ। এখন ম্যাডোনা (কুমারী মেরীমাতা), ক্রুশবিদ্ধ যিশু প্রভৃতির মূর্তি, ধর্মীয় ঘটনা প্রভৃতি রূপায়িত করা হলেও, সেগুলি হয়ে উঠল বাস্তবধর্মী, মানবিক ও জীবন্ত। চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়ায় ফ্লোরেন্সের চিত্রকর জিওটো এর সূচনা করলেও, পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর কয়েকজন মহাশিল্পীর হাতে এর পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল। এঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন **লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি, মাইকেল-এঞ্জেলো ও রাফায়েল**। এরা সকলেই ছিলেন ফ্লোরেন্সের অধিবাসী এবং প্রায় সমসাময়িক। বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি ও বয়ঃকনিষ্ঠ রাফায়েল।

ঐ সময়ে গির্জা, প্রাসাদ প্রভৃতির দেওয়ালে বহুবর্ণ চিত্র আঁকার রীতি প্রচলিত ছিল। এঁদের আঁকা বহু প্রাচীর-চিত্র এখন অনেক জায়গায় নষ্ট হয়ে গেছে ; কিন্তু যেগুলি এখনও নষ্ট হয়নি, সেগুলি থেকেও এঁদের অসামান্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

**লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি** কেবল চিত্রশিল্পীই ছিলেন না, তিনি ছিলেন স্থপতি, ভাস্কর, কবি, দার্শনিক ও বিজ্ঞানী। এমন বহুমুখী প্রতিভার মিলন মানুষের মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না। তাঁর আঁকা **শেষ ভোজ** ও **মোনালিসা** চিত্র আজও পৃথিবীতে অতুলনীয় হয়ে আছে।

মাইকেল-এঞ্জেলোও চিত্রাঙ্কনে, স্থাপত্যে ও ভাস্কর্যে সমান অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। মনুষ্যদেহের অবিকল চিত্রণে ও মূর্তি নির্মাণে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। সিস্টাইন চ্যাপেলের (গির্জার) বহু প্রাচীরচিত্র তাঁর আঁকা। তাঁর আঁকা **শেষ বিচার** ও পাথরের তৈরি ডেভিড, মোজেস প্রভৃতির মূর্তি মানুষকে বিস্মিত করে। ঐ-যুগের সুবিখ্যাত স্থপতি ব্রামাণ্ট রোমের সেন্ট পিটার্স গির্জার নূতন ভবনের পরিকল্পনা করেছিলেন। ঐ গির্জার গম্বুজের পরিকল্পনা ক'রে মাইকেল-এঞ্জেলো বিস্ময়কর স্থাপত্যবিদ্যার পরিচয় দেন। রাফায়েল অল্প বয়সেই মারা যান। তিনিও সিস্টাইন চ্যাপেলে বহু ছবি আঁকেন। তাঁর আঁকা ম্যাডোনা যেমন জীবন্ত, তেমনি ইহা সৌন্দর্যে ও মাধুর্যে ভরা।



লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি



রাফায়েল

ফ্লোরেন্সের বাইরেও ঐ যুগে বহু প্রতিভাধর শিল্পীর উদয় হয়েছিল। এঁদের মধ্যে ভেনিসের চিত্র শিল্পী **টিটিয়ান** বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নবযুগের শিল্পকলা ইটালি থেকে ইউরোপের অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে পড়ে এবং ঐসব দেশেও বহু প্রতিভাধর শিল্পীর জন্ম হয়।

**বিজ্ঞানে নবজাগরণ :** মধ্যযুগের মানুষরা প্রচলিত ধ্যান-ধারণা,

শাস্ত্রবচন ও ধর্মীয় অনুশাসনকেই নির্বিচারে মেনে নিত। প্রাচীন গ্রীসে একদা বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার বিকাশ ঘটেছিল। আরবীয় পণ্ডিতরাও গণিত, চিকিৎসা-শাস্ত্র প্রভৃতিতে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। মধ্যযুগের শেষভাগে ইউরোপের মানুষরাও গ্রীক ও আরবীয় চিন্তার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল। ফলে, তারা প্রচলিত ধ্যান-ধারণা, শাস্ত্রবচন ও গির্জার অনুশাসন সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে উঠেছিল। তারা যুক্তিবাদী এবং মানুষের বিচারবুদ্ধিতে বিশ্বাসী হ'য়ে উঠেছিল। ক্রমাগত তথ্য-সংগ্রহ এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষাকেই তারা সত্য উদ্‌ঘাটনের একমাত্র উপায় বলে জেনেছিল। রোমান চার্চ প্রচলিত ধ্যান-ধারণাকেই চিরসত্য বলে ধরে নিয়েছিল। তাই প্রচলিত ধ্যান-ধারণা-সম্পর্কে সামান্য সন্দেহ প্রকাশকেও চার্চ ধর্মদ্রোহ বলে মনে করত এবং ধর্মদ্রোহের অপরাধে দণ্ড দিত। কিন্তু, তা সত্ত্বেও বিজ্ঞানীদের নব নব সত্য আবিষ্কারের চেষ্টা থেকে নিবৃত্ত করা যায়নি। অনেকে এজন্য চার্চের বিচারে দণ্ডিত হয়ে প্রাণ দিয়েছেন, জীবন্ত পুড়ে মারা গেছেন। তবু বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ও নব নব সত্য আবিষ্কারের অগ্রগতি অব্যাহতভাবে চলেছে। এঁদের মধ্যে যাঁরা অগ্রণী ছিলেন, তাঁদের মধ্যে **রোজার বেকন, লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি, কোপার্নিকাস, স্যার ফ্রান্সিস বেকন, গ্যালিলিও** প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

**রোজার বেকন** ছিলেন ত্রয়োদশ শতাব্দীর মানুষ এবং ইংরেজ। তিনি ছিলেন অক্সফোর্ডের ফ্রান্সিস্কান খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী। গির্জার সঙ্গে জড়িত থাকলেও তিনি বিনা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় কোন কিছুকে সত্য বলে গ্রহণের বিরোধী ছিলেন। তিনি বলতেন, অবিরাম তথ্য সংগ্রহ ও ক্রমাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারাই প্রকৃত সত্য নির্ণয় সম্ভব। তিনি সমসাময়িক অজ্ঞতার তীব্র নিন্দা করেন এবং প্রকৃত সত্য সন্ধানের জন্য সকলকে উদ্‌যোগী হতে বলেন। তিনি বহু নিবন্ধ রচনা করেছিলেন। তিনি লেখেন যে, এমন একদিন আসবে, যখন মানুষ যন্ত্রের সাহায্যেই জলপথে জাহাজ চালাবে, স্থলপথে গাড়ি চালাবে, মানুষের পক্ষে আকাশে ওড়াও অসম্ভব থাকবে না।

তবে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপক সূচনা হয় এর প্রায় আরও দুই শতাব্দী পরে। এর সূত্রপাত করেন ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেম্‌সের অর্থমন্ত্রী **স্যার ফ্রান্সিস বেকন** ( পরে লর্ড ভেরুলাম )। স্যার ফ্রান্সিসকে **নিরীক্ষামূলক দর্শনের জনক** ( Father of Experimental Philosophy ) বলা হয়। তিনি বিজ্ঞানীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে আবিষ্কৃত নূতন নূতন সত্যগুলির মধ্যে যোগাযোগ সাধন করে আধুনিক বিজ্ঞানকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। তাঁর চেষ্টাতেই ইংলণ্ডে রয়েল সোসাইটি অব্ লণ্ডন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তিনি **নিউ আটল্যান্টিস্** নামে একটি পুস্তক রচনা করেন। তিনি বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে রোজার বেকনের মতোই আশাবাদী ছিলেন।

আধুনিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মহাশিল্পী লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চির অবদানও কম নয়। তিনি কেবল শিল্পীই ছিলেন না, তিনি ছিলেন প্রকৃত-বিজ্ঞানী, দেহ-বিজ্ঞানী, যন্ত্রবিদ্ ও যন্ত্রনির্মাতা। তিনি মনুষ্য-দেহকে ভালোভাবে জানার জন্য শব ব্যবচ্ছেদ করেন। তিনি উড়ো জাহাজের মডেল তৈরি করেন—তিনি আধুনিক ক্যামেরার সূচনা করেন। তিনি বিনা পরীক্ষায় কোন কিছুকে সত্য বলে গ্রহণের বিরোধী ছিলেন এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অসংখ্য প্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন।


কোপারনিকাস

এইযুগে জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এক যুগান্তর ঘটে। সুপ্রাচীনকাল থেকেই মানুষের ধারণা ছিল, পৃথিবী স্থির আছে, সূর্য তার চারদিকে ঘুরছে, আর আকাশে অনন্তকাল ধরে গ্রহ-নক্ষত্র-গুলি খচিত রয়েছে। চার্চও এই ধারণাকে অভ্রান্ত ও চিরসত্য বলে

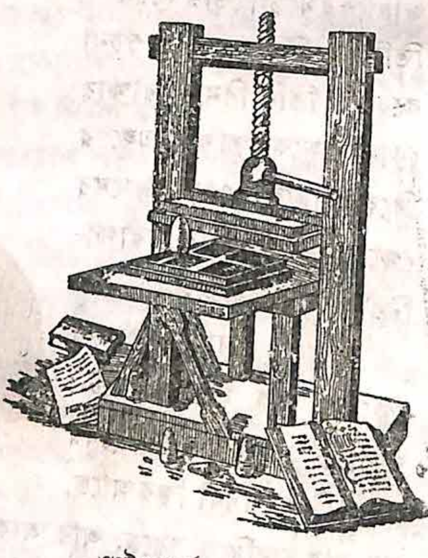
বিশ্বাস করত। কিন্তু নবজাগরণের যুগে এর প্রথম বিরোধিতা করেন পোলিস বিজ্ঞানী **কোপারনিকাস**। তিনি বলেন, সূর্য স্থির রয়েছে এবং পৃথিবী তাকে প্রদক্ষিণ করছে। কোপারনিকাস চার্চের কোপদৃষ্টি এড়িয়ে গেলেও, পরে এই সত্য প্রচার করার জন্য বহু বিজ্ঞানীকে অশেষ নির্যাতন সহ্য করতে, এমন কি, জীবন্ত দগ্ধও হতে হয়।



গ্যালিলিও

এই যুগেই ইতালিতে **গ্যালিলিও গ্যালিলাই** জন্মগ্রহণ করেন। আগে মানুষ বিশ্বাস করত যে, বেশী ওজনের জিনিস বেশী দ্রুতগতিতে উপর থেকে নিচে পড়ে।

গ্যালিলিও পিসা শহরের হেলানো মিনার থেকে দুটি অসমান ওজনের বস্তু একই সঙ্গে নিচে ফেলে প্রমাণ করলেন যে, ঐ বস্তু দুটি একই সঙ্গে নিচে পড়ছে। অর্থাৎ, ওদের গতিবেগ ছিল একই।



গুটেনবার্গের মুদ্রণযন্ত্র

গ্যালিলিওকে তাই **'বলবিদ্যার জনক'** বলা হয়। তিনি দূরবীণের উন্নতি ক'রে গ্রহ-নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করেন এবং প্রমাণ করে দেখান যে, সূর্য স্থির আছে এবং পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। কিন্তু একথা বলার জন্য তিনি চার্চের কোপে পড়েন

চার্চ তাঁকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে। শেষে তিনি তাঁর মত প্রত্যাহার ক'রে নিয়ে মুক্তি পান।

নবজাগরণের বিশেষ সহায়ক হয়েছিল আধুনিক মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কার। জার্মানির মেইনজ্ শহরের অধিবাসী গুটেনবার্গ ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দে আধুনিক মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কার করেন। এখন অল্প ব্যয়ে ও অল্প সময়ে অসংখ্য পুস্তক, প্রচারপত্র প্রভৃতি ছাপা সম্ভব হয়। ফলে, ইউরোপে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে দ্রুত যুগান্তর আসে।

## প্রশ্নাবলী

১। নবজাগরণ বলতে কি বোঝ? ইউরোপে নবজাগরণ কখন হয়েছিল? এর পিছনে কি কি কারণ ছিল?

২। ইউরোপে কোথায় সর্বপ্রথম নবজাগরণের সূচনা হয়েছিল? কেন হয়েছিল?

৩। ইউরোপে চিন্তাজগতে 'নবজাগরণ' সম্পর্কে কি জান?

৪। ইউরোপে শিল্পকলার নবজাগরণ সম্পর্কে যা জান লিখ।

৫। ইউরোপে বিজ্ঞানের নবজাগরণ সম্পর্কে যা জান লিখ।

৬। মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কার নবজাগরণে কিভাবে সহায়ক হয়েছিল?

৭। সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও:

(ক) লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি; (খ) মাইকেল-এঞ্জেলো; (গ) রাফায়েল; (ঘ) দান্তে; (ঙ) পেত্রার্ক; (চ) বোকাচিও; (ছ) চসার; (জ) শেক্স্পীয়ার; (ঝ) সারভান্তিস্; (ঞ) ইরাসমাস্; (ট) রোজার বেকন; (ঠ) স্যার ফ্রান্সিস বেকন; (ড) কোপারনিকাস; (ঢ) গ্যালিলিও; (ণ) গুটেনবার্গ।

৮। নিম্নের কয়েকজন লেখক ও কতকগুলি পুস্তকের নাম দেওয়া হ'ল। লেখকের নামের পাশে ঠিকভাবে পুস্তকের নাম লিখ।

| | |
|---|---|
| (ক) দান্তে রচনা করেন | প্রিন্স |
| (খ) ইরাসমাস্ রচনা করেন | ফেয়ারি কুইন |
| (গ) এডমাণ্ড স্পেন্সার রচনা করেন | ক্যাণ্টারবেরি টেল্স্ |
| (ঘ) বোকাচিও রচনা করেন | ডন কুইক্সট |

| | |
|---|---|
| (ঙ) সারভান্তিস রচনা করেন | প্রেইজ অব্ ফলি |
| (চ) মেকিয়াভেলি রচনা করেন | ডিভিনা কমেডিয়া |
| (ছ) চসার রচনা করেন | নিউ অ্যাটলান্টিস |
| (জ) স্যার ফ্রান্সিস বেকন রচনা করেন | ডেকামেরন |

৯। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) শেষ ভোজ ও মোনালিসা ছবি আঁকেন —।

(খ) ডেভিড ও মোজেসের মূর্তি নির্মাণ করেন —।

(গ) সিস্টাইন চ্যাপেলে ম্যাডোনা আঁকেন —।

(ঘ) মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কার করেন —।

---

## তৃতীয় অধ্যায়

# ইউরোপীয় জগতের পরিধি বিস্তার

**ভৌগোলিক আবিষ্কারের সূচনা :** মধ্যযুগের মানুষের জীবন নিজ নিজ অঞ্চলের ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ধর্মযুদ্ধের ফলে ইউরোপের মানুষ ইউরোপের বাইরের সঙ্গে পরিচিত হয়। তার জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আসে। বাইরের জগতের সঙ্গে তার ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়। এ বিষয়ে ইটালিই ছিল অগ্রণী। ইটালির বন্দর-নগরগুলি ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। ইটালির বন্দর-নগরগুলি প্রাচ্যদেশ থেকে মধ্যপ্রাচ্যের পথেই পণ্যসম্ভার এনে সারা ইউরোপে বিক্রি করত এবং তার ফলেই সে ধনী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সম্প্রতি অটোমান তুর্কীরা সারা মধ্য প্রাচ্য এবং পূর্ব ইউরোপের একটি বিরাট অংশ অধিকার করায় তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যে অন্তরায় দেখা দিয়েছিল। অটোমান তুর্কীরা তাদের কাছে প্রাচ্য থেকে আনীত পণ্যসম্ভারের উপর ক্রমাগত শুল্ক বৃদ্ধি করছিল। এতে তাদের ব্যবসায়ে ক্ষতি হচ্ছিল। তাই অন্য কোনও পথে প্রাচ্যের সঙ্গে ইটালি ব্যবসায়ের কথা চিন্তা করতে থাকে।

এই সময় ইটালিতে নবজাগরণের সূচনা হয়েছিল। মানুষের জীবনে এসেছিল এক নব উদ্দীপনা ও প্রেরণা। দিক্‌নির্ণয়-যন্ত্রের উন্নতি সাধিত হয়েছিল ; গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান ও সঞ্চারণ সম্পর্কে তাদের জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছিল। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা পরিমাপক যন্ত্র প্রভৃতির ব্যবহার করতে তারা শিখেছিল। মার্কো পোলোর ভ্রমণ-কাহিনী প্রকাশিত হওয়ায় প্রাচ্যের ধনদৌলত সম্পর্কে তাদের কৌতূহল ও লোভ বৃদ্ধি পেয়েছিল। পৃথিবীর আকার ও আয়তন সম্পর্কে তাদের ধারণায় পরিবর্তন ঘটেছিল। তাই তারা অন্য কোন পথে প্রাচ্যের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে উদ্‌গ্রীব হ'ল।

অটোমান তুর্কীরা নানা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা সত্ত্বেও ইটালির বণিকরা ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু স্পেন ও পোর্তুগাল সমুদ্রতীরে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও প্রাচ্যের সঙ্গে বাণিজ্যের সুযোগে বঞ্চিত ছিল। কারণ দক্ষিণ স্পেনে মুসলমানদের সঙ্গে তাদের ক্রমাগত যুদ্ধ চলছিল। মুসলমানরা ও তারা পরস্পরকে আপোসহীন শত্রু মনে করত। এজন্য প্রাচ্যের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য জলপথ আবিষ্কারে সর্বপ্রথম উদ্‌যোগী হয়েছিল স্পেন ও পোর্তুগাল।

**পোর্তুগালের প্রচেষ্টা :** পোর্তুগালের **প্রিন্স হেনরি** পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই জলপথ আবিষ্কারের সূচনা করেন। তাঁর চেষ্টায় পোর্তুগীজ নাবিকরা আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলভাগ দিয়ে দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে কেপ ভার্ড, মাডিরা দ্বীপপুঞ্জ, আজোর্স প্রভৃতি আবিষ্কার করে। এ বিষয়ে প্রিন্স হেনরির উৎসাহ এতই ছিল যে, লোকে তাঁকে **নৌচালক** হেনরি বলত।

নৌচালক হেনরির মৃত্যুর পর একাজে কিছুদিন ভাটা পড়ে। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে আবার একাজ নবোদ্যমে শুরু হয়। পোর্তুগীজ নাবিক **বারথেলোমিউ ডিয়াজ** আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্তে পৌঁছেন ( ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে )। এখানে তিনি প্রচণ্ড ঝড়ে পড়েছিলেন, তাই তিনি পূর্বদিকে অগ্রসর হতে পারেননি। এর বারো বছর পরে পোর্তুগীজ নাবিক **ভাস্কো-দা-গামা** আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্ত ঘুরে

ভারতের পশ্চিম উপকূলে কালিকট বন্দরে গিয়ে পৌঁছেন এবং ভারত থেকে বহুমূল্য পণ্যসম্ভার ও উপহার নিয়ে দেশে ফেরেন। এইভাবে প্রাচ্যের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের নূতন জলপথ আবিষ্কৃত হয়।



প্রিন্স হেনরি

এর দু' বছর পরে, ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে, পোর্তুগীজ নাবিক **পেড্রো কেব্রাল** ভারতের উদ্দেশে যাত্রা করেন, কিন্তু ঝড় ও স্রোতের টানে দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিলে গিয়ে পৌঁছেন।

ভাস্কো-দা-গামা ভারত তথা প্রাচ্যের সঙ্গে নূতন জলপথ আবিষ্কার করলেও ভারত মহাসাগরে ঐ সময় আরবরা বাণিজ্য করত। তাদের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধলে পোর্তুগীজরা আরবদের বিরুদ্ধে নিয়মিত সশস্ত্র অভিযান পাঠাতে থাকে। এই সশস্ত্র অভিযানের ফলে ভারতের পশ্চিম উপকূলেও তারা প্রাধান্য বিস্তার করে এবং সেখানে অনেকগুলি কুঠি স্থাপন করে। ঐগুলিকে শক্তিশালী করে তোলার জন্য **আলবুকার্ক** পোর্তুগীজ কুঠিগুলির অধ্যক্ষ হয়ে আসেন। তিনি গোয়া জয় ক'রে সেটিকে সুরক্ষিত ক'রে তোলেন। তিনি পোর্তুগীজদের



ভাস্কো-দা-গামা

ভারতীয় মেয়েদের বিয়ে ক'রে ভারতে বসবাস করতে উৎসাহ দেন। পোতুর্গীজরা ভারতের পশ্চিম উপকূলে বেশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

**স্পেনের প্রচেষ্টা** : স্পেনিয়ার্ডরা কিন্তু অন্যপথে ভারতে যাওয়ার জলপথ আবিষ্কারের চেষ্টা করছিল। এ বিষয়ে উদ্‌যোগী ছিলেন ইটালীয় নাবিক **খ্রীষ্টফার কলম্বাস**। তাঁর বিশ্বাস ছিল, পৃথিবী গোলাকার, তাই ক্রমাগত পশ্চিমে অগ্রসর হলে ভারতে তথা প্রাচ্যে পৌঁছানো যাবে। কলম্বাসকে এ বিষয়ে প্রথমে কেউ সাহায্য করতে চান না। শেষে স্পেনের **রাজা ফার্ডিনাণ্ড** ও **রানী ইসাবেলা** তাঁকে সাহায্য দেন। ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দে কলম্বাস ক্রমাগত পশ্চিমে অগ্রসর হয়ে নানা বিপদ অতিক্রম করে দু' মাস পরে শেষে বাহামা দ্বীপপুঞ্জে গিয়ে



কলম্বাস

পৌঁছেন। তাঁর ধারণা হয়, তিনি ভারতীয় কোনও দ্বীপপুঞ্জে গিয়ে পৌঁছেছেন। তিনি ঐ দ্বীপপুঞ্জের নাম দেন ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ বা **ইণ্ডিজ**। এখানকার অধিবাসীদের নাম **ভারতীয় বা ইণ্ডিয়ান**। কলম্বাস এর পরেও তিনবার ঐ অঞ্চলে যান, তিনি আমেরিকার মূল ভূখণ্ডেও পদার্পণ করেন। কিন্তু মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁর ধারণা ছিল যে, তিনি ভারতীয় অঞ্চলেই গিয়ে পৌঁছেছেন।

কলম্বাসের পরেও স্পেনিয়ার্ডরা ঐ অঞ্চলে অভিযান চালায় এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজে উপনিবেশ স্থাপন করে। স্পেনদেশীয় নাবিক **বালবোয়া** পানামা যোজকে গিয়ে নামেন এবং জানতে পারেন যে, যোজকের অপরদিকে এক বিশাল মহাসাগর রয়েছে।

**আমেরিগো ভেসপুচি** নামে জনৈক ইটালীয় নাবিক স্পেন ও পোতুর্গালের কয়েকটি সমুদ্র অভিযানে অংশ নিয়ে পশ্চিম গোলার্ধে

গিয়েছিলেন। তিনি পশ্চিম গোলার্ধ সম্পর্কে মানচিত্র ও সূচী প্রস্তুত করেন। তাঁর নাম অনুসারে পশ্চিম গোলার্ধের নাম হয় **আমেরিকা**।



আমেরিগো ভেসপুচি

**ম্যাগেলান** নামে এক পোর্তুগীজ নাবিক স্পেনের অধীনে সমুদ্র অভিযান করেন। তিনি অ্যাটলাণ্টিক মহাসাগর পার হয়ে দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ প্রান্তে গিয়ে পৌঁছেন এবং এখানকার ম্যাগেলান প্রণালী পার হয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে গিয়ে পড়েন। প্রশান্ত মহাসাগরে ক্রমাগত চার মাস যাত্রা করে তিনি একটি দ্বীপপুঞ্জে এসে পৌঁছেন। স্পেনের রাজকুমার ফিলিপের নাম অনুসারে তিনি এর নাম দেন **ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ**। এখানে স্থানীয় অধিবাসীদের হাতে তিনি নিহত হন। তাঁর সহকারী জাহাজ নিয়ে ভারত মহাসাগর পার হয়ে স্পেনে ফিরে আসেন। এইভাবে প্রথম পৃথিবী-পরিক্রমা সম্পন্ন হয়।



ম্যাগেলান

**সামুদ্রিক অভিযানের ফলাফল:** এইসব সামুদ্রিক অভিযান ও ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে পৃথিবী সম্পর্কে ইউরোপীয়দের জ্ঞান বৃদ্ধি পেল। পৃথিবীতে যে আরও একটি মহাসাগর এবং সুবিশাল একটি ভূখণ্ড আছে, তা ইউরোপের মানুষ জানল। তারা জানলো, এই নবাবিষ্কৃত মহাদেশেও সভ্য

মানুষ বাস করে, যাদের প্রাসাদ, মন্দির, ধনদৌলত ইউরোপীয়দের বিস্মিত ক'রে দিল। তারা সন্ধান পেলো মধ্য আমেরিকার মেক্সিকো অঞ্চলে আজটেক নামে এবং দক্ষিণ আমেরিকার পেরু অঞ্চলে ইংকা নামে দুই প্রাচীন সভ্যতার।

পৃথিবীর আকার ও আয়তন সম্পর্কেও মানুষ প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করল। ম্যাগেলান পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে প্রমাণ করলেন, পৃথিবী গোলাকার। পৃথিবীর আয়তন সম্পর্কে ইউরোপীয়দের যে ধারণা ছিল, পৃথিবী যে তার চেয়ে অনেক বড় তাও প্রমাণিত হ'ল।

ব্যবসায়ের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হ'ল। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যেই তারা ক্ষান্ত হ'ল না। ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে তারা করল অধিকার বিস্তার, উপনিবেশ স্থাপন ও উপনিবেশগুলির সম্পদের ব্যবহার ও শোষণ। স্পেন মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার **আজটেক** ও **ইংকা** সভ্যতার ধনসম্পদ দেখে লালসায় মত্ত হয়ে উঠল। তারা আগ্নেয়াস্ত্রের সাহায্যে আজটেক ও ইংকা সাম্রাজ্য অধিকার করল। আজটেক সাম্রাজ্য জয় করেছিলেন **হারনান কোর্টেজ** এবং ইংকা সাম্রাজ্য জয় করেছিলেন **পিজারো**। স্পেন অগাধ স্বর্ণ ও রৌপ্যের অধিকারী হ'ল। পেরুর রৌপ্য খনিগুলি থেকেও তারা প্রচুর রৌপ্য পেল।

**জাতিগুলির উত্থান**ঃ ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে দীর্ঘকাল ধরে বহু জাতি ও উপজাতির মিলন ও মিশ্রণের ফলে ভাষা, রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার প্রভৃতির ভিত্তিতে এক-একটি জাতি গড়ে উঠেছিল। এখন জাতিগুলির মধ্যে ক্রমেই জাতীয় চেতনা প্রবলতর হ'তে লাগল। প্রত্যেক দেশে বহু সামন্তপ্রভু ছিলেন। রাজা ছিলেন সর্বাধিক প্রভাবশালী একজন সামন্তপ্রভু মাত্র। কিন্তু সামন্ততন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়ায় এখন রাজারা ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠলেন। সারা দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা ও একই রূপ মুদ্রার প্রচলন থাকলে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা হয় তাই বণিকশ্রেণীও এখন দেশে শক্তিশালী রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায়



সাহায্য করতে লাগল। এইভাবে ক্রমেই ইউরোপের দেশে দেশে শক্তিশালী জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব হ'ল।

## প্রশ্নাবলী

১। কেন ইউরোপে ভৌগোলিক আবিষ্কারের স্থচনা হয়েছিল? পোর্তুগাল ও স্পেন কেন সমুদ্র অভিযানে ও ভৌগোলিক আবিষ্কারে অগ্রণী হয়েছিল?

২। পোর্তুগালের সামুদ্রিক অভিযান ও ভৌগোলিক আবিষ্কার সম্পর্কে যা জান লিখ।

৩। স্পেনের সামুদ্রিক অভিযান ও ভৌগোলিক আবিষ্কার সম্পর্কে যা জান লিখ।

৪। কে প্রথম পৃথিবী পরিক্রমা করেছিলেন? তাঁর সম্পর্কে যা জান লিখ।

৫। এঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও: (ক) নৌচালক হেনরি; (খ) বার্থেলোমিউ ডিয়াজ; (গ) ভাস্কো-দা-গামা; (ঘ) পেড্রো কেব্রাল; (ঙ) খ্রীষ্টফার কলম্বাস; (চ) আমেরিগো ভেসপুচি।

৬। সংক্ষেপে উত্তর দাও:—

(ক) দক্ষিণ আফ্রিকা ঘুরে ভারতে আসার জলপথ কে আবিষ্কার করেছিলেন? তিনি ভারতের কোথায় নেমেছিলেন?

(খ) ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ কে আবিষ্কার করেছিলেন? আমেরিকার আদিবাসীদের নাম কেন ইণ্ডিয়ান হয়েছিল?

(গ) আজটেক সাম্রাজ্য কোথায় অবস্থিত ছিল?

(ঘ) ইংকাদের রাজ্য কোথায় অবস্থিত ছিল?

(ঙ) আমেরিকা নাম কার নাম অনুসারে হয়েছিল? কেন হয়েছিল?

(চ) ফিলিপাইন দ্বীপ-পুঞ্জ নাম হয়েছিল কেন?

৭। ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলাফল কি হয়েছিল?

৮। জাতীয়তাবোধ ও জাতীয় রাষ্ট্রগুলির উত্থান কিভাবে হয়েছিল?

৯। শূন্যস্থান পূরণ কর:—

(ক) কলম্বাস ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে পৌছেছিলেন — খ্রীষ্টাব্দে।

(খ) ডিয়াজ আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্তে পৌছেছিলেন — খ্রীষ্টাব্দে।

(গ) ভাস্কো-দা-গামা প্রথম ভারতে পৌঁছেছিলেন — খ্রীষ্টাব্দে।
(ঘ) কেব্রাল ব্রেজিলে পৌঁছেছিলেন — খ্রীষ্টাব্দে।

১০। ভুল অংশ কেটে দাও :—

(ক) কলম্বাস পোর্তুগালের জন্য/স্পেনের জন্য সমুদ্র অভিযান করেছিলেন।
(খ) কেব্রাল পোর্তুগালের জন্য/স্পেনের জন্য অভিযান করেছিলেন।
(গ) বালবোয়া পোর্তুগালের জন্য/স্পেনের জন্য অভিযান করেছিলেন।
(ঘ) ম্যাগেলান পোর্তুগালের জন্য/স্পেনের জন্য অভিযান করেছিলেন।

———

## চতুর্থ অধ্যায়

## ইউরোপে সংস্কার-আন্দোলন

**চার্চের ত্রুটি-বিচ্যুতি ঃ** রোমান ক্যাথলিক চার্চই রাশিয়া ছাড়া সমস্ত খ্রীষ্টান ইউরোপের একমাত্র ধর্মীয় সংস্থা ছিল। সকল দেশেই ছিল চার্চের বিশাল ভূ-সম্পত্তি ; রোম ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ছিল চার্চ-শাসিত বিশাল অঞ্চল ; তাছাড়া, সকল দেশের রাজা-রাজড়াদের ও জনসাধারণকে চার্চকে ধর্মীয় কর ও রাজস্ব দিতে হ'ত। চার্চ বিপুল ভূ-সম্পত্তি ও ধনদৌলতের অধিকারী হওয়ায় পোপ ও ধর্মযাজকরা বিলাস-ব্যসনের মধ্যে জীবন কাটাতেন। তাঁরা হয়ে উঠেছিলেন দুর্নীতিপরায়ণ। এটা যীশুখ্রীষ্টের বাণী ও আদর্শের বিপরীত ছিল। যীশু ত্যাগ, দারিদ্র্যবরণ এবং সরল ও সৎ জীবন যাপনকেই আদর্শ বলে প্রচার করেছিলেন। তাই ইউরোপের বহু চিন্তাশীল মানুষ রোমান ক্যাথলিক চার্চ, পোপ ও ধর্মযাজকদের নিন্দা করেছিলেন, যদিও এই রকম নিন্দা করা ছিল ধর্মদ্রোহ এবং দণ্ডনীয়।

যাঁরা এ বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন, তাঁরা হলেন ইংলণ্ডের অক্স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জন ওয়াইক্লিফ, বোহেমিয়ার

প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক **জন হাস্** এবং জার্মানির উইটেন্‌বার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক **মার্টিন লুথার**।

**জন ওয়াইক্লিফ**ঃ জন ওয়াইক্লিফ ছিলেন চতুর্দশ শতাব্দীর লোক। তিনি ছিলেন ইংলণ্ডের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, সুপণ্ডিত ও দেশপ্রেমিক। ঐ সময় ফ্রান্সের সঙ্গে ইংলণ্ডের যুদ্ধ চলছিল এবং পোপ রোম ছেড়ে ফ্রান্সে তাঁর প্রধান কার্যালয় স্থাপন করে ফ্রান্সে ছিলেন। পোপের দপ্তর ফ্রান্সে থাকায় পোপের কাছে ইংলণ্ড থেকে পাঠানো অর্থ ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের যুদ্ধে ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাই দেশপ্রেমিক ইংরেজরা পোপকে ইংলণ্ড থেকে অর্থ পাঠানোর বিরোধী ছিলেন এবং পোপের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডে পোপবিরোধী জনমত গড়ে উঠেছিল। এই সুযোগে জন ওয়াইক্লিফ পোপের বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করেন। তিনি ইংরেজি ভাষাতেই তাঁর নিবন্ধগুলি লিখতেন, তাই তাঁর বক্তব্য লোকে সহজেই বুঝতে পারত। তিনি ইংরেজি ভাষায় সর্বপ্রথম বাইবেল অনুবাদ ক'রে দেখান যে, রোমান ক্যাথলিক চার্চ খ্রীষ্টের বাণী ও আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। পোপ ও ধর্মযাজকরা বিলাস-ব্যসন ও দুর্নীতিতে মগ্ন রয়েছে। চার্চ এখন ধর্মের মূলকথা ভুলে কেবল অনুষ্ঠানসর্বস্ব হয়ে পড়েছে। মানুষের মুক্তির জন্য চার্চ ও ধর্মযাজকদের কোনও প্রয়োজন নেই ; মানুষ খ্রীষ্টের বাণী ও আদর্শ অনুসারে ত্যাগ, দারিদ্র্য, সততা ও সারল্যের মধ্যে জীবন কাটালেই মুক্তি পাবে।

ওয়াইক্লিফের এইসব কথা সাধারণ মানুষের, বিশেষতঃ গরীব কৃষকদের খুবই ভালো লাগল। তারা দলে দলে তার শিষ্য হ'ল। তাঁর শিষ্যরা **ললার্ড** নামে পরিচিত ছিল। তারা সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচার চালাতে থাকে। এই সময় ইংলণ্ডের নানা স্থানে কৃষক বিদ্রোহ দেখা দেয়। ধনী ও সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর লোকেরা কৃষক বিদ্রোহের জন্য ললার্ডদের ও ওয়াইক্লিফকে দায়ী করেন। ওয়াইক্লিফ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত হন। তিনি গ্রামাঞ্চলে গিয়ে বাকি জীবন কাটান। তাঁর জীবদ্দশায় তাঁকে ধর্মদ্রোহের অপরাধে শাস্তি

পেতে হয়নি সত্য, কিন্তু পরে কবর থেকে তাঁর মৃতদেহ তুলে ধর্মদ্রোহের অপরাধে পোড়ানো হয়।

**জন হাস্ঃ** বোহেমিয়ার (চেক অঞ্চল) প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জন হাস্‌কে জন ওয়াইক্লিফের রচনাগুলি গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। তিনিও ছিলেন সুপণ্ডিত ও দেশপ্রেমিক। তিনি পোপ ও ধর্মযাজকদের আরও তীব্রভাবে আক্রমণ করেন। তিনি বলেন, পোপ ও ধর্মযাজকরা নিজেরাই পাপে ডুবে আছেন, মানুষকে পাপ থেকে উদ্ধার করবার যোগ্যতা তাঁদের নেই। যাঁরা খ্রীষ্টের বাণী ও আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছেন, মানুষের জীবনের উপর কর্তৃত্ব করবার অধিকারও তাঁদের নেই। জন হাসের মতবাদ বোহেমিয়ায় খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তাঁর জনপ্রিয়তার জন্য স্বদেশে তাঁকে দমন করা সম্ভব হয় না। ঐ সময় একজন পোপের স্থলে রোম ও ফ্রান্সে দুজন পোপ নিজেদের প্রকৃত পোপ বলে দাবী করায় খ্রীষ্টান জগতে এক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। ঐ সমস্যার সমাধানের জন্য কনস্টান্স শহরে এক ধর্মসম্মেলন হয়। তাতে নিজের বক্তব্য রাখার জন্য জন হাস্‌কে ডেকে পাঠানো হয়। জন হাস্ তাঁর বক্তব্য রাখলে তাঁকে তাঁর মত প্রত্যাহার করতে বলা হয়। তিনি তাতে রাজী হন না। তখন তাঁকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়। এর প্রতিবাদে বোহেমিয়ায় গৃহযুদ্ধ বাধে। শেষে এই গৃহযুদ্ধ দমন করা হয়।

**মার্টিন লুথার ঃ** রোমান ক্যাথলিক চার্চ ও পোপতন্ত্রকে প্রচণ্ড আঘাত দেন মার্টিন লুথার। মার্টিন লুথার জার্মানির এক কৃষক-পরিবারে জন্মেছিলেন। তাঁকে তাঁর বাবা আইন পড়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠান। কিন্তু তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং উইটেন্‌বার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

রোমে সেন্ট পিটার্স গির্জার নূতন ভবন নির্মাণের জন্য অর্থসংগ্রহ করা হচ্ছিল। এই উদ্দেশ্যে **ইনডালজেন্স** বা মার্জনাপত্র বিক্রির জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। টাকা দিয়ে মার্জনাপত্র কিনলে পাপী তার পাপ থেকে মুক্তি পাবে। জার্মানিতে টেট্‌জেল নামে

এক ধর্মযাজক এই মার্জনাপত্র বিক্রি করছিল। এই ধরনের মার্জনাপত্র বিক্রির বিরুদ্ধে মার্টিন লুথার উইটেন্‌বার্গ গির্জার দরজায় একটি প্রতিবাদপত্র ঝুলিয়ে দেন। তাতে তিনি ৯৫-টি যুক্তি দেখান। ঐ যুক্তিগুলি এমন অকাট্য ছিল যে, সেগুলির ভিত্তিতে জার্মানিতে সাড়া পড়ে যায় এবং সংস্কার আন্দোলন দেখা দেয়।



মার্টিন লুথার

মার্টিন লুথারও জার্মান ভাষাতেই তাঁর প্রচারপত্র ও বই লিখতেন। তিনি লিখলেন, মানুষের ধর্মসাধনের ব্যাপারে পোপের কোনও কর্তৃত্ব নেই। মানুষ নিজের বিবেক ও বাইবেলের নির্দেশ অনুসারে ধর্মসাধন করলেই মুক্তি পাবে। তিনি জার্মান ভাষায় বাইবেলেরও অনুবাদ করলেন।

পোপ ক্রুদ্ধ হয়ে লুথারকে ধর্মচ্যুত ঘোষণা ক'রে এক পত্র লিখলেন। লুথার ঐ পত্র পুড়িয়ে ফেললেন। উত্তর জার্মানির বহু সামন্তরাজা তাঁকে সাহায্য করছিলেন। তাই তাঁকে দমন করা সহজ ছিল না। ঐ সময়ে পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের সম্রাট ছিলেন **পঞ্চম চার্লস্‌**। তিনি এক ধর্মসভা ডাকলেন এবং সেখানে বক্তব্য রাখার জন্য লুথারকে বললেন। লুথার ঐ ধর্মসভায় এসে বললেন, তাঁর মত বাইবেলের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তিনি যা করছেন, ঠিকই করছেন। সম্রাট পঞ্চম চার্লস্‌ লুথারকে ধর্মদ্রোহী ঘোষণা ক'রে তাঁর সমস্ত রচনা পুড়িয়ে ফেলতে আদেশ দিলেন। লুথারকে পাছে বন্দী ক'রে ধর্মদ্রোহের অপরাধে পুড়িয়ে মারা হয়, এই ভয়ে তাঁর প্রধান সমর্থক স্যাক্সনির ডিউক তাঁকে সরিয়ে দিলেন। লুথার আত্মগোপন করে রোমান ক্যাথলিক চার্চ ও পোপতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রচার চালাতে লাগলেন।

লুথারের সমর্থকের সংখ্যা দ্রুত বাড়তে লাগল। জার্মানির বহু সামন্তরাজ তাঁর সমর্থনে এগিয়ে এলেন। তাঁরা চার্চের ভূ-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নিলেন। অনেক জায়গায় কৃষক-বিদ্রোহও ঘটল। লুথারের মত দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে লাগল। এখন খ্রীষ্টানরা দুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হ'ল। লুথার পোপতন্ত্রের বিরুদ্ধে **প্রোটেস্ট** বা প্রতিবাদ করেছিলেন, তাই তাঁর সমর্থকরা **প্রোটেস্ট্যাণ্ট** নামে পরিচিত হলেন। আর পোপতন্ত্রে বিশ্বাসীদের নাম **রোমান ক্যাথলিকই** রইল।

পরে প্রোটেস্ট্যান্টরা আরও অনেক সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়েছিল। **জন ক্যালভিন** নামে একজন ফরাসী প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদকে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে যান। তাঁর প্রধান প্রচারকেন্দ্র ছিল সুইজারল্যাণ্ডের জেনেভা। তিনি গির্জার অনুষ্ঠান ও আড়ম্বরের বিরোধী ছিলেন। তিনি ধর্মযাজকদের মধ্যে কঠোর সংযম ও নিয়মানুবর্তিতা প্রবর্তন করেন। তিনি ধর্মযাজকদের নির্বাচনের ভিত্তিতে নিয়োগ করার ব্যবস্থাও করেন। তিনি নাচ, তাসখেলা, অশ্লীল ভাষা ব্যবহার প্রভৃতি নিষিদ্ধ করেন। তাঁর কঠোর ও উগ্র প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদ ইউরোপের বহু দেশে প্রাধান্য পায়।

**প্রোটেস্ট্যাণ্ট মতবাদের বিস্তার**ঃ প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মমত উত্তর জার্মানির সামন্তরাজ্যগুলিতে বিস্তার লাভ করেছিল। দক্ষিণ জার্মানির সামন্তরাজ্যগুলি অবশ্য রোমান ক্যাথলিক চার্চের সমর্থক ছিল। জার্মানির সংলগ্ন দেশগুলিতেও প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্ম বিস্তারলাভ করেছিল। সুইজারল্যাণ্ডে প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। নেদারল্যাণ্ডসের উত্তরাংশেও প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদ প্রাধান্য লাভ করেছিল। জার্মানির উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত সুইডেন, ডেনমার্ক ও নরওয়েতে প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কাল্‌ভিনের শিষ্য **জন নক্স** স্কটল্যাণ্ডে প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

ইংলণ্ডেও প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদ প্রবর্তিত হয়েছিল। অবশ্য তার কারণ ও রূপ কিছুটা স্বতন্ত্র ছিল। ঐ সময়ে ইংলণ্ডের রাজা ছিলেন

অষ্টম হেনরি। অষ্টম হেনরি স্পেনের রাজকন্যা **ক্যাথেরিন অব আরাগনকে** বিবাহ করেছিলেন। অষ্টম হেনরি **অ্যান্ বোলেনকে** বিবাহ করার জন্য ক্যাথেরিনের সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদের অনুমতি চান। স্পেন ছিল রোমান ক্যাথলিক দেশ। পোপ এই বিবাহ-বিচ্ছেদের অনুমতি না দিলে অষ্টম হেনরি রোমান ক্যাথলিক চার্চের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেন। তিনি রোমান ক্যাথলিক চার্চের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ক'রে নেন এবং নিজেকে ইংলণ্ডের চার্চের কর্তা বলে ঘোষণা করেন। এইভাবে ইংলণ্ডে প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্ম প্রবর্তিত হয়। তবে অষ্টম হেনরি ইংলণ্ডের চার্চে রোমান ক্যাথলিক অনুষ্ঠানগুলি বজায় রাখেন। পরে ইংলণ্ডে ক্যাল্ভিনপন্থী মতবাদ যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। এঁরা **পিউরিট্যান** নামে পরিচিত ছিলেন।

**রোমান ক্যাথলিক চার্চে সংস্কারসাধন :** রোমান ক্যাথলিক চার্চ তার নিন্দা ও সমালোচনা রোধ করার জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই রোমান ক্যাথলিক চার্চ ধর্মদ্রোহ অপরাধের জন্য বিচারের ব্যবস্থা করেছিল। বিচারে অপরাধীদের মৃত্যুদণ্ড হ'ত এবং তাদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হ'ত। একে বলা হয় **হোলি ইন্‌কুইজিশন**। এখন বিরোধী মতবাদ ও চার্চের সমালোচনা রোধ করার জন্য গির্জার এই বিচার-ব্যবস্থা বা হোলি ইন্‌কুইজিশনকে ব্যাপক ক'রে তোলা হ'ল। সবচেয়ে ব্যাপক-ভাবে এর প্রতিষ্ঠা হ'ল রোমান ক্যাথলিক রাষ্ট্র স্পেনে। অন্যান্য রোমান ক্যাথলিক রাষ্ট্রেও এর প্রচলন হ'ল।

রোমান ক্যাথলিক চার্চের সমালোচনা ও নিন্দার যেমন কণ্ঠরোধ করা হ'ল, তেমনি রোমান ক্যাথলিক চার্চকে দুর্নীতিমুক্ত ক'রে তোলারও চেষ্টা চলল। এ ব্যাপারে অগ্রণীর ভূমিকা নেন স্পেনের **সেণ্ট ইগ্‌নেটিয়াস অব্ লয়োলা**। তিনি প্রথম জীবনে সৈনিক ছিলেন। পরে তিনি সন্ন্যাসী হন এবং খ্রীষ্টধর্ম সংস্কারে মন দেন। তিনি খ্রীষ্টের জন্মস্থান পরিদর্শন করেন এবং খ্রীষ্টান ধর্মশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করেন। তিনি রোমান ক্যাথলিক চার্চকে দুর্নীতিমুক্ত ক'রে

তাকে পূর্ব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে চান। তিনি ধর্মযাজকদের জীবনে সংযম, সততা, দুর্নীতি ও সৈনিক সুলভ নিয়মানুবর্তিতা ফিরিয়ে আনেন। তাঁর প্রবর্তিত সম্প্রদায়ের লোকেরা **জেসুইট** নামে পরিচিত।

রোমান ক্যাথলিক চার্চের পোপ, ধর্মযাজক ও অনুরাগী রাজা-রাজড়া সকলেই রোমান ক্যাথলিক চার্চকে দুর্নীতিমুক্ত করতে চেষ্টা করেন। এজন্য ট্রেনট শহরে ধর্মীয় মহাসভার অনুষ্ঠান হয়। এই মহাসভা **কাউন্সিল অব্ ট্রেন্ট্** নামে পরিচিত। ১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই মহাসভার কয়েকটি অধিবেশন হয়। এই সম্মেলনে রোমান ক্যাথলিক চার্চের মূল মতবাদকে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট রূপ দেওয়া হয়। রোমান ক্যাথলিক ধর্মযাজকদের জীবন-যাত্রাতেও বহু পরিবর্তন ঘটানো হয়।

**পবিত্র রোম সাম্রাজ্যে ধর্মযুদ্ধ** : পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের সম্রাটরা নির্বাচিত হতেন। জার্মানির **হ্যাপস্‌বুর্গ** পরিবারের রাজারাই এখন সম্রাট নির্বাচিত হচ্ছিলেন। লুথার যখন প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মমত প্রচার করেছিলেন, তখন সম্রাট ছিলেন **পঞ্চম চার্লস্**। জার্মানি, অষ্ট্রিয়া, বোহেমিয়া, হাঙ্গেরি, ইটালি, স্পেন, নেদারল্যাণ্ড্‌স্ এবং মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার স্পেনিস অঞ্চল পঞ্চম চার্লসের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। তাঁর সাম্রাজ্যের নানা স্থানেই রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্টদের মধ্যে যুদ্ধ চলছিল। তিনি নিজে ছিলেন জার্মান এবং জার্মানিতেই এই যুদ্ধ প্রবল আকার ধারণ করেছিল। উত্তর জার্মানির সামন্তরাজারা ছিলেন প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মের সমর্থক এবং তাঁরা ঐক্যবদ্ধভাবে সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাচ্ছিলেন এবং প্রোটেস্ট্যান্ট রাজ্য সমবায় নামে একটি সংঘ গড়ে তুলেছিলেন। এই যুদ্ধ সুদীর্ঘকাল চলেছিল। পঞ্চম চার্ল্‌স্‌কে তুর্কী সম্রাট ও ফ্রান্সের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাতে হচ্ছিল। তাই উত্তর জার্মানির প্রোটেস্ট্যান্ট সামন্তরাজাদের বিরুদ্ধে তিনি বিশেষ সাফল্য লাভ করতে পারেননি। অবশেষে সম্রাট ও প্রোটেস্ট্যান্ট রাজ্য সমবায়ের মধ্যে **অগস্‌বার্গে** ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে এক সন্ধি হয়।

ঐ সন্ধির শর্ত অনুসারে প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মকেও স্বীকৃতি দেওয়া হয়। স্থির হয়, নিজ নিজ রাজ্যের ধর্ম রোমান ক্যাথলিক বা প্রোটেস্ট্যান্ট, কি হবে সামন্তরাজারাই তা স্থির করবেন। এও স্থির হয় যে, রোমান ক্যাথলিক সামন্তরাজাদের যেসব প্রজা প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্ম গ্রহণ করেছে, তাদের ধর্মবিশ্বাসে হস্তক্ষেপ করা হবে না।

**নেদারল্যাণ্ডসে প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদ দমনের চেষ্টা : হল্যাণ্ডের স্বাধীনতালাভ :** সম্রাট পঞ্চম চার্লস মরবার কিছুদিন আগে তাঁর সাম্রাজ্যকে তাঁর ছেলে **ফিলিপ** ও ভাই ফার্ডিন্যাণ্ডের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলেন। ফিলিপ পেয়েছিলেন স্পেন, নেদারল্যাণ্ড্স্, সিসিলি ও স্পেন-অধিকৃত আমেরিকান অঞ্চল। অষ্ট্রিয়া ও তার সন্নিহিত অঞ্চল পেয়েছিলেন ফার্ডিনাণ্ড। তিনিই পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের পরবর্তী সম্রাট হয়েছিলেন।

ফিলিপ স্পেনের রাজা **দ্বিতীয় ফিলিপ** নামে পরিচিত। তিনি নিজেকে রোমান ক্যাথলিক ধর্মের রক্ষক মনে করতেন। তাই নেদারল্যাণ্ড্স্ থেকে তিনি প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্ম উৎখাত করার চেষ্টা করলেন।

নেদারল্যাণ্ড্সে বহু বড় শহর গড়ে উঠেছিল এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে নেদারল্যাণ্ড্স্ উন্নত ছিল। এখানকার ধনিক সম্প্রদায় প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁরা এই চেষ্টার বিরোধিতা করতে লাগলেন। ফিলিপ নেদারল্যাণ্ড্স্কে কঠোরভাবে শাসন করবার জন্য স্পেনিয়ার্ড কর্মচারীদের নিয়োগ করলেন। তারা নেদারল্যাণ্ড্সের অধিবাসী ওলন্দাজদের ওপর অত্যাচার করায় উত্তর নেদারল্যাণ্ড্সের ওলন্দাজ অঞ্চলে বিদ্রোহ দেখা দিল। ফিলিপ এই বিদ্রোহ দমনের জন্য ডিউক অব আল্ভাকে নেদারল্যাণ্ড্সের শাসনকর্তা করে পাঠালেন। ডিউক অব্ আল্ভা নৃশংসভাবে বিদ্রোহ দমন করলেন, অসংখ্য বিদ্রোহীকে তিনি হত্যা করলেন, তাদের ধনসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ক'রে নিলেন।

এতে ওলন্দাজরা আরও ক্রুদ্ধ হ'ল। তারা **উইলিয়ম অব অরেঞ্জের** নেতৃত্বে স্পেনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা লাভের জন্য যুদ্ধ শুরু

করল। তারা প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে শেষে বিজয়ী হ'ল এবং নেদারল্যাণ্ড্‌সের সাতটি প্রদেশ সংযুক্ত হয়ে **হল্যাণ্ড** নামে স্বাধীনতা ঘোষণা করল। হল্যাণ্ডে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হ'ল। হল্যাণ্ডের স্বাধীনতা স্বীকৃতি পেতে অনেক সময় লাগে। অবশেষে, ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ওয়েস্টফেলিয়ার সন্ধি অনুসারে হল্যাণ্ড স্বাধীন দেশ ব'লে স্বীকৃতি পায়। পরে অবশ্য হল্যাণ্ডে রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়।

নেদারল্যাণ্ড্‌সের দক্ষিণাংশ বেলজিয়াম স্পেনের অধীন থাকে। এখানে রোমান ক্যাথলিক ধর্মই প্রতিষ্ঠিত থাকে। পরে এই অংশ অস্ট্রিয়ান নেদারল্যাণ্ড্‌স্ নামে পরিচিত হয়। বেলজিয়াম পরে স্বাধীন হয় এবং এখানেও রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ঘটে।

**প্রোটেস্ট্যাণ্ট ইংলণ্ডে ফিলিপের প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা:** ১৫৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজা অষ্টম হেনরির মৃত্যু হ'লে তাঁর পুত্র **ষষ্ঠ এডোয়ার্ড** রাজা হন। ষষ্ঠ এডোয়ার্ডের সময়ে ইংলণ্ডে প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মমতের আরও বিস্তার ঘটে। কিন্তু ১৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ষষ্ঠ এডোয়ার্ডের মৃত্যু হ'লে তার জ্যেষ্ঠা ভগিনী **মেরী** ইংলণ্ডের রানী হন। মেরীর মা ছিলেন স্পেনের রাজা ফার্ডিনাণ্ড ও রানী ইসাবেলার কন্যা ক্যাথেরিন। ক্যাথেরিনকে ত্যাগ করা নিয়েই রোমান ক্যাথলিক চার্চের সঙ্গে রাজা অষ্টম হেনরির বিবাদ হয়েছিল। তাই মেরী ছিলেন রোমান ক্যাথলিক ধর্মে বিশ্বাসী। তিনি রানী হয়ে ইংলণ্ডে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন। স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ রোমান ক্যাথলিক ধর্ম সম্পর্কে উৎসাহী হওয়ায় তিনি তাঁকে বিবাহ করলেন। কিন্তু ইংরেজরা এই বিবাহকে ভালো চোখে দেখল না। এতে ইংলণ্ডের পরে স্পেনের অধীন হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাছাড়া, তারা রোমান ক্যাথলিক ধর্মেরও বিরোধী ছিল। ফিলিপের সঙ্গে বিবাহের পর ফিলিপের উৎসাহে রানী মেরী ইংলণ্ডে প্রোটেস্ট্যান্টদের উপর নির্মম অত্যাচার চালান, ফলে অনেকে নিহত হয় ও অনেকে দেশত্যাগ করে। মেরী ইংলণ্ডে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন।

কিন্তু ১৫৫৯ খ্রীষ্টাব্দে রানী মেরীর মৃত্যু হলে তাঁর ভগিনী অ্যান বোলেনের কন্যা **এলিজাবেথ** রানী হন। তিনি ছিলেন প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মে বিশ্বাসী। তিনি ইংলণ্ডের চার্চকে রোমান



রানী এলিজাবেথ

ক্যাথলিক চার্চ থেকে বিচ্ছিন্ন করেন এবং রোমান ক্যাথলিক ধর্মযাককদের বিতাড়িত করেন। বহু রোমান ক্যাথলিক তাঁর রাজত্বকালে ধর্মদ্রোহের অপরাধে নিহত হয়। ইংলণ্ডে প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এইভাবে ইংলণ্ডে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টায় দ্বিতীয় ফিলিপ ব্যর্থ হন। এখন ইংলণ্ড স্পেনের প্রবল শত্রুরূপে দেখা দেয়।

**স্পেনিশ আর্মাডা : ফিলিপের ব্যর্থতা :** রানী এলিজাবেথের সময়ে দুঃসাহসিক ইংরেজ নাবিকরা প্রাচ্য ও নবাবিষ্কৃত আমেরিকায় ব্যবসা-বাণিজ্য ও অভিযান চালায়। ইংরেজ নাবিক জন হকিন্স আফ্রিকার উপকূলভাগ থেকে নিগ্রোদের ধরে আমেরিকায় স্পেনিয়ার্ডদের কাছে বিক্রি করেন। আর একজন দুঃসাহসিক ইংরেজ নাবিক ফ্রান্সিস ড্রেক হকিন্সের সঙ্গে যোগ দেন। হকিন্স ও ড্রেকের

জাহাজগুলিকে স্পেনের যুদ্ধজাহাজ আক্রমণ করলে তাঁরা কোন রকমে পালিয়ে প্রাণরক্ষা করেন। এর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ড্রেক জলদস্যুতার পথ নেন এবং স্পেনের স্বর্ণরৌপ্য ও বহুমূল্য পণ্যে ভরা বহু জাহাজ লুণ্ঠন করেন। তাঁর দেখাদেখি অন্যান্য ইংরেজ নাবিকরাও স্পেনের জাহাজে জলদস্যুতা করতে থাকে।

১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ড্রেক দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ প্রান্ত ঘুরে আমেরিকার অপর উপকূলে যান। স্পেনের যে জাহাজগুলি ইংকাদের রাজ্য থেকে স্বর্ণরৌপ্য নিয়ে স্পেনে আসছিল, সেগুলিকে তিনি পথে লুণ্ঠন করেন। তিনি উত্তর আমেরিকার ক্যালিফর্নিয়া আবিষ্কার করেন; তারপর প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে ম্যাগেলানের মতো পৃথিবী পরিক্রমা ক'রে অগাধ স্বর্ণরৌপ্য, ধনরত্ন, মশলা ও বহুমূল্য পণ্য নিয়ে স্বদেশে ফেরেন। রানী এলিজাবেথ তাঁকে স্যার উপাধিতে ভূষিত করেন।

ইংরেজ জলদস্যুদের ক্রমাগত স্পেনের জাহাজগুলির উপর আক্রমণ চালানোর প্রতিবাদ করেন রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ। রানী এলিজাবেথ জলদস্যুদের উৎসাহ দিলেও ফিলিপকে জানান যে, তিনি ইংরেজ জলদস্যুদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না।

ফিলিপ ইংরেজদের জলদস্যুতা বন্ধ করার জন্য কৃতসংকল্প হলেন। তিনি ইংলণ্ড আক্রমণের জন্য এক বিরাট নৌবহর বা আর্মাডা গড়ে তুললেন। একশ ত্রিশটি যুদ্ধ জাহাজ ছিল এই নৌবহরে। জাহাজগুলিতে ছিল প্রায় বিশ হাজার সৈন্য ও প্রায় একহাজার নাবিক।

স্পেনিশ আর্মাডার ইংলণ্ড আক্রমণের প্রস্তুতির সংবাদ পেয়ে রানী এলিজাবেথও প্রস্তুত হলেন। তিনি উপকূলভাগ থেকে বৃটিশ জাহাজগুলিকে একত্রে জড়ো করলেন। সেগুলি স্পেনিশ জাহাজের তুলনায় আকারে ছোট হওয়ায় সেগুলিকে সহজেই ইচ্ছামতো ঘোরানো-ফেরানো যেত; সেগুলি ছিল ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন এবং মুহুর্মুহু ছোঁড়া যায় এমন সব কামানে সজ্জিত।

স্পেনিশ আর্মাডা ইংলণ্ডের দিকে অগ্রসর হ'লে বৃটিশ নৌবহর

তাকে আক্রমণ করল। স্পেনিশ আর্মাডার জাহাজগুলি বিরাটাকার হওয়ায় সেগুলি ছিল মন্থরগতি ও ইচ্ছামতো ঘোরানো-ফেরানোর পক্ষে অনুপযোগী। বৃটিশ নৌবহরের আক্রমণে স্পেনিশ আর্মাডা পর্যুদস্ত হল এবং আত্মরক্ষার জন্য দ্রুত স্পেনে ফিরতে চেষ্টা করল। কিন্তু পথে প্রচণ্ড ঝড়ে পড়ে তা বিধ্বস্ত হ'ল।

এইভাবে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ফিলিপের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল।

## প্রশ্নাবলী

১। রোমান ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে মানুষ কেন ক্ষুব্ধ হয়েছিল ?

২। জন ওয়াইক্লিফ কে ছিলেন ? তিনি রোমান ক্যাথলিক চার্চের কি সমালোচনা করেছিলেন ? তাঁর সম্পর্কে কি জান ?

৩। জন হাস্ কে ছিলেন ? তাঁর সম্পর্কে কি জান ?

৪। মার্টিন লুথার কে ছিলেন ? রোমান ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রামের বিবরণ দাও। এই সংগ্রামের ফল কি হয়েছিল ?

৫। প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মের বিস্তার-কাহিনী সংক্ষেপে লিখ।

৬। রোমান ক্যাথলিক ধর্মকে রক্ষার জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল ?

৭। সম্রাট পঞ্চম চার্ল্‌সের সঙ্গে জার্মানির প্রোটেস্ট্যাণ্ট সামন্তরাজদের যুদ্ধের কাহিনী লিখ। এই যুদ্ধের পরিণতি কি হয়েছিল ?

৮। ফিলিপ কিভাবে স্পেনের রাজা হয়েছিলেন ? নেদারল্যাণ্ড্‌স্ থেকে প্রোটেস্ট্যাণ্ট মতবাদ উৎখাত করার জন্য তিনি কি করছিলেন ? তার ফল কি হয়েছিল ?

৯। ইংলণ্ড থেকে প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্ম উচ্ছেদ করার জন্য স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ কি করেছিলেন ? কিভাবে তাঁর সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল ?

১০। কেন দ্বিতীয় ফিলিপ স্পেনিশ আর্মাডা গড়ে তুলেছিলেন ? স্পেনিশ আর্মাডার পরিণতি কি হয়েছিল ?

১১। টীকা লিখ : (ক) জন ক্যাল্‌ভিন ; (খ) রানী মেরী ; (গ) জন নক্স ; (ঘ) স্যার ফ্রান্সিস ড্রেক ; (ঙ) স্পেনিশ আর্মাডা।

১২। সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) কোন্ ইংরেজ নাবিক প্রথম পৃথিবী পরিক্রমা করেছিলেন ?
(খ) কোন্ সামন্তরাজ মার্টিন লুথারের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ?
(গ) 'মার্জনাপত্র' কি ?
(ঘ) মার্জনাপত্রের প্রতিবাদে মার্টিন লুথার কতগুলি যুক্তি দিয়েছিলেন ?
(ঙ) সর্বপ্রথম ইংরাজী ভাষায় কে বাইবেল অনুবাদ করেছিলেন ?
(চ) সর্বপ্রথম জার্মান ভাষায় কে বাইবেল অনুবাদ করেছিলেন ?
(ছ) 'হোলি ইনকুইজিশন্' কি ;
(জ) জেসুইট সম্প্রদায়ের প্রবর্তক কে ছিলেন ?
(ঝ) 'প্রোটেস্ট্যান্ট' নাম হয়েছিল কেন ?
(ঞ) অগ্‌সবুর্গের সন্ধি কাদের মধ্যে হয়েছিল ? ঐ সন্ধির প্রধান প্রধান শর্ত কি ছিল ?

---

## পঞ্চম অধ্যায়

# সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে বিপ্লব

**রাজা ও পার্লামেন্টের বিরোধ ও তার প্রধান কারণ** : এখন ইংলণ্ডে পার্লামেন্টই দেশের প্রকৃত শাসক, রাজা বা রানী নামমাত্র শাসক বা শাসিকা। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিক পার্লামেন্ট এমন শক্তিশালী ছিল না। ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইংলণ্ডের রাজা জনের কাছ থেকে ইংলণ্ডের সামন্তরা তাঁদের ও প্রজাদের অধিকার সম্পর্কে কিছু লিখিত প্রতিশ্রুতি আদায় করেছিলেন। এই লিখিত প্রতিশ্রুতিগুলি **ম্যাগ্‌না কার্টা** বা **মহাসনদ** নামে পরিচিত। ম্যাগ্‌না কার্টায় ইংলণ্ডের পার্লামেন্টের সূচনা হয়েছিল বলা যায়। গোড়ার দিকে বড় বড় সামন্ত ও ধর্মযাজকদের নিয়ে একটি পরিষদ গড়ে উঠেছিল। তা ছিল **হাউস অব লর্ডস্**।

পরে ছোট ছোট সামন্ত, জমিদার ও শহরের অধিবাসীদের প্রতিনিধি-দের নিয়ে গড়ে ওঠে **হাউস অব কমন্স্**। হাউস অব কমন্স্ ও হাউস অব লর্ডস্ নিয়েই ইংলণ্ডের পার্লামেন্ট। গোড়ার দিকে রাজার কাছে আবেদন-নিবেদন করা ছাড়া হাউস অব কমন্সের বিশেষ কোনও ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু ক্রমেই তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং রাজার কর স্থাপনের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে থাকে। শেষে রাজা কমন্সের বিনা অনুমোদনে কর ধার্য করতে পারবেন না, কমন্স এই অধিকার আদায় করে। রানী এলিজাবেথ নিজের ইচ্ছামতো দেশ শাসন করতেন সত্য, কিন্তু পার্লামেন্টকে খুশি রেখেই চলতেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর এই অবস্থার পরিবর্তন হ'ল।

১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে রানী এলিজাবেথের মৃত্যু হ'ল। তিনি ছিলেন চিরকুমারী। এলিজাবেথের পিসী ছিলেন মার্গারেট। মার্গারেটের পুত্র পঞ্চম জেম্স্ ছিলেন স্কটল্যাণ্ডের রাজা। রাজা পঞ্চম জেম্সের মেয়ে মেরী স্টুয়ার্টের পুত্র ছিলেন ষষ্ঠ জেম্স্। এলিজাবেথের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারসূত্রে এই ষষ্ঠ জেম্স্ই **প্রথম জেম্স্** নামে ইংলণ্ডের রাজা হলেন।

রাজা প্রথম জেম্স্ ছিলেন স্কটল্যাণ্ডের লোক ; তাই ইংরেজরা তাঁকে বিদেশী মনে করত। ইংলণ্ডের চিরাচরিত রীতিনীতি ও নিয়ম-কানুনের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল না। তিনি মনে করতেন, ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা ও অধিকার বলে তিনি রাজা হয়েছেন। সুতরাং, তাঁর ইচ্ছামতোই দেশের শাসন চলবে। তাঁর শাসনকালে স্কটল্যাণ্ডের বহুলোক উচ্চ-পদে রাজকার্যে নিযুক্ত হয়েছিল। তা-ও ইংরেজদের বিরক্ত করেছিল। ধর্মের ব্যাপারে তিনি ইংলণ্ডের চার্চকে রোম থেকে বিচ্ছিন্ন রাখার পক্ষপাতী হলেও চার্চে রোমান ক্যাথলিক অনুষ্ঠান প্রচলনের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু রানী এলিজাবেথের সময় ইংলণ্ডে প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্ম ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়েছিল এবং ক্যালভিনপন্থী প্রোটেস্ট্যান্টরা—পিউরিটানরা—যথেষ্ট প্রভাবশালী ছিলেন। ধর্মীয় কারণেও ইংরেজরা জেম্সের ওপর বিরক্ত হয়েছিল। জেম্স্ যে বৈদেশিক নীতি

অনুসরণ করেছিলেন, তাতেও ক্যাথলিকদের প্রতি তাঁর প্রীতিই ফুটে উঠেছিল। তিনি সকল বিষয়েই পার্লামেন্টকে উপেক্ষা করতেন।



রাজা প্রথম জেম্‌স্

এইভাবে রাজার সঙ্গে পার্লামেন্টের বিরোধের সূত্রপাত হয়েছিল। ১৬২৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম জেম্‌সের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র **প্রথম চার্ল্‌স্** রাজা হলেন। তাঁর সময়েই পার্লামেন্টের সঙ্গে রাজার বিরোধ চরমে উঠলো। ক্যাথলিক স্পেনের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য পার্লামেন্ট তাঁকে অর্থ মঞ্জুর করেছিল। কিন্তু স্পেনের সঙ্গে যুদ্ধে তাঁর অনিচ্ছা দেখা গেল এবং তিনি ঐ টাকা অন্যভাবে ব্যয় করলেন। চার্লস্‌ আরও টাকা দাবি করলেন। পার্লামেন্ট তাঁকে মাত্র একবছরের জন্য শুল্ক সংগ্রহের অনুমতি দিল ও অন্য অর্থসাহায্য বন্ধ রাখল। চার্লস্‌ ক্রুদ্ধ হয়ে

পার্লামেন্ট ভেঙে দিলেন। চার্লস্ বাধ্যতামূলকভাবে ঋণ সংগ্রহ করতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাতে তিনি সফল হলেন না। তখন তিনি আবার পার্লামেন্ট ডাকতে বাধ্য হলেন। এখন নূতন পার্লামেন্ট তাঁর কাছে একটি **অধিকারের আবেদন** পেশ করল। রাজা বাধ্য হয়ে ঐ আবেদনপত্রে পার্লামেন্ট যেসব দাবি করেছিল, তা মেনে নিলেন। রাজা পার্লামেন্টের সম্মতি ছাড়া কর আদায় করতে পারবেন না, বিনা বিচারে কাউকে কারারুদ্ধ করতে পারবেন না, গৃহস্থদের বাড়িতে সৈন্য মোতায়েন করতে পারবেন না, যুদ্ধের সময় ছাড়া সামরিক আইন জারি করতে পারবেন না, ব'লে স্বীকার করলেন। রাজা সাময়িকভাবে আবেদনপত্রের দাবিগুলি মেনে নিলেও পরে তিনি আবেদনপত্রের রচয়িতা স্যার ইলিয়টকে কারারুদ্ধ ক'রে পার্লামেন্ট ভেঙে দিলেন। এরপর তিনি এগারো বছর পার্লামেন্ট না ডেকেই নিজের ইচ্ছামতো দেশ শাসন করতে লাগলেন।



প্রথম চার্লস্

এই সময়ে তাঁর প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন লড। তাঁর পরামর্শে চার্লস্ অবৈধভাবে নানারকম কর বসিয়ে অর্থ সংগ্রহ করতে লাগলেন। লড ধর্মীয় ব্যাপারে নানারূপ সংস্কার করতে চেষ্টা করায় পিউরিটানরা চটলেন। বিরোধীদের দণ্ড দেওয়ার জন্যই দুটি আদালত বসানো হ'ল।

স্কটল্যাণ্ডে প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্ম প্রচলিত ছিল। সেখানেও চার্লস্ হস্তক্ষেপ করতে চেষ্টা করলেন। ফলে স্কচদের সঙ্গে চার্লসের যুদ্ধ বাধল। এই যুদ্ধে চার্লস্ ইংলণ্ডের সমর্থন পেলেন না। যুদ্ধের ব্যয় বাবদ অর্থ মঞ্জুর করার জন্য রাজা পার্লামেন্ট ডাকতে বাধ্য হলেন।

পার্লামেন্ট বলল, আগে প্রজাদের অভিযোগের মীমাংসা করতে হবে। রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে পার্লামেন্ট ভেঙে দিলেন। স্কচদের সঙ্গে যুদ্ধে হেরে রাজা অপমানজনক শর্তে সন্ধি করতে বাধ্য হলেন। এই অবস্থায় চার্লস্ আবার পার্লামেন্ট ডাকতে বাধ্য হলেন।

পার্লামেন্ট প্রথমেই রাজার স্বেচ্ছাচার বন্ধ করল এবং লঁডের প্রাণদণ্ড হ'ল। চার্লস্ পার্লামেন্টের প্রধান নেতাদের বন্দী করার চেষ্টা করলে পার্লামেন্ট রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল (১৬৪২ খ্রীঃ)।

**গৃহযুদ্ধ** ( ১৬৪২-৪৭ খ্রীঃ) : রাজার বিরুদ্ধে পার্লামেন্টের এই যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধ বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে এ ছিল পৃথিবীর প্রথম প্রজাতন্ত্রী বিপ্লব। পার্লামেন্টের সদস্য **অলিভার ক্রমওয়েল** এই যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন। তিনি সাধারণ মানুষদের নিয়ে এক দুর্জয় সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলেন। এই সৈন্যবাহিনীর নাম **আয়রনসাইড**। চার্লস্ পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করলেন। দেশদ্রোহের অপরাধে তাঁর প্রাণদণ্ড হ'ল। ১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে জানুয়ারি তাঁর শিরশ্ছেদ করা হ'ল।

**ক্রমওয়েল ও প্রজাতন্ত্র** : চার্লসের মৃত্যুর ফলে ইংলণ্ডে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হ'ল। এই প্রজাতন্ত্রের প্রধান হলেন ক্রমওয়েল। ক্রমওয়েল আয়ারল্যাণ্ডে ক্যাথলিকদের বিদ্রোহ কঠোর হস্তে দমন করলেন। রাজাকে এইভাবে হত্যা করায় ইউরোপে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু ক্রমওয়েলের দুর্ধর্ষ সৈন্যবাহিনী আয়রনসাইডের ভয়ে কেউ প্রতিবাদ করতে সাহস পেলো না। ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ক্রমওয়েল পার্লামেন্ট ভেঙে দিয়ে একনায়করূপেই দেশ শাসন করতে লাগলেন। অলিভার ইংলণ্ডকে **কমনওয়েলথ্** বা সর্বজনহিতকর রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করলেন। তাঁর সুদৃঢ় শাসনে ইংলণ্ড খুবই শক্তিশালী



অলিভার ক্রমওয়েল

হয়ে উঠল। তিনি হল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে যে সন্ধি করলেন, তা ইংলণ্ডের পক্ষে খুবই লাভজনক হয়ে উঠল। ইংলণ্ড স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হয়ে ডানকার্ক, জ্যামাইকা দ্বীপ ও কয়েক জাহাজ রৌপ্য পেলো। ক্রমওয়েলের কয়েক বৎসরের শাসনে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পে দ্রুত উন্নতি ঘটল। কিন্তু ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ক্রমওয়েলের মৃত্যু হ'ল। তাঁর শূন্য স্থান পূরণের মতো কেউ ছিল না। ফলে পুনরায় রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করতে হল।

**রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঃ** প্রথম চার্লসের পুত্র যুবরাজ দ্বিতীয় চার্লস্ ফ্রান্সে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁকে ইংলণ্ডে ফিরিয়ে এনে রাজা করা হ'ল। তিনি পার্লামেন্টের সঙ্গে সদ্ভাব রেখেই চললেন।

**গৌরবময় বিপ্লব ঃ** দ্বিতীয় চার্লসের মৃত্যু হলে তাঁর ভাই **দ্বিতীয় জেম্‌স্** রাজা হলেন। কিন্তু তিনি তাঁর পিতার পদাঙ্কই অনুসরণ করলেন। তিনি ছিলেন গোঁড়া ক্যাথলিক। তিনি ইংলণ্ডে ক্যাথলিক ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন। তিনি পার্লামেন্টের প্রতিবাদে কর্ণপাত করলেন না। ফলে ইংরেজরা তাঁর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালো। দ্বিতীয় জেম্‌সের কন্যা মেরীর বিবাহ হয়েছিল হল্যাণ্ডের **প্রিন্স উইলিয়ম অব্ অরেঞ্জের** সঙ্গে। প্রিন্স উইলিয়ম ছিলেন প্রোটেস্ট্যান্ট। ইংলণ্ডের নেতারা তাঁকে ইংলণ্ডের সিংহাসন অধিকার করতে আমন্ত্রণ জানালেন। প্রিন্স উইলিয়ম সসৈন্যে ইংলণ্ডে অবতরণ করলে রাজা দ্বিতীয় জেম্‌স্ ইউরোপে পালিয়ে গেলেন। এইভাবে বিনা রক্তপাতে উইলিয়ম ইংলণ্ডের রাজা হলেন (১৬৮৮ খ্রীঃ)। পার্লামেন্ট **বিল অব্ রাইট্‌স্** বা অধিকারসমূহ সংক্রান্ত আইনের দ্বারা রাজার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করে দিল। বিল অব্ রাইট্‌সে বলা হল, পার্লামেন্টের বিনা অনুমতিতে রাজা কর স্থাপন করতে পারবেন না ; রাজাকে দেশের আইন মেনে চলতে হবে ; পার্লামেন্টের নির্বাচনে রাজা হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না ; পার্লামেন্টের সদস্যরা স্বাধীনভাবে নিজ নিজ মতামত প্রকাশ করতে পারবেন। পার্লামেন্ট **অ্যাক্ট অব্ সেটেলমেণ্ট** বা উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইনের দ্বারা

স্থির ক'রে দিলেন, কোন ক্যাথলিক ইংলণ্ডের সিংহাসনে বসতে পারবেন না।

বিনা রক্তপাতে পার্লামেন্ট বিজয়ী হওয়ায় একে বলা হ'ল **গৌরবময় বিপ্লব**।

## প্রশ্নাবলী

১। ইংলণ্ডে পার্লামেন্টের সূচনা হয়েছিল কিভাবে? পার্লামেন্টের কি বিশেষ অধিকার ছিল?

২। প্রথম জেম্স্ ও প্রথম চার্লসের পার্লামেন্টের সঙ্গে বিরোধের কারণ কি?

৩। সপ্তদশ শতাব্দীতে কেন ইংলণ্ডে গৃহযুদ্ধ বেধেছিল? ঐ গৃহযুদ্ধের বিবরণ দাও।

৪। অলিভার ক্রমওয়েল সম্পর্কে যা জান লিখ।

৫। ইংলণ্ডের গৌরবময় বিপ্লব সম্পর্কে যা জান লিখ। একে গৌরবময় বিপ্লব বলা হয় কেন?

৬। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও:

(ক) পার্লামেন্ট কি?

(খ) আয়রনসাইড কাদের বলা হত?

(গ) কোন্ রাজার সময়ে ইংলণ্ডে গৃহযুদ্ধ হয়েছিল?

(ঘ) কোন্ রাজার সময়ে ইংলণ্ডে গৌরবময় বিপ্লব হয়েছিল?

(ঙ) দ্বিতীয় জেম্সের পরে ইংলণ্ডে কে রাজা হয়েছিলেন?

(চ) প্রিন্স উইলিয়ম অব্ অরেঞ্জ কোন্ দেশের লোক?

(ছ) লড কে ছিলেন? কিভাবে তাঁর জীবন শেষ হয়েছিল?

৭। শূন্যস্থান পূরণ কর:

(ক) — খ্রীষ্টাব্দে রানী এলিজাবেথের মৃত্যু হয়েছিল।

(খ) — খ্রীষ্টাব্দে রাজা প্রথম চার্লস্ ও পার্লামেন্টের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছিল।

(গ) — খ্রীষ্টাব্দে রাজা প্রথম চার্লসের শিরশ্ছেদ হয়েছিল।

(ঘ) — খ্রীষ্টাব্দে প্রিন্স উইলিয়াম অব্ অরেঞ্জ ইংলণ্ডের রাজা হয়েছিলেন।

## ষষ্ঠ অধ্যায়

### (ক) মুঘল সাম্রাজ্য

**মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার ঃ** ইউরোপে যখন নবজাগরণ, ভৌগোলিক আবিষ্কার ও ধর্মবিপ্লব চলছিল, তখন ভারতের রাজনীতিতেও এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছিল। সুলতানী আমলের শেষভাগে ভারত আবার বহু ক্ষুদ্র ও খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। তৈমুরলঙ্গের মতো ভয়ংকর বিদেশী আক্রমণকারী ভারত আক্রমণ করেছিলেন। ভারত খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ভারতের যখন এইরকম ছিন্নভিন্ন অবস্থা, তখন ভারতে একটি ঐক্যবদ্ধ বিশাল সাম্রাজ্যের সূচনা করলেন **জহিরুদ্দিন মহম্মদ বাবর।**

বাবর ছিলেন জাতিতে তুর্কী, তৈমুরলঙ্গের বংশধর। মায়ের দিক থেকেও তাঁর দেহে মঙ্গোল বীর চেঙ্গিস্ খানের রক্ত প্রবাহিত ছিল। বাবর ও তাঁর বংশধররা তুর্কী হ'লেও **মুঘল** নামে পরিচিত। বাবরের বাবা **ওমর শেখ মির্জা** তুর্কীস্থানের ফরগনা নামে এক ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজা ছিলেন। বাবরের বয়স যখন মাত্র এগারো বছর তখন তাঁর বাবা মারা যান। বাবর কিশোর বয়সে যথেষ্ট বীরত্বের পরিচয় দিলেও পিতৃরাজ্য থেকে বিতাড়িত হন এবং ভাগ্যান্বেষণে বার হয়ে কাবুল অধিকার করেন। আফগানিস্থানের পূর্বদিকেই ভারতবর্ষ। তাঁর পূর্বপুরুষ তৈমুরলঙ্গ একদা উত্তর-পশ্চিম ভারত অধিকার করেছিলেন। তাই ভারত জয়ের কামনা বাবরের মনে প্রবল হয়ে ওঠে।



বাবর

এই সময়ে দিল্লিতে আফগান স্থলতান ছিলেন **ইব্রাহিম লোদী**। ইব্রাহিম লোদী ছিলেন বয়সে তরুণ ও অনভিজ্ঞ। তাঁর ব্যবহারে তাঁর আত্মীয়-স্বজন ও আমীর-ওমরাহরা অনেকেই বিরক্ত হয়েছিলেন। তাঁদের আমন্ত্রণে বাবর ভারত আক্রমণ করলেন। দিল্লির কাছে পানিপথের প্রান্তরে ইব্রাহিম লোদীর সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধ হ'ল। যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদী পরাজিত ও নিহত হলেন (১৫২৬ খ্রীঃ)। এইভাবে দিল্লিতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হ'ল।

বাবর দিল্লি অধিকার করে দেখলেন তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী মেবারের রানা **সংগ্রাম সিংহ**। স্থলতানদের দুর্বলতার স্থযোগে সংগ্রাম সিংহ ভারতে একটি শক্তিশালী হিন্দুরাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করছিলেন। বাবর দিল্লি অধিকার করায় সংগ্রাম সিংহের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ বাধল। পর বৎসর খানুয়ার যুদ্ধে বাবর সংগ্রাম সিংহকে পরাজিত করলেন। পূর্ব দিকে ইব্রাহিম লোদীর ভাই মামুদ লোদীর অধীনে আফগানরা সংঘবদ্ধ হয়েছিল। বাবর পাটনার কাছে এক যুদ্ধে তাদের পরাজিত করলেন। এইভাবে বাবরের সাম্রাজ্য পশ্চিমে আফগানিস্থান থেকে পূর্বে বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত হ'ল। এর অল্পকাল পরেই বাবরের মৃত্যু হ'ল (১৫৩০ খ্রীঃ)।



হুমায়ুন

বাবরের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ-পুত্র **হুমায়ুন** দিল্লির বাদশা হলেন। কিন্তু ঐ সময়ে বিহারে **শের খাঁ** নামে এক আফগান বীর খুবই শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন। তিনি বিহার ও বাংলাদেশ জয় করেন। হুমায়ুন তাঁকে দমন করতে চেষ্টা

ক'রে ব্যর্থ হন এবং তাঁর হাতে পর পর চৌসা ও বিলগ্রামের যুদ্ধে পরাজিত হন। শের খাঁ দিল্লি অধিকার ক'রে **শের শাহ্** নামে সম্রাট হন (১৫৪০ খ্রীঃ)। হুমায়ুন রাজ্যহারা, গৃহহারা হয়ে পারস্যে পলায়ন করেন। কিন্তু এর পাঁচ বছর বাদেই কালঞ্জর দুর্গ অবরোধ কালে বারুদের গুদামে আগুন লেগে হঠাৎ শের শাহের মৃত্যু হয়। পূর্বে বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমে পাঞ্জাব পর্যন্ত উত্তর ভারত শের শাহের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল। তিনি অল্প কালের মধ্যেই এই সুবিশাল অঞ্চলে সুশাসনের ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি হিন্দু-মুসলমান সকলকেই সমান চক্ষে দেখতেন। তিনি ছিলেন বীর, বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী। তিনি যে ভারতে শ্রেষ্ঠ সম্রাটদের অন্যতম ছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই।



শের শাহ্

শের শাহের মৃত্যুর পর তাঁর অযোগ্য উত্তরাধিকারীদের শাসনকালে আফগানরা দুর্বল হয়ে পড়ে। এই সুযোগে হুমায়ুন পারস্য থেকে ফিরে এসে পাঞ্জাব, দিল্লি ও আগ্রা অধিকার করেন (১৫৫৫ খ্রীঃ)। কিন্তু পর বৎসর এক দুর্ঘটনায় হঠাৎ তাঁর মৃত্যু হয়। হুমায়ুনের মৃত্যু হ'লে তাঁর বালক পুত্র **আকবর** দিল্লির বাদশা হন। তাঁর অভিভাবক নিযুক্ত হন তাঁর পিতার সহচর **বৈরাম খাঁ**। আকবরের সাম্রাজ্য ঐ সময় দিল্লি, আগ্রা ও পাঞ্জাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ঐ সময়ে আগ্রার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে রাজত্ব করতেন আফগান সুলতান **আদিল শাহ্**। তাঁর প্রধান মন্ত্রী **হিমু** দিল্লি অধিকার করলে বৈরাম খাঁ ও আকবর পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে হিমুকে পরাজিত করলেন। হিমু নিহত হলেন। আদিল শাহ্ ও অন্যান্য আফগান

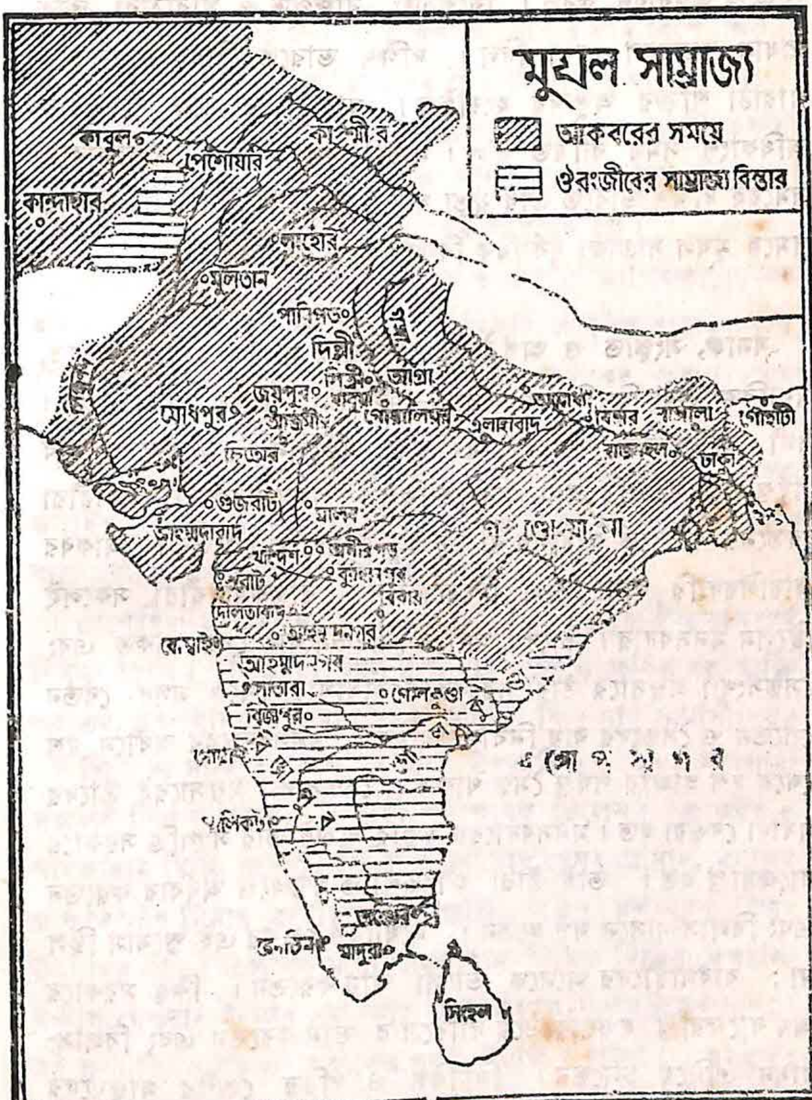
ও স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর পত্নী মমতাজের সমাধির উপর নির্মিত সৌধ **তাজমহল** আজও বিশ্বের বিস্ময় হয়ে আছে। কিন্তু শাহ্‌জাহানের জীবনের শেষ কয়েক বছর সুখের হয়নি। পুত্র-হস্তে প্রাসাদে বন্দী থাকার পর ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

শাহ্‌জাহানের চার ছেলে—**দারা, সুজা, ঔরংজীব** ও **মুরাদ**। দারা বাবার কাছে থাকতেন, সুজা বাংলাদেশের, মুরাদ গুজরাটের ও ঔরংজীব দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা ছিলেন। ১৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দে হঠাৎ সংবাদ এল শাহ্‌জাহান মরণাপন্ন। সুজা, মুরাদ ও ঔরংজীব মনে করলেন, বাবার মৃত্যু হয়েছে এবং দারা সিংহাসন অধিকারের জন্য সংবাদ গোপন রেখেছেন। তাঁরা তিনজনেই সিংহাসন অধিকারের জন্য সসৈন্যে দিল্লী রওনা হলেন। ঔরংজীব পথে মুরাদের সঙ্গে চুক্তি করলেন, তাঁরা দুজনে একযোগে দারা ও সুজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন এবং জয়ী হলে সাম্রাজ্য ভাগ করে নেবেন। সুজা বাদশাহী ফৌজের হাতে পরাজিত হলেন। ঔরংজীব ও মুরাদের হাতে দারা পরাজিত হয়ে পাঞ্জাবে পালিয়ে গেলেন।


ঔরংজীব

ঔরংজীব আগ্রা অবরোধ ক'রে শাহ্‌জাহানকে বন্দী করলেন। পরে তাঁর হাতে দারা ও মুরাদ নিহত হলেন। সুজা তাঁর কাছে পরাজিত হয়ে আরাকানে পালিয়ে গেলেন এবং সেখানে মগ দস্যুদের হাতে নিহত হলেন। ঔরংজীব **আলমগীর** নামে দিল্লীর বাদশা হলেন।

ঔরংজীব খুব বুদ্ধিমান ও পরিশ্রমী ছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন পরধর্মদ্বেষী ও সন্দেহপরায়ণ। আকবর ধর্মীয় উদারতার বলে যে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুললেন, ঔরংজীবের ধর্মের গোঁড়ামি তার ধ্বংসের কারণ হ'ল। রাজপুত, মারাঠা, শিখ, জাঠ, সকলেই তাঁর


মুঘল সাম্রাজ্য
আকবরের সময়ে
ঔরংজীবের সাম্রাজ্য বিস্তার
কাবুল
কাশ্মীর
পেশোয়ার
কান্দাহার
লাহোর
মুলতান
পানিপত
দিল্লী
সিক্রী
আগ্রা
জয়পুর
যোধপুর
আজমীর
গোয়ালিয়র
এলাহাবাদ
অযোধ্যা
বিহার
বাংলা
গৌহাটী
রাজমহল
ঢাকা
চিতোর
গুজরাট
মালব
আহমদাবাদ
গোণ্ডোয়ানা
খান্দেশ
অসীরগড়
বুরহানপুর
সুরাট
বেরার
দৌলতাবাদ
আহমদনগর
বোম্বাই
সাতারা
গোলকুণ্ডা
বিজাপুর
গোয়া
বঙ্গোপসাগর
মাদুরা
সিংহল

বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করল। বিশেষতঃ, রাজপুত ও মারাঠারা তাঁর প্রধান শত্রুরূপে দেখা দিল। দক্ষিণ ভারতে শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠা শক্তির অভ্যুদয় হয়েছিল। মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধে তাঁর অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হ'ল। মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাবার সময়েই দক্ষিণ ভারতে তাঁর মৃত্যু ঘটে ( ১৭০৭ খ্রীঃ )। ঔরংজীবের সময়ে মুঘল সাম্রাজ্য সর্বাধিক বিস্তার লাভ করেছিল।

**সমাজ, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক অবস্থা :** সমাজে ধনী অভিজাত, মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত ও দরিদ্র—এই তিন শ্রেণীর লোক ছিল। ধনী অভিজাতরা সকলেই মনসবদার ছিলেন। আকবরের পূর্ব পর্যন্ত জায়গিরদারি প্রথা প্রচলিত ছিল। পদস্থ সরকারী কর্মচারীরা বেতনের পরিবর্তে জায়গির বা বড় বড় জমিদারি পেতেন। আকবর জায়গিরদারি প্রথা তুলে দিয়েছিলেন। রাজকর্মচারীরা সকলেই ছিলেন মনসবদার। তাঁদের অধীনে নির্দিষ্টসংখ্যক সৈন্য থাকত এবং সৈন্যসংখ্যা অনুসারে তাঁরা সরকারী কোষাগার থেকে নগদ বেতন পেতেন ও সৈন্যদের ব্যয় নির্বাহ করতেন। মনসবদারের অধীনে দশ থেকে দশ হাজার পর্যন্ত সৈন্য থাকত। সৈন্যসংখ্যা অনুসারেই তাঁদের মর্যাদা দেওয়া হত। মনসবদারের মৃত্যুর সঙ্গেই তার সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত হত। তাই তাঁরা জীবদ্দশাতে মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করতেন এবং বিলাস-ব্যসনে মগ্ন হতেন। মধ্যেবিত্ত শ্রেণীর এই সুযোগ ছিল না ; ব্যবসায়ীদের অনেকে ভালো আয় করতেন। কিন্তু সরকারে অর্থ বাজেয়াপ্ত হওয়ার ভয়ে দারিদ্র্যের ভান করতেন এবং বিলাস-ব্যসন এড়িয়ে চলতেন। নিম্নবিত্ত ও দরিদ্র শ্রেণীর মানুষদের অধিকাংশই ছিল কৃষক ও কারিগর। দেশে কৃষির যথেষ্ট উন্নতি হলেও অনেক সময় এক-একটি অঞ্চলে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ঘটত। কারি-গররা ছিল সুদক্ষ শিল্পী। কিন্তু অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা ও রাজকর্মচারীরা প্রায় বিনামূল্যেই তাদের কাছ থেকে উৎকৃষ্ট শিল্পদ্রব্য-গুলি নিয়ে নিত, তাই তারা অনেক সময় উৎকৃষ্ট শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন

করত না। কৃষিজাত দ্রব্য ও শিল্পজাত দ্রব্যের দাম দেশে অত্যল্প থাকায় দেশের কৃষক ও কারিগরদের দৈন্য-দুর্দশার সীমা ছিল না।

শিল্পদ্রব্যের মধ্যে প্রধান ছিল বস্ত্রশিল্প। ভারতের রেশমী ও সূতী বস্ত্র ছিল জগদ্‌বিখ্যাত। বস্ত্রশিল্পে বাংলাদেশের তুলনা ছিল না। ঢাকাই মসলিন ছিল তখন সারা বিশ্বের আদরের বস্তু।

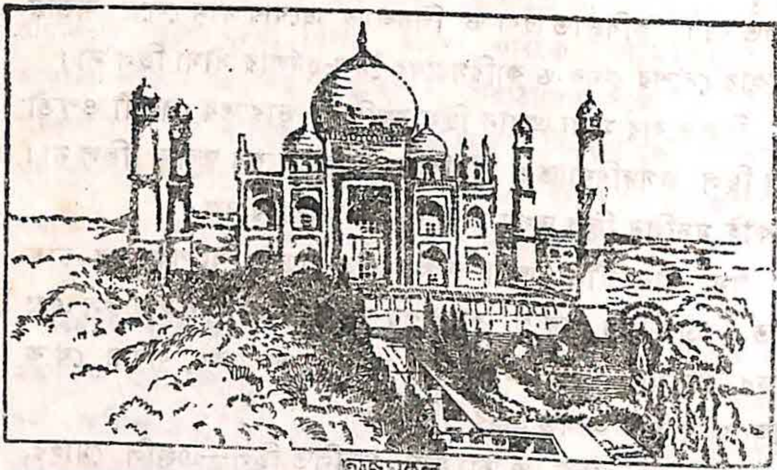
গম, ধান, নীল, তুলা, আখ, তুঁত প্রভৃতি ব্যাপকভাবে চাষ হ'ত। ঐ সময়ে এদেশে তামাকের ব্যবহার প্রচলিত হয়েছিল এবং প্রচুর পরিমাণে তামাকের চাষ হ'ত। তামাকের ব্যবসা থেকে রাজকোষে শুল্ক আসত প্রচুর পরিমাণে।

দেশে স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রা প্রচলিত ছিল—এগুলি মোহর, রূপাইয়া, পয়সা, ফুলুস, দাম, জিতল প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যেও দেশ অত্যন্ত উন্নত ছিল।

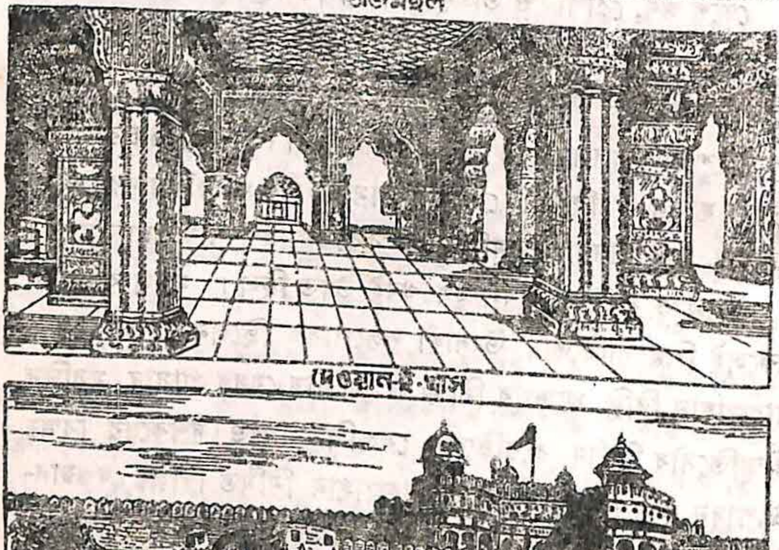
দেশে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সৌহার্দ্য ছিল। হিন্দুরা উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত হতেন। হিন্দুরা যেমন মুসলমান পীর ও ফকিরদের ভক্তি করতেন, মুসলমানরাও তেমনি ভক্তি করতেন হিন্দু সাধু-সন্ন্যাসীদের।

শিল্পে ও সাহিত্যে মুঘল যুগ খুবই উন্নত ছিল। মুঘল বাদশারা সকলেই শিল্প-সাহিত্যের উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আকবর ও শাহ্‌জাহান দিল্লি, ফতেপুর সিক্রি ও আগ্রায় যেসব প্রাসাদ, মসজিদ ও স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেছিলেন, সেগুলি আজও দর্শকদের বিস্ময় উৎপাদন করে। এগুলির মধ্যে শাহ্‌জাহান নির্মিত দিল্লির **দেওয়ান-ই-খাস, দেওয়ান-ই-আম** এবং আগ্রার **তাজমহল** বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই যুগে চিত্রকলার ও সংগীতের খুবই উন্নতি হয়েছিল। ভারতের সুবিখ্যাত গায়ক **তানসেন** আকবরের দরবার অলংকৃত করতেন। বহু শ্রেষ্ঠ কবি ও ঐতিহাসিক এযুগে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তুলসীদাস, বীরবল প্রভৃতি কবিরা হিন্দীভাষাকে, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র বাংলাভাষাকে ও তুকারাম মারাঠীভাষাকে সমৃদ্ধ করেছিলেন।

**বিদেশী ভ্রমণকারীগণ ঃ** মুঘল যুগে বহু ইউরোপীয় ভ্রমণকারী ভারতে এসেছিলেন। এঁদের মধ্যে ইংরেজ র‍্যালফ্‌ ফিচ্‌, ক্যাপ্‌টেন



তাজমহল



দেওয়ান-ই-খাস



আগ্রাফোর্ট

উইলিয়ম হকিন্স, স্যার টমাস রো, এডোয়ার্ড টেরি, ফরাসী ফ্রাঁসোয়া বের্নিয়ে, তাভের্নিয়ে, ওলন্দাজ ফ্রান্সিস্কো পেল্সাএর্ট প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁরা মুঘল আমল সম্পর্কে নানা কথা লিখে গেছেন। সেগুলি থেকে মুঘল আমলের ভারত সম্পর্কে অনেক কথা জানা যায়।

র‍্যালফ্ ফিচের বিবরণ থেকে জানা যায়, ঐ সময় এদেশে অনেক বড় বড় শহর ছিল। ফিচ্ লিখেছেন, আগ্রা ও ফতেপুর শহর দুটি লণ্ডনের চেয়েও অনেক বড় ছিল। আগ্রা ও ফতেপুরের মধ্যে দূরত্ব ছিল বারো মাইল। এই বারো মাইল পথের দুধারে খাবার ও নানা জিনিসের একটানা দোকান ছিল। তাই, পথকেও শহর বললে ভুল হ'ত। বস্ত্রশিল্প সম্পর্কে বের্নিয়ে বলেছিলেন, বাংলাদেশে সূতী ও রেশমী কাপড় এত বেশি উৎপন্ন হয় যে, তাকে কেবল মুঘল সাম্রাজ্য বা হিন্দুস্থানের নয়, পার্শ্ববর্তী দেশগুলির, এমন কি ইউরোপেরও বস্ত্রের ভাণ্ডার বলা চলে। টেরির বিবরণ থেকে জানা যায়, মোটা কাপড় প্রায়ই রঙীন হ'ত, সেগুলি নানারকম মূর্তি ও ফুলের ছাপে ছাপানো হ'ত। রো মুঘল দরবারের ঐশ্বর্য ও সমারোহ দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। তাভের্নিয়ের বিবরণ থেকে জানা যায়, ঐ সময়ে ভারতে প্রায় আট লক্ষ মুসলমান ফকির ও বারো লক্ষ হিন্দু সন্ন্যাসী ছিলেন। দেশে ক্রীতদাসপ্রথা প্রচলিত ছিল।

**প্রশ্নাবলী**

১। ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে কি জান?

২। ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যকে দৃঢ় ভিত্তিতে কে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন? তিনি কোন্ নীতি অনুসরণ করায় মুঘল সাম্রাজ্য এমন শক্তিশালী ও সুদৃঢ় হতে পেরেছিল?

৩। কোন্ মুঘল বাদশা ঐশ্বর্য-সমারোহের জন্য সুবিখ্যাত ছিলেন? তাঁর শেষ জীবন সুখের হয়নি কেন?

৪। ঔরংজীব কিভাবে সিংহাসন লাভ করেছিলেন? তাঁর কোন্ নীতির ফলে মুঘল সাম্রাজ্যে ভাঙন ধরেছিল?

৫। মুঘল আমলে দেশের সামাজিক অবস্থা কেমন ছিল ?
৬। মুঘল আমলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল ?
৭। মুঘল যুগের শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে যা জান লিখ।
৮। মুঘল আমলে কয়েকজন বিদেশী পর্যটকের নাম কর। তাঁদের বিবরণ থেকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে কি জানা যায় ?
৯। সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) বাবর জাতিতে কি ছিলেন ?

(খ) মেবারের যে রানার সঙ্গে বাবরের যুদ্ধ হয়েছিল তাঁর নাম কি ? কোথায় যুদ্ধ হয়েছিল ? কে জয়লাভ করেছিলেন ?

(গ) দীন্-ই-ইলাহি শব্দের মানে কি ? তা কে প্রবর্তন করেছিলেন ?

১০। ভুল অংশ কেটে দাও :

(ক) পানিপথের প্রথম যুদ্ধ ১৫২৫/১৬২৫/১৫০৬ খ্রীষ্টাব্দে হয়েছিল।

(খ) আকবরের মৃত্যু হয়েছিল ১৬০৬/১৫০৬/১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে।

(গ) ঔরংজীবের মৃত্যু হয়েছিল ১৭০৬/১৬০৭/১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে।

---

## (খ) ইউরোপীয় বণিকদের আগমন ও তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা

১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ভাস্কো-দা-গামা কালিকট বন্দরে এসে নেমেছিলেন। এইভাবে ভারতের সঙ্গে পোর্তুগীজদের বাণিজ্যের সূত্রপাত হয়েছিল। তারা ভারতের পশ্চিম উপকূলে যেসব বাণিজ্য-কুঠি স্থাপন করেছিল, সেগুলিকে সুরক্ষিত করে তোলে। পোর্তুগীজ কুঠিসমূহের অধ্যক্ষ আলবুকার্ক গোয়া অধিকার করেন। ভারতে পোর্তুগীজরা উপনিবেশ গড়ে তোলে এবং ভারতের উপকূলভাগে যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তারা ভারতের নানা স্থানে বহু কুঠি স্থাপন করে। কিন্তু তারা কেবল ব্যবসা করত না, জলদস্যুতা, গ্রামবাসীদের উপর অত্যাচার ও ভারতীয়দের ক্রীতদাস-দাসীরূপে বিক্রয় প্রভৃতি নানা বেআইনী কাজে লিপ্ত থাকত। একবার তারা সম্রাট শাহজাহানের

পত্নী মমতাজের বাঁদীকে বন্দী করলে শাহ্জাহান কঠোর হস্তে তাদের দমন করেন। ইতিমধ্যে ওলন্দাজ, ইংরেজ প্রভৃতি বণিকেরা বাণিজ্য করতে আসে। ক্রমেই তারা শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং তাদের সঙ্গে যুদ্ধে পোর্তুগীজরা দুর্বল হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত ভারতে গোয়া, দমন ও দিউতে তাদের অধিকার সীমাবদ্ধ থাকে।

ওলন্দাজরাও ভারত ও প্রাচ্যে বাণিজ্য করতে আসে। ভারতে কুঠি স্থাপন করলেও তারা পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের দিকেই বেশি মনোযোগ দেয়। তারা মালাক্কা দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করে এবং ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তা অধিকার করে বাটাভিয়া প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে। তারা ভারতের পূর্ব উপকূলেও কয়েকটি কুঠি স্থাপন করে এবং পোর্তুগীজদের কাছ থেকে সিংহল ছিনিয়ে নেয়। কিন্তু ইংরেজদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তারা শেষ পর্যন্ত হেরে যায়।

রানী এলিজাবেথের রাজত্বকালে **বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি** গড়ে উঠেছিল। জাহাঙ্গীরের আমলে তারা ভারতে কুঠি স্থাপনের ও বিনা শুল্কে ব্যবসা করার অনুমতি পায়। তারা ভারতের নানাস্থানে কুঠি স্থাপন করে। তবে মাদ্রাজ, বোম্বাই ও কলিকাতা তাদের প্রধান ঘাঁটি হয় এবং ঐগুলিকে তারা সুরক্ষিত ক'রে তোলে।

ভারতে ইংরেজদের আসার ষাট-সত্তর বছর পরে ফরাসীরা ভারতে আসে। তারা মাদ্রাজের কাছে পণ্ডিচেরিতে ও বাংলাদেশের চন্দন-নগরে কুঠি স্থাপন করে। পরে তারা কারিকল ও মাহে অধিকার করে। এ পর্যন্ত ইংরেজদের মতোই বাণিজ্য তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। ফরসী কুঠির অধ্যক্ষ **জোসেফ ডুপ্লে** ভারতের রাজনৈতিক অনৈক্য ও দুর্বলতা দেখে এখানে সাম্রাজ্য স্থাপনের কথা চিন্তা করেন। তিনি এই উদ্দেশ্যে সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলেন এবং ভারতীয় রাজা-রাজড়াদের বিরোধে অংশ নিয়ে সুবিধামতো তাদের সাহায্য করতে থাকেন। ফরাসীদের দেখাদেখি ইংরেজরাও ঐ পথ বেছে নেয়। ইউরোপ অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার নিয়ে আট বছর ধরে যে যুদ্ধ

হয়, তাতে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স দুই বিরোধী পক্ষে ছিল। তাদের সেই যুদ্ধ ভারতেও ছড়িয়ে পড়েছিল। এই সময়ে কর্ণাটক ও হায়দরাবাদ রাজ্যের উত্তরাধিকার নিয়ে যে বিরোধ চলছিল, তাতে ইংরেজ ও ফরাসীরা দুই বিরোধী পক্ষকে সাহায্য করে। গোড়ার দিকে ইংরেজরা বিশেষ সফল হয় না। এবং তাদের মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। ঐ সময়ে **রবার্ট ক্লাইভ** নামে এক তরুণ ইংরেজ সৈনিক মাত্র পাঁচশ সৈন্য নিয়ে কর্ণাটকের রাজধানী আর্কট অধিকার করলে দক্ষিণ ভারতে ইংরেজদের মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। হায়দরাবাদের সিংহাসনেও ইংরেজরা তাদের মনোনীত প্রার্থীকে বসাতে সমর্থ হয়। ইংরেজরা পুরস্কার স্বরূপ 'উত্তর সরকার' নামে পরিচিত গঞ্জাম থেকে গুন্টুর পর্যন্ত বিস্তৃত উপকূলবর্তী অঞ্চল লাভ করে। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে আবার সাতবৎসরব্যাপী যুদ্ধ শুরু হয়, তাতে ফরাসীরা পরাজিত হ'লে ভারতে চন্দননগর ও পণ্ডিচেরি ছাড়া সমস্ত অঞ্চল ফরাসীদের হস্তচ্যুত হয়।


জোসেফ ডুপ্লে


রবার্ট ক্লাইভ

এইভাবে ইংরেজদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ফরাসীরা হেরে যায়। ভারতে ইংরেজরাই প্রবলতম বিদেশী শক্তিরূপে দেখা দেয়।

**মারাঠা শক্তির উত্থান ও প্রসার**ঃ ইউরোপীয়রা যখন ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করেছিল, তখন দক্ষিণ ভারতে মারাঠা জাতির অভ্যুত্থান ঘটছিল। এই অভ্যুত্থানের মূলে ছিলেন মারাঠা বীর **শিবাজী**।

শিবাজীর বাবা **শাহজী ভোঁসলে** প্রথমে আহম্মদনগরের ও পরে বিজাপুরের সুলতানের অধীনে উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। তিনি যখন বিজাপুরে ছিলেন, তখন পুণায় তাঁর প্রথমা পত্নী **জিজাবাঈয়ের** গর্ভে এক পুত্র হয় (১৬৩০ খ্রীঃ)। এই পুত্রই শিবাজী। শিবাজী বাল্যকালে লেখাপড়া না শিখলেও বুদ্ধিমান ও দুঃসাহসী ছিলেন। তিনি কিশোর বয়সেই স্থানীয় মাওয়ালী কৃষকদের নিয়ে এক সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলেন এবং কয়েকটি দুর্গ অধিকার ও নির্মাণ করেন। তিনি বিজাপুর ও মুঘল অঞ্চলে আক্রমণ চালালে বিজাপুরের সুলতান ও মুঘল বাহিনীর সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ বাধে। বিজাপুরের সুলতান তাঁকে দমন করার জন্য সেনাপতি **আফজল খাঁকে** পাঠান। শিবাজী সম্মুখ-যুদ্ধে ধরা না দেওয়ায় আফজল খাঁ বাধ্য হয়ে শিবাজীর কাছে সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে তাঁকে নিজ শিবিরে নিমন্ত্রণ করলেন।


শিবাজী

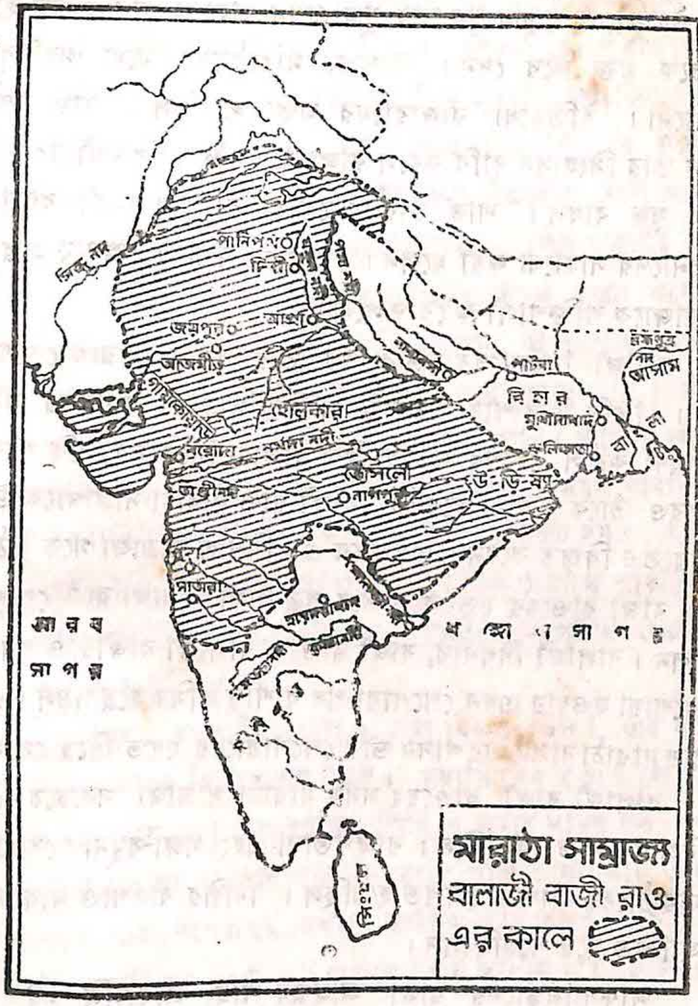
আফজল খাঁর কোন দুরভিসন্ধি আছে মনে ক'রে শিবাজী পোশাকের নিচে লোহার বর্ম ও হাতে 'বাঘনখ' নামে ধারালো ছুরিকাযুক্ত দস্তানা পরে যান। আফজল খাঁ তাঁর শিবিরে শিবাজীকে আলিঙ্গনকালে ছুরিকাঘাত করলে তা শিবাজীর বর্মে লেগে ব্যর্থ হয় এবং শিবাজী ক্ষিপ্রগতিতে বাঘনখ দিয়ে আফজল খাঁর উদর ছিন্নভিন্ন ক'রে

তাঁকে হত্যা করেন। সেনাপতির মৃত্যুতে বিজাপুরী সৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং শিবাজী দক্ষিণ কোঙ্কণ ও কোলাপুর অধিকার করেন।

ইতিমধ্যে ঔরংজীব সম্রাট হয়ে তাঁর মামা **শায়েস্তা খাঁ**কে শিবাজীকে দমন করার জন্য পাঠান। শিবাজী অতর্কিতে শায়েস্তা খাঁর শিবিরে হানা দিয়ে তাঁর পুত্রকে হত্যা করেন, প্রাণভয়ে শায়েস্তা খাঁ পালিয়ে যান। ঔরংজীব শিবাজীকে দমন করার জন্য সেনাপতি **জয়সিংহ ও দিলির খাঁ**কে পাঠালেন। যুদ্ধ জয় অসম্ভব বুঝে শিবাজী সন্ধি করলেন। সন্ধির শর্ত অনুসারে তিনি ২৩টি দুর্গ ও কয়েকটি জেলা মুঘল বাদশাকে ছেড়ে দিলেন এবং যুদ্ধকালে ৫,০০০ সৈন্য দিয়ে মুঘল বাদশাকে সাহায্য করতে সম্মত হলেন। শিবাজী বশ্যতা স্বীকার করলেও তাঁকে দাক্ষিণাত্যে রাখা নিরাপদ নয় জেনে ঔরংজীব শিবাজীকে আগ্রায় আমন্ত্রণ করলেন। শিবাজী পুত্র শম্ভুজীকে নিয়ে আগ্রা গেলে সেখানে ঔরংজীব তাঁকে গৃহবন্দী করে রাখলেন। শিবাজী সুকৌশলে পুত্রের সঙ্গে নিজ রাজ্যে ফিরে পালিয়ে এলেন।

শিবাজীর সঙ্গে আবার মুঘলের যুদ্ধ বাধল। শিবাজী যেসব দুর্গ ও অঞ্চল মুঘল বাদশাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন, তার সবগুলিই প্রায় উদ্ধার করলেন। তিনি মুঘল অঞ্চলে হানা দিলেন। মুঘল সেনাপতিরা বার বার তাঁর হাতে পরাজিত হলেন। ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে আনুষ্ঠানিক-ভাবে শিবাজীর অভিষেক হ'ল। শিবাজী **ছত্রপতি** ও **গো-ব্রাহ্মণ-প্রতিপাল**ক উপাধি গ্রহণ করলেন। শিবাজী অল্পকালের মধ্যে চতুঃপার্শ্ববর্তী আরও বহু স্থান জয় করলেন। এই বিজয়-গৌরবের মধ্যে অকস্মাৎ ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হ'ল।

শিবাজীর মৃত্যুর পর তার ছেলে শম্ভুজী রাজা হন। তিনি ১৬৮৩ খ্রীষ্টাব্দে মুঘল বাহিনীর হস্তে বন্দী হন। অনেক নির্যাতনের পর তাঁকে হত্যা করা হয়। তাঁর বালকপুত্র **শাহু** সহ তাঁর পরিবার মুঘল হস্তে বন্দী হয়। তাঁর ছোট ভাই **রাজারাম** কিন্তু পালিয়ে যান। তিনি মুঘলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকেন। ঔরংজীব মারাঠাদের দমন করতে প্রাণপণ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন।


সিন্ধু নদ
পানিপথ
দিল্লী
আগ্রা
জয়পুর
আজমীর
বরোদা
নর্মদা নদী
ভোঁসলে
নাগপুর
পাটনা
বিহার
মুর্শিদাবাদ
কলিকাতা
আসাম
সাতারা
আরব সাগর
মারাঠা সাম্রাজ্য
বালাজী বাজী রাও-
এর কালে

ঔরংজীবের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র প্রথম বাহাদুর শাহ্ বাদশা হয়ে শাহুকে মুক্ত করে দেন। উদ্দেশ্য, মারাঠাদের মধ্যে গৃহবিবাদ বাধানো। ইতিমধ্যে রাজারামের মৃত্যু হয়েছিল। শাহু ফিরে এসে তাঁর সিংহাসন দাবি করলে রাজারামের উত্তরাধিকারীদের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ বাধল। শাহু তাঁর পেশোয়া বা প্রধানমন্ত্রী বালাজী বিশ্বনাথের সাহায্যে জয়ী হলেন। পেশোয়া **বালাজী বিশ্বনাথ** মারাঠা সাম্রাজ্যকে শক্তিশালী ক'রে তুললেন।

বালাজী বিশ্বনাথের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র **বাজী রাও** পেশোয়া হন। তিনি হিন্দু-পাদ-পাদশাহি বা হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপনের নীতি ঘোষণা করলে দেশের অন্যান্য হিন্দু রাজারা নিজেদের ক্ষতি স্বীকার ক'রেও তাঁকে সাহায্য করেন। বাজী রাও মারাঠা সাম্রাজ্যকে উত্তর ভারতেও বিস্তৃত করেন। এইভাবে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে উঠল।

বাজী রাওয়ের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র **বালাজী বাজী রাও** পেশোয়া হলেন। বালাজী বিশ্বনাথ, বাজী রাও ও বালাজী বাজীরাও পর পর পেশোয়া হওয়ায় এখন পেশোয়া-পদ বংশানুক্রমিক হয়ে পড়ল। রাজা শাহু মারাঠা সাম্রাজ্যের শাসন ভার পেশোয়াদের হাতে দিয়ে গেলেন।

বালাজী বাজী রাওয়ের সময় মারাঠা সাম্রাজ্য সবচেয়ে বেশি বিস্তার লাভ করেছিল। রাজপুতানা এবং গঙ্গা-যমুনা দোয়াবেও মারাঠাদের প্রাধান্য স্থাপিত হয়েছিল। দিল্লির বাদশাও মারাঠাদের আশ্রিত হয়ে পড়েছিলেন।

আফগানিস্থানের রাজা **আহম্মদ শাহ্ আবদালি** এই সময় পাঞ্জাব অধিকার করেছিলেন। আহম্মদ শাহ্ আবদালির প্রতিরোধের জন্য মারাঠা বাহিনী অগ্রসর হ'ল। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে আহম্মদ শাহ্ আবদালির হস্তে মারাঠা বাহিনী পরাজিত হ'ল (১৭৬১ খ্রীঃ)। এর অল্পকাল পরেই পেশোয়া বালাজী বাজী রাওয়ের মৃত্যু ঘটে।

**শিখশক্তির অভ্যুত্থান ঃ** ইউরোপে যখন ধর্ম-আন্দোলন চলছিল, তার প্রায় সমসময়ে ভারতেও ধর্ম-আন্দোলন দেখা দিয়েছিল। **গুরু নানক** (১৪৬৯-১৫৩৮ খ্রীঃ) পাঞ্জাব ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে **শিখধর্ম**

প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। গুরু নানক জাতিভেদ মানতেন না, এক ও নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন। বহু হিন্দু-মুসলমান, বিশেষতঃ জাঠ কৃষকরা তাঁর শিষ্য হয়েছিল। শিখরা এক শতাব্দীকাল একটি ধর্মীয় সম্প্রদায় রূপেই ছিল। কিন্তু মুঘল বাদশা ঔরংজীবের ধর্মের গোঁড়ামি ও অন্য ধর্মের উপর অত্যাচার শিখদের সংঘবদ্ধ ক'রে তোলে। শিখ গুরু **তেগ বাহাদুরকে** ঔরংজীব বন্দী করে আনেন এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আদেশ দেন। তেগ বাহাদুর ঐ নির্দেশ ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করলে ঔরংজীব তাঁকে হত্যা করেন। তেগ বাহাদুরের পুত্র **গুরু গোবিন্দ** পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য শিখদের সামরিক বিদ্যায় সুশিক্ষিত করে তোলেন। তিনি শিখদের মধ্যে কেশ ( চুল ), কংঘি ( চিরুনী, ) কৃপাণ ( অসি ), কচ্ছ ( খাটো পাজামা ) ও কড়া ( লোহার বালা ) ধারণের নিয়ম প্রবর্তিত করেন। তরবারি দিয়ে শিখদের দীক্ষার রীতি প্রচলিত হয়। যাঁরা দীক্ষার এই নীতি মেনে নেন, তাঁরা **খালসা** ( শুদ্ধ ) নামে পরিচিত হন এবং সিংহ উপাধি পান। এইভাবে শিখরা সুসংগঠিত একটি যোদ্ধার জাতিতে পরিণত হয়।

শিখরা বারোটি মিশ্‌ল্ বা দলে বিভক্ত ছিল। এই রকম একটি দলের নায়ক ছিলেন **মহাসিংহ**। মহাসিংহের মৃত্যু হ'লে মাত্র বারো বছর বয়সে তাঁর পুত্র **রণজিৎ সিংহ** ঐ দলের নায়ক হন। আফগানিস্থানের রাজা আহম্মদ শাহ আবদালি পাঞ্জাব অধিকার করেছিলেন। তাঁর এক বংশধরের অধীনে রণজিৎ সিংহ তরুণ বয়সেই লাহোরের শাসনকর্তা হন। কিছুদিন পরে তিনি স্বাধীন হয়ে ছোট ছোট শিখ মিশ্‌ল্‌গুলিকে ঐক্যবদ্ধ ক'রে তোলেন। এইভাবে শতদ্রু নদের পশ্চিম পার পর্যন্ত তাঁর রাজ্য বিস্তৃত হয়। কিন্তু তিনি শতদ্রুর পূর্ব পারের শিখ অঞ্চলগুলি জয় করতে উদ্যত হ'লে ইংরেজরা বাধা দেয়। ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ বুদ্ধিমানের কাজ নয় জেনে তিনি ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি করেন। অমৃতসরে ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর এক সন্ধি হয় (১৮০৯ খ্রীঃ)। তাতে শতদ্রুর পূর্বদিকে রণজিৎ সিংহ অগ্রসর হবেন না

এবং ইংরেজরাও শতদ্রুর পশ্চিমে অগ্রসর হবে না, এই রকম এক চুক্তি হয়। রণজিৎ সিংহ এখন উত্তরে, দক্ষিণে ও পশ্চিমে রাজ্য বিস্তারে



রনজিৎ সিংহ

মন দেন। তিনি কাশ্মীর, পেশোয়ার, মুলতান প্রভৃতি জয় ক'রে এক বিশাল রাজ্য গ'ড়ে তোলেন। তিনি ইংরেজদের সঙ্গে মিত্রতা রক্ষা করায় তাঁর মৃত্যু (১৮৩৯ খ্রীঃ) পর্যন্ত শিখ রাজ্য স্বাধীন ও অক্ষুণ্ণ ছিল।

## প্রশ্নাবলী

১। পোর্তুগীজদের ভারতে কুঠি স্থাপন ও অধিকার বিস্তার সম্পর্কে কি জান?

২। ভারতে প্রাধান্য বিস্তারে ইংরেজ ও ফরাসীদের দ্বন্দ্বের বিবরণ দাও।

৩। শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠা জাতির উত্থানের কাহিনী লিখ।

৪। মারাঠা সাম্রাজ্যের বিস্তার সম্পর্কে কি জান?

৫। শিখ সম্প্রদায় কিভাবে যোদ্ধার জাতিতে পরিণত হ'ল?

৬। রণজিৎ সিংহের অধীনে শিখদের উত্থান সম্পর্কে যা জান লিখ।

৭। সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) কোন্ ফরাসী ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের কথা ভেবেছিলেন ?

(খ) কোন্ ইংরেজ সৈনিক দক্ষিণ ভারতে ইংরেজদের মর্যাদা রক্ষা করেছিলেন ?

(গ) কে শিখদের একটি যোদ্ধার জাতিতে পরিণত করেছিলেন ?

(ঘ) শিখদের মধ্যে কারা 'খালসা' নামে পরিচিত ? তাদের উপাধি কি ?

(ঙ) পেশোয়া-পদ কেন বংশানুক্রমিক হয়েছিল ?

(চ) কোন্ মারাঠা রাজা মারাঠা রাজ্যশাসনের ভার পেশোয়াদের হাতে দিয়েছিলেন ?

(ছ) শিবাজী কোন্ বিজাপুরী সেনাপতিকে হত্যা করেছিলেন ? কিভাবে হত্যা করেছিলেন ?

(জ) কোন্ পেশোয়া হিন্দু-পাদ-পাদশাহির নীতি গ্রহণ করেছিলেন ?

(ঝ) তিনজন প্রধান পেশোয়ার নাম কর।

(ঞ) কোন্ পেশোয়ার সময়ে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ হয়েছিল ?

(ট) পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ কাদের মধ্যে হয়েছিল ? কত খ্রীষ্টাব্দে হয়েছিল ?

(ঠ) কোন্ বাদশা বিনা শুল্কে ইংরেজদের ব্যবসার সুযোগ দিয়েছিলেন ?

৮। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) ইংলণ্ডে রানী — -এর সময়ে বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

(খ) — খ্রীষ্টাব্দে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ হয়েছিল।

(গ) শিবাজী — ও — উপাধি গ্রহণ করেছিলেন।

(ঘ) শিবাজীর মৃত্যু হয়েছিল — খ্রীষ্টাব্দে।

(ঙ) রণজিৎ সিংহের মৃত্যু হয়েছিল — খ্রীষ্টাব্দে।

———

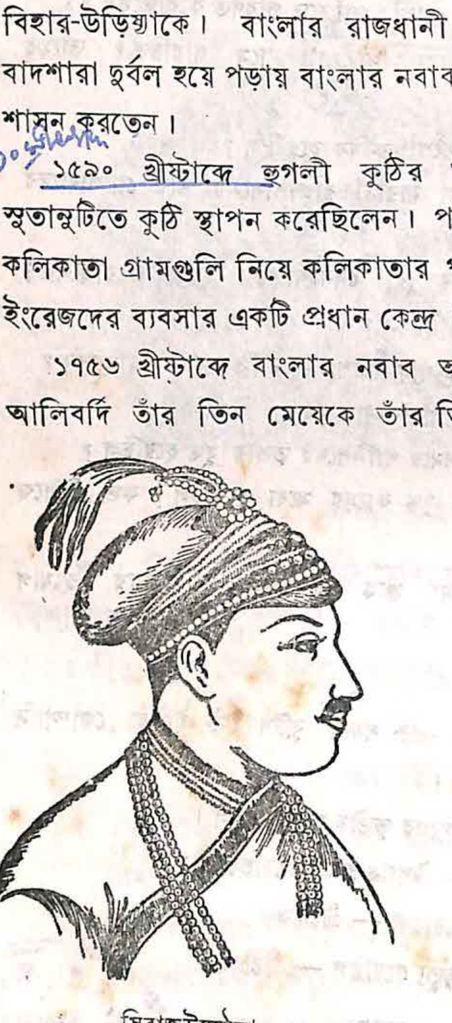
## সপ্তম অধ্যায়

# ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতে বৃটিশ শক্তির প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ

**প্রথম স্তর ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ঃ** দক্ষিণ ভারতে ইংরেজরা যখন প্রাধান্য বিস্তারে সচেষ্ট ছিল, তখন তারা বাংলাদেশেও প্রাধান্য বিস্তারে সচেষ্ট ছিল। তখন বাংলাদেশ বলতে বোঝাত বাংলা-বিহার-উড়িষ্যাকে। বাংলার রাজধানী ছিল মুর্শিদাবাদ। মুঘল বাদশারা দুর্বল হয়ে পড়ায় বাংলার নবাবরা প্রায় স্বাধীনভাবেই দেশ শাসন করতেন।

১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী কুঠির অধ্যক্ষ হুগলী নদীর তীরে সুতানুটিতে কুঠি স্থাপন করেছিলেন। পরে সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা গ্রামগুলি নিয়ে কলিকাতার পত্তন হয়েছিল। কলিকাতা ইংরেজদের ব্যবসার একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল।

১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার নবাব আলিবর্দি খাঁর মৃত্যু হ'ল। আলিবর্দি তাঁর তিন মেয়েকে তাঁর তিন ভ্রাতুষ্পুত্রের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন। আলিবর্দির মৃত্যুর সময়ে তাঁর জামাতারা কেউ জীবিত ছিলেন না। বড় মেয়ে **ঘসেটি বেগম** থাকতেন ঢাকায়। মেজ মেয়ের ছেলে **সওকতজঙ্গ** ছিলেন পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা। ছোট মেয়ে **আমিনা** বেগমের ছেলে **সিরাজ-উদ্দৌলা** থাকতেন মুর্শিদাবাদে দাদুর কাছে। আলিবর্দি তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন, তাই তিনি মরার সময়ে সিরাজউদ্দৌলাকেই নবাব ক'রে গেলেন।



সিরাজউদ্দৌলা

সিরাজ ছিলেন বয়সে তরুণ ও অনভিজ্ঞ। তিনি নবাব হওয়ায় ঘসেটি বেগম ও সওকতজঙ্গ অসন্তুষ্ট হলেন। সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলতে লাগল। এইসব ষড়যন্ত্রে ইংরেজরাও যোগ দিল। প্রথমে ঘসেটি বেগমকে কেন্দ্র ক'রে ষড়যন্ত্র হচ্ছিল। সিরাজ তা জানতে পেরে ঘসেটি বেগমকে মুর্শিদাবাদে এনে রাখলেন। এখন সওকতজঙ্গকে কেন্দ্র ক'রে ষড়যন্ত্র চলতে লাগল। সিরাজ সওকত-জঙ্গকে দমনের সংকল্প করলেন।

এই সময়ে ইউরোপে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মধ্যে যুদ্ধ বেধেছিল। তাই ইংরেজরা কলিকাতায় নূতন ক'রে দুর্গ তৈরি করতে লাগল। সিরাজ তাদের দুর্গ নির্মাণ করতে নিষেধ করলেন। কিন্তু ইংরেজরা নিষেধ শুনল না। তখন সিরাজ কলিকাতা অধিকার করে নিলেন। ইংরেজরা কলিকাতা থেকে বজবজে পালিয়ে গেল। সিরাজ সওকতজঙ্গকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করলেন।

ইংরেজরা কিন্তু হার মানল না। মাদ্রাজ থেকে রবার্ট ক্লাইভ ও নৌ-সেনাপতি ওয়াটসন সসৈন্যে এসে পৌঁছিলেন ও কলিকাতা অধিকার করে নিলেন। এই সময়ে আলিবর্দির ভগিনীপতি ও সিরাজের প্রধান সেনাপতি **মীরজাফরকে ঘিরে** ষড়যন্ত্র চলছিল। দেশে অনেক বড় বড় ধনী ব্যবসায়ী ও জমিদার এতে যোগ দিয়েছিলেন। ইংরেজরাও যোগ দিল। ইংরেজরা নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। নদীয়ার পলাশিতে ইংরেজদের সঙ্গে সিরাজের যুদ্ধ হল। মীরজাফর ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ না করায় সিরাজ পরাজিত হলেন (১৭৫৭ খ্রীঃ)। সিরাজ পরে বন্দী ও নিহত হলেন। ইংরাজরা মীরজাফরকে বাংলার নবাব করল। কিন্তু আসলে ইংরেজরাই হয়ে উঠল সর্বেসর্বা।


মীরজাফর

কিছুদিন পরে তারা মীরজাফরকে সরিয়ে তাঁর জামাতা **মীরকাশিমকে** নবাব করল। কিন্তু তিনি ছিলেন স্বাধীনচেতা। তিনি ইংরেজদের অন্যায় দাবি মানতে রাজী হলেন না। ইংরেজরা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। মীরকাশিম পরাজিত হয়ে পালালেন। ইংরেজরা আবার মীরজাফরকে নবাব করল। তাঁকে বছরে তিপান্ন লক্ষ টাকা ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা হল। মীরজাফরের পরে তাঁর ছেলে নাজমউদ্দৌল্লা নবাব হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি নামমাত্র নবাব ছিলেন।


মীরকাশিম

দেশের লোকে পাছে বিদেশীদের শাসন মেনে না নেয়, সেজন্য ক্লাইভ দিল্লীর বাদশার কাছ থেকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানি নিলেন। কোম্পানির কর্মচারীরা তখন প্রজাদের উপর নানাভাবে উৎপীড়ন করে টাকা-পয়সা আদায় করতে লাগল। দেশবাসীর দুঃখের অন্ত রইল না। পর পর কয়েক বছর অনাবৃষ্টি হওয়ায় ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে (বাংলা ১১৭৬ সালে) বাংলাদেশে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। এই দুর্ভিক্ষে দেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক মারা গেল। এই ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ **ছিয়াত্তরের মন্বন্তর** নামে পরিচিত।


হেস্টিংস্

বাংলাদেশে ইংরেজদের অত্যাচার ও কুশাসনের সংবাদ ইংলণ্ডে

পৌঁছলে কোম্পানি **ওয়ারেন হেস্টিংস্**কে বাংলার গভর্নর-জেনারেল করে পাঠালেন। তিনি এসেই মুর্শিদাবাদ থেকে কলিকাতায় রাজধানী উঠিয়ে আনলেন। তিনি শাসন, রাজস্ব ও বিচার প্রভৃতি বিষয়ে সুব্যবস্থা করলেন। তিনি অনেক-গুলি অন্যায় কাজ করার জন্য কুখ্যাত হলেও, ভারতে তিনিই বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করেছিলেন।



হায়দর আলি

দক্ষিণ ভারতে ইংরেজদের প্রথম বাধা দিলেন মহীশূরের **হায়দর আলি**। হায়দর আলি সামান্য সৈনিক থেকে মহীশূরের সর্বময় কর্তা হয়েছিলেন। তিনি মহীশূর রাজ্যকে শক্তিশালী করে তুলেছিলেন। তাঁর হাতে ইংরেজরা কয়েকটি যুদ্ধে পরাজিত হয়। তিনি ইংরেজদের ঘাঁটি মাদ্রাজ পর্যন্ত অগ্রসর হন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র **টিপু সুলতান** যুদ্ধ চালাতে থাকেন। ঐ সময়ে গভর্নর-জেনারেল হয়ে এসেছিলেন **লর্ড কর্নওয়ালিস**। তাঁর হস্তে টিপু পরাজিত হয়ে বহু টাকা ও অর্ধেক রাজ্য দিয়ে সন্ধি করলেন। তবু টিপু বশ্যতা স্বীকার করলেন না। এই সময়ে ইউরোপে ফরাসী বিপ্লব হয়েছিল এবং ইংরেজদের সঙ্গে ফরাসীদের যুদ্ধ চলছিল। তাই টিপু ফরাসীদের সাহায্যে নিজেকে শক্তিশালী করে তুলতে চাইলেন।



টিপু সুলতান

তখন গভর্নর-জেনারেল হয়ে এসেছিল লর্ড ওয়েলেস্‌লি। তিনি বশ্যতামূলক মিত্রতার নীতি ঘোষণা করলেন। যেসব রাজ্য ইংরেজদের বশ্যতা স্বীকার করে নেবে, ইংরেজদের সঙ্গে তাদের থাকবে বন্ধুত্ব। ইংরেজরা সৈন্য দিয়ে তাদের সাহায্য করবে; ইংরেজ সৈন্যদের খরচ যোগাবার জন্য ঐসব রাজ্যকে রাজ্যের একাংশ ইংরেজদের ছেড়ে দিতে হবে; ইংরেজ ছাড়া অন্য কোন বিদেশী বাহিনী রাজ্যে রাখা চলবে না। টিপু স্থলতান এই নীতি মানতে অস্বীকার করলে আবার ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ বাধল। টিপু রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তম্ রক্ষার জন্য যুদ্ধে প্রাণ দিলেন। এইভাবে মহীশূরের স্বাধীনতা সংগ্রাম শেষ হ'ল।

এখন ইংরেজদের প্রধান শত্রু রইল মারাঠারা। পেশোয়া বালাজী বাজী রাওয়ের মৃত্যুর পর পেশোয়া হন তাঁর পুত্র **মাধব রাও**। মাধব রাও মারাঠা শক্তিকে পুনরুজ্জীবিত ক'রে তুলতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর অকালমৃত্যুর ফলে মারাঠা সাম্রাজ্যে গোলযোগ দেখা দেয়। মাধব রাওয়ের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই **নারায়ণ রাও** পেশোয়া হন। কিন্তু তাঁর কাকা **রঘুনাথ রাও** তাঁকে হত্যা ক'রে পেশোয়া হন। মারাঠা দলপতিরা রঘুনাথ রাওয়ের এই কাজ সমর্থন করেন নাই। **বালাজী জনার্দন** বা **নানা ফড়নবীশ** নামে জনৈক বিচক্ষণ মারাঠার নেতৃত্বে মারাঠারা নারায়ণ রাওয়ের শিশুপুত্র **মাধব রাও নারায়ণকে** পেশোয়া করেন। রঘুনাথ রাও ইংরেজদের সাহায্য চান। ফলে ইংরেজদের সঙ্গে মারাঠাদের যুদ্ধ বাধে। শেষে ইংরেজ ও মারাঠাদের মধ্যে এক সন্ধি হয়। ইংরেজরা সলসেট পায় এবং মাধব রাও নারায়ণকে পেশোয়া বলে মেনে নেয়।

গভর্নর-জেনারেল লর্ড ওয়েলেস্‌লি বশ্যতামূলক মিত্রতার নীতি ঘোষণা করলে মারাঠারা তা মেনে নিতে অস্বীকার করে। ঐসময়ে নানা ফড়নবীশের মৃত্যু হয়েছিল এবং মারাঠা সাম্রাজ্যে গোলযোগ দেখা দিয়েছিল। মারাঠা সাম্রাজ্যে কতকগুলি শক্তিশালী সামন্তরাজ্য ছিল—নাগপুরে ভোঁসলে, বরোদায় গায়কোয়াড়, ইন্দোরে হোলকার,

এবং গোয়ালিয়রে সিন্ধিয়া পরিবার খুবই শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। পুণা অঞ্চল সরাসরি পেশোয়ার অধীন ছিল। এইসব সামন্তরাজারা মুখে পেশোয়ার বশ্যতা স্বীকার করলেও সকলেই মারাঠা সাম্রাজ্যে প্রাধান্য বিস্তারে সচেষ্ট ছিলেন। ফলে তাঁদের মধ্যে বিরোধ ও যুদ্ধ বাধল। এই সুযোগ ওয়েলেস্‌লি হারালেন না। পেশোয়া দ্বিতীয় বাজী রাও বশ্যতামূলক মিত্রতার নীতি প্রথমে মেনে নিলেও তিনি পরে বিদ্রোহ করেন। ভোঁসলে ও সিন্ধিয়াও ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। হোলকার এই সময়ে এঁদের সাহায্য করেন না। এঁরা পরাজিত হয়ে ইংরেজদের বশ্যতা স্বীকার ক'রে নেন। পরে হোলকার একাকী যুদ্ধ ঘোষণা করে পরাজিত হন। এইভাবে সমগ্র মারাঠা সাম্রাজ্য অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে।

লর্ড ওয়েলেস্‌লি ইতিমধ্যে সুরাট, তাঞ্জোর, আর্কট ও অযোধ্যা রাজ্যের একটি সুবৃহৎ অংশ বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করে নিয়েছিলেন।

লর্ড ওয়েলেস্‌লির পর গভর্নর-জেনারেল হলেন **লর্ড ময়রা**। তিনি মারাঠা সাম্রাজ্যে বৃটিশ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করলেন। তিনি ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে পেশোয়া পদ তুলে দিলেন। পদচ্যুত পেশোয়া দ্বিতীয় বাজী রাওকে বছরে আট লক্ষ টাকা ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা হ'ল। লর্ড ময়রা মুঘল সম্রাটকে ভারতে মুঘল বাদশার কাল্পনিক অধিকার ত্যাগ করালেন। তিনি নেপালের রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করে সিমলা, মুসৌরি, আলমোড়া প্রভৃতি অঞ্চল বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করলেন।

**১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তারের দ্বিতীয় পর্যায়ঃ** লর্ড ময়রার পরে গভর্নর-জেনারেল হয়ে এলেন **লর্ড আমহার্স্ট**। লর্ড আমহার্স্ট ব্রহ্মদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। যুদ্ধে ব্রহ্মরাজ পাগিদোয়া পরাজিত হ'লে আসামের কাছাড়, জয়ন্তিয়া, মণিপুর, আরাকান ও তেনাসেরিমের উপর বৃটিশ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। লর্ড আমহার্স্ট ভারতে ভরতপুর রাজ্য অধিকার করেন। গভর্নর-জেনারেল লর্ড এলেন্‌বরা সিন্ধু অঞ্চলকে বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। গভর্নর-

জেনারেল **লর্ড হার্ডিং ও লর্ড ডালহাউসির** সময়ে শিখ রাজ্যেও বৃটিশ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শিখরাজ্যে গোলযোগ দেখা দেয়। ইংরেজদের কিছু কিছু কাজে শিখবাহিনীর মনে ধারণা হয় যে, ইংরেজরা শিখরাজ্য আক্রমণ করবে। তাই শিখবাহিনী শতদ্রুর পূর্বপারে ইংরেজ অঞ্চল আক্রমণ করে। ফলে ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধে। পরপর কয়েকটি যুদ্ধে ইংরেজরা জয়ী হয়ে লাহোরে পৌঁছে। শিখরা বাধ্য হয়ে ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি করে। এই সন্ধির শর্ত অনুসারে শতদ্রু ও বিপাশা নদীর মধ্যবর্তী সমস্ত অঞ্চল ইংরেজদের অধিকারে যায়। শিখদের সৈন্যসংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হয়। লাহোরে একজন ইংরেজ প্রতিনিধি রাখার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু ইংরেজদের বশ্যতা শিখদের সহ্য হল না। শিখরা বিদ্রোহ করল। চিলিওয়ানওয়ালার যুদ্ধে শিখরা জিতলেও মুলতান ও গুজরাটে ইংরেজরা বিজয়ী হয়। লর্ড ডালহাউসি শিখরাজ্য সাম্রাজ্যভুক্ত করে নেন।

ব্রহ্মদেশের রাজা ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধির শর্ত মেনে চলতে রাজী হলেন না। ইংরেজ ব্যবসায়ীদের প্রতি দুর্ব্যবহার করতে লাগলেন। লর্ড ডালহাউসি ব্যবসায়ীদের ক্ষতিপূরণ ও রেঙ্গুনের শাসনকর্তার পদচ্যুতি দাবি করে দূত পাঠালেন। বর্মীরা ইংরেজ দূতকে অপমান করে বৃটিশ জাহাজের উপর গোলাবর্ষণ করল। ফলে বর্মীদের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ বাধল। যুদ্ধে জয়ী হয়ে ইংরেজরা দক্ষিণ ব্রহ্মদেশ অধিকার করে নিল।

ভারতের বহু দেশীয় রাজ্য ইংরেজদের বশ্যতা স্বীকার ক'রে করদ-মিত্র রাজ্যে পরিণত ছিল। ডালহাউসি স্বত্ববিলোপের নীতি অবলম্বন করেন। এই নীতিতে বলা হয়, কোন দেশীয় রাজ্যের রাজা নিঃসন্তান হলে তিনি দত্তক বা পোষ্যপুত্র নিতে পারবেন না; নিলে তাঁর রাজ্য সরাসরি বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হবে। এই নীতি অনুসারে ডালহাউসি সাতারা, ঝান্সি, সম্বলপুর সাম্রাজ্যভুক্ত করে

নিলেন। কর্ণাটকের ও তাঞ্জোরের রাজারা ও পদচ্যুত পেশোয়া দত্তক নেওয়ায় তিনি তাঁদের বৃত্তি বন্ধ করে দিলেন। অযোধ্যা রাজ্যকে কু-শাসনের অজুহাতে বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করলেন।

লর্ড ডালহাউসি ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে দেশে ফিরে গেলেন। তাঁর কাজে ভারতীয়রা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছিল। ফলে পর বৎসর উত্তর ভারতে এক ভয়ানক বিদ্রোহ দেখা দিল। এই বিদ্রোহ **সিপাহী বিদ্রোহ** নামে পরিচিত।

**সিপাহী বিদ্রোহ ঃ** ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর ভারতে যে ভয়ংকর বিদ্রোহ ঘটেছিল, তা সিপাহী বিদ্রোহ নামে পরিচিত হলেও অনেকে তাকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ মনে করেন। তবে এতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর ক্রোধ ও স্বাধীনতাস্পৃহা প্রকাশ পেলেও, এই বিদ্রোহ অসন্তুষ্ট সিপাহী ও রাজ-রাজাড়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং জনসাধারণের সঙ্গে কোন যোগ ছিল না। তাই একে ভারতবাসীর প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ বলা চলে না।

ডালহাউসি স্বত্ববিলোপের নীতি অনুসারে কতকগুলি দেশীয় রাজ্যকে সরাসরি ইংরেজ শাসনে এনেছিলেন এবং দত্তক গ্রহণ করায় রাজা ও দত্তকদের ভাতা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কু-শাসনের অজুহাতে অযোধ্যা রাজ্যকে সরাসরি ইংরেজ শাসনে এনেছিলেন। এসব কারণে দেশীয় রাজারা ভয় পেয়েছিলেন। বাদশা দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্‌কে তাঁর পূর্বপুরুষের বাসভবন থেকে দিল্লির কুতবে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হচ্ছিল, তাতে মুসলমানরা অসন্তুষ্ট হয়েছিল। পদচ্যুত পেশোয়া দ্বিতীয় বাজী রাওয়ের দত্তক পুত্র নানা সাহেবের ভাতা বন্ধ করায় হিন্দুরাও অসন্তুষ্ট হয়েছিল। ইংরেজ সরকার বিভিন্ন অঞ্চলে রাজস্ব সম্পর্কে যেসব ব্যবস্থা নিয়েছিল, তাতে বহু জমিদার ক্ষতিগ্রস্ত ও সর্বস্বান্ত হয়েছিল। তাদের মধ্যেও ভয় ও অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল। দেশীয় রাজাদের ভাতা বন্ধ করায় বা দেশীয় রাজ্যগুলিকে সরাসরি ইংরেজ শাসনে আনায় ঐসব জায়গার বহু ভৃত্য, কর্মচারী ও সৈনিক বেকার হয়েছিল। এদের দুর্দশার সীমা ছিল না। এরাও ক্রুদ্ধ

হয়েছিল। এদেশের শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য ভেঙে পড়েছিল, কৃষির ওপর অত্যধিক চাপ পড়েছিল, তাই সাধারণ মানুষের অবস্থাও শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। ইংরেজ সরকার সতীদাহ, গঙ্গাসাগরে সন্তান-বিসর্জন, শিশুকন্যা বধ নরবলি দান প্রভৃতি নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল, বিধবা-বিবাহ প্রচলিত করে আইন পাস করেছিল, খ্রীষ্টান মিশনারিরা খ্রীস্টধর্ম প্রচার করেছিল। এসবের ফলে সাধারণ মানুষের ধারণা হয়েছিল যে, ইংরেজরা এদেশীয়দের ধর্মে হস্তক্ষেপ করতে চায়।

বিদ্রোহের পিছনে এই সব নানা কারণ থাকলেও সবচেয়ে বড় কারণ ছিল বৃটিশ বাহিনীতে ভারতীয় সৈন্যদের শোচনীয় অবস্থা। এদের বেতন ও সুযোগ-সুবিধা ইংরেজদের তুলনায় নগণ্য ছিল। সৈন্যদের যোগ্যতার চেয়ে কার্যকালের উপরই বেশী জোর দেওয়া হ'ত। কার্যকালে বয়সের সীমা বাঁধা না থাকায় বহু অশক্ত ও বৃদ্ধ ব্যক্তি উচ্চপদে নিযুক্ত ছিল। এইসব কারণে দেশীয় সৈন্যরা খুবই অসন্তুষ্ট ছিল। এই সময় বাইরের কয়েকটি যুদ্ধে ইংরেজরা জড়িয়ে পড়েছিল। ক্রিমিয়া, পারস্য, চীন ও ব্রহ্মদেশের যুদ্ধে ইংরেজ সৈন্যরা চলে যাওয়ায় এখন ভারতীয় বৃটিশ বাহিনীতে এদেশী সৈন্যের সংখ্যা ছিল প্রায় শতকরা আশি ভাগ। তাও সিপাহীদের বিদ্রোহে উৎসাহিত করেছিল। ভারতের বাইরে এদেশীয় সৈন্যদের পাঠাতে চাইলে জাতিনাশের ভয়ে সিপাহীরা ক্রুদ্ধ হয়েছিল। তাদের এই অসন্তোষ ও ক্রোধের বারুদের স্তূপে অগ্নিসংযোগ করল সৈন্য-বাহিনীতে 'এনফিল্ড' বন্দুকের প্রচলন। ঐ বন্দুকের টোটা দাঁতে কেটে বন্দুকে ভরতে হ'ত এবং ঐ টোটায় পশুর চবি মেশানো ছিল। হিন্দু-মুসলমানের জাতিনাশের জন্যই এই বন্দুকের প্রচলন করা হয়েছে, এই ধারণা সিপাহীদের মনে বদ্ধমূল হ'ল।

বিদ্রোহের সূচনা হ'ল কলিকাতার কাছে ব্যারাকপুরের ছাউনিতে। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে মার্চ **মঙ্গল পাণ্ডে ও ঈশ্বরী পাণ্ডে** এনফিল্ড বন্দুক ব্যবহার করতে না চেয়ে বিদ্রোহ করেন। অন্যান্য সিপাহীরা তাঁদের সমর্থন করে। মঙ্গল পাণ্ডে ও ঈশ্বরী পাণ্ডের প্রাণদণ্ড হয়।

সরকার ঐ পল্টনটি ভেঙে দেন। বহরমপুরেও বিদ্রোহ দেখা দেয়। সে বিদ্রোহও কঠোরহস্তে দমন করা হয়। কিন্তু বিদ্রোহ আম্বলায় ও মীরাটে ভয়ংকর আকার ধারণ করে। মীরাটে বহু ইংরেজ সিপাহীদের হাতে নিহত হয়। সিপাহীরা দিল্লি অধিকার করে বৃদ্ধ বাদশা **দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্‌কে** ভারতের সম্রাট বলে ঘোষণা করে। বিদ্রোহ রাজপুতানা থেকে বিহার পর্যন্ত উত্তর ভারতের নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। কানপুরে দ্বিতীয় বাজী রাওয়ের দত্তক পুত্র **নানা সাহেব** নিজেকে পেশোয়া বলে ঘোষণা করেন। এখানে বহু ইংরেজ নিহত হয়। কয়েকদিন বাদে ইংরেজরা কানপুর অধিকার করে নৃশংসভাবে এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নেয়। লখ্‌নৌয়েও সিপাহীরা বহু ইংরেজকে হত্যা করেছিল ও আটকে রেখেছিল। শেষ পর্যন্ত ইংরেজরা লখ্‌নৌ অধিকার করে আটক ইংরেজদের উদ্ধার করে। শিখ সৈন্যরা বিদ্রোহে যোগ দেয়নি। তাদের সাহায্যে ইংরেজরা দিল্লি অধিকার করে। বাদশা দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্ দুই পুত্র ও এক পৌত্রসহ বন্দী হন। দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্‌কে রেঙ্গুনে নির্বাসিত করা হয়। কয়েক বছর বাদে সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর বংশধরদের গুলি করে হত্যা করা হয়।



দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্

ইংরেজরা যখন লখ্‌নৌয়ে আত্মরক্ষা করছিল, তখন মধ্যভারতে বিদ্রোহীরা প্রবল হয়ে উঠেছিল। মারাঠা বীর **তান্তিয়া টোপি** ও ঝান্সির বিধবা রানী **লক্ষ্মীবাঈ** বিদ্রোহের নেতৃত্ব করছিলেন। তাঁরা প্রচণ্ড বিক্রমে যুদ্ধ ক'রেও শেষ পর্যন্ত পরাজিত হলেন। পুরুষবেশে যুদ্ধ করতে করতে লক্ষ্মীবাই প্রাণ দিলেন। তান্তিয়া টোপি বন্দী

হলেন। বিচারে তাঁর প্রাণদণ্ড হল। নানা সাহেব নেপালের জঙ্গলে পালিয়ে গেলেন। কেউ আর তাঁর সন্ধান পেল না। এইভাবে সিপাহী বিদ্রোহের অবসান হ'ল।



তান্তিয়া টোপী



রানী লক্ষ্মীবাঈ

সিপাহী বিদ্রোহ নানা কারণেই ব্যর্থ হয়েছিল। এদেশের জনসাধারণ এতে অংশ নেয়নি। সিপাহী বিদ্রোহ উত্তর ভারতে নানা স্থানে ঘটলেও এইসব বিদ্রোহ একই সময়ে ঘটেনি, এগুলির মধ্যে কোনও যোগাযোগ ও পূর্ব পরিকল্পনা ছিল না। সিপাহীদের যেমন অস্ত্রশস্ত্রের অভাব ছিল, তেমনি অভাব ছিল সুযোগ্য সেনাপতির। সব সৈন্যরা, বিশেষত শিখ ও গুর্খা সৈন্যরা, বিদ্রোহে যোগ দেয়নি। বিদ্রোহীদের আদর্শ ও লক্ষ্য এক ছিল না। এইসব নানা কারণে বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়েছিল।



নানাসাহেব

এই বিদ্রোহ যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল, তা-ও বলা যায় না।

এই বিদ্রোহ ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল কাঁপিয়ে দিয়েছিল। ভারতের মতো একটা সুবিশাল দেশকে একটি ব্যবসায়ী কোম্পানীর শাসনাধীনে রাখা যে উচিত নয়, তা বৃটিশ সরকার বুঝেছিল এবং ইংলণ্ডের সরকার স্বহস্তে এর শাসনভার গ্রহণ করেছিল। ইংলণ্ডের **রানী ভিক্টোরিয়া** একটি ঘোষণায় বললেন, সমাজ ও ধর্মের ব্যাপারে সরকার আর হস্তক্ষেপ করবে না; দেশীয় রাজাদের সঙ্গে কোম্পানীর চুক্তিগুলি পালিত হবে; যোগ্য ভারতীয়রা উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত হতে পারবেন।



রানী ভিক্টোরিয়া

**ইংরেজ শাসনের ফলাফল: অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অসন্তোষ:** বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ব্যবসায়ী রূপেই ভারতে এসেছিল। ভারতে তারা সাম্রাজ্য স্থাপন করলে তারা এদেশ থেকে অল্পমূল্যে বা নামমাত্র মূল্যে জিনিস কিনে ইউরোপে রপ্তানি করত। তাতে তাদের প্রচুর লাভ হ'ত। বস্ত্রশিল্পের জন্য ভারত জগদ্‌বিখ্যাত ছিল। ইংরেজ ব্যবসায়ীরা অল্পমূল্যে বা নামমাত্র মূল্যে কাপড় কেনায় তাঁতীরা অনেকেই কাপড় বোনা বন্ধ ক'রে দিয়েছিল। ফলে এদেশে বস্ত্রশিল্পের খুবই অবনতি ঘটেছিল। অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রেও ঐ রকম অবস্থা দেখা দিয়েছিল। ফলে শ্রমশিল্পীরা বেকার হয়ে পড়েছিল।

ইংরেজ কোম্পানি এদেশের জমিদারদের খাজনা আদায়ের ভার দিয়েছিল। জমিদাররা বেশি খাজনা আদায় করবার চেষ্টায় প্রজাদের উপর অত্যাচার করত। লর্ড কর্নওয়ালিস বাংলাদেশে চিরস্থায়ী ব্যবস্থা প্রবর্তন করায় জমিদাররা জমির মালিক হয়েছিল। প্রজাদের

উপর তারাও যথেচ্ছ অত্যাচার করত। ইংরেজরা নিজেরাও এদেশে জমি নিয়ে বড় বড় ক্ষেত-খামার ও বাগিচা গড়ে তুলেছিল। তারা নীল, চা, কফি ও রবারের চাষে বিশেষ মন দিয়েছিল। ঐসব ক্ষেত-খামার ও বাগিচায় নামমাত্র মজুরিতে তারা লোক খাটাত। অনেক সময় ভালো চাষের জমিকে তারা নীল চাষের জন্য চাষীদের ব্যবহার করতে বাধ্য করত। ইংলণ্ডে কলকারখানা গড়ে ওঠায় সেখানে খাদ্যশস্য ও তুলা, পাট প্রভৃতি কাঁচা মালের দরকার হওয়ায়, এবং এদেশে শিল্প-বাণিজ্য নষ্ট হওয়ায় মানুষ চাষের ওপর বেশি নির্ভরশীল হয়েছিল। কিন্তু কৃষিজাত দ্রব্য খুব সস্তায় বিক্রি হওয়ায় চাষীদের অবস্থা শোচনীয় হয়েছিল।


লর্ড কর্নওয়ালিস

ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লব হয়েছিল। তাই ইংলণ্ডের কারখানায় তৈরি জিনিস বিক্রির জন্য বাজারের দরকার ছিল। ইংরেজরা ভারতকে তাদের কলকারখানায় উৎপন্ন দ্রব্যের বাজারে পরিণত করেছিল। এইসব নানা কারণে ভারতের আর্থিক অবস্থার চূড়ান্ত অবনতি ঘটেছিল। দেশে অর্থনৈতিক অসন্তোষ ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

এদেশের মানুষ গোড়া থেকেই ইংরেজের অধীনতা স্বীকার ক'রে নেয়নি। দেশের বহু স্থানে মানুষ সুযোগ পেলেই বিদ্রোহ করছিল। দেশে অসংখ্য কৃষক বিদ্রোহ ঘটেছিল। ইংরেজ শাসকরা এইসব বিদ্রোহ কঠোরভাবে দমন করেছিল।

পরবর্তীকালে ইংরেজি ভাষা সারা দেশের শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত হয়, দেশে রেলপথ স্থাপিত হয়, সারা দেশে ডাক, তার প্রভৃতির সাহায্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা গ'ড়ে ওঠে। ফলে ভারতবাসীর মধ্যে ঐক্য ও জাতীয়তাবোধের সূচনা হয়। ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা ক্রমেই ইংরেজদের প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে থাকে এবং শিক্ষিত

মানুষও ইংরেজের কৃপালাভে বঞ্চিত হয়ে অসন্তুষ্ট হয়। এইভাবেই ভারতে আধুনিককালের রাজনীতির সূচনা ঘটে।

## প্রশ্নাবলী

১। সুবে বাংলা বলতে কি বোঝ? বাংলাদেশে ইংরেজরা কিভাবে আধিপত্য স্থাপন করেছিল?

২। হায়দর আলি ও টিপু সুলতান কিভাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন?

৩। কিভাবে মারাঠা সাম্রাজ্যের পতন হয়েছিল?

৪। প্রথম ও দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধ কেন হয়েছিল? ঐ দুই যুদ্ধের ফলে বৃটিশ অধিকার কোথায় কোথায় বিস্তৃত হয়েছিল?

৫। কিভাবে শিখ রাজ্য ইংরেজরা অধিকার করেছিল?

৬। বশ্যতামূলক মিত্রতার নীতি কি? কে এই নীতি ঘোষণা করেছিলেন? ঐ নীতি মেনে না নেওয়ায় কাদের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ হয়েছিল?

৭। স্বত্ববিলোপের নীতি কি? ঐ নীতি কে গ্রহণ করেছিলেন? ঐ নীতি অনুসারে কোন্ কোন্ রাজ্য সরাসরি ইংরেজদের শাসনে এসেছিল? কাদের ভাতা বন্ধ হয়েছিল?

৮। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহকে অনেকে কি বলেন? তাঁরা ঠিক বলেন কি? সিপাহী বিদ্রোহের কারণ কি ছিল?

৯। সিপাহী বিদ্রোহের বিবরণ দাও।

১০। সিপাহী বিদ্রোহের ফল কি হয়েছিল?

১১। ভারতে বৃটিশ শাসনের ফলাফল কি হয়েছিল?

১২। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

(ক) পলাশীর যুদ্ধ কত খ্রীষ্টাব্দে হয়েছিল?

(খ) মীর কাশিম কে ছিলেন? কেন ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়েছিল?

(গ) মীরজাফর কে ছিলেন? তিনি কিভাবে নবাবি পেয়েছিলেন?

(ঘ) ছিয়াত্তরের মন্বন্তর কাকে বলা হয়? কত সালে হয়েছিল?

(ঙ) মাধব রাও কে ছিলেন ?

(চ) মাধব রাও নারায়ণ কে ছিলেন ? তাঁর সময়ে শ্রেষ্ঠ মারাঠা নায়ক কে ছিলেন ?

(ছ) দ্বিতীয় বাজীরাও কিভাবে পেশোয়া-পদ হারিয়েছিলেন ?

(জ) উত্তর ব্রহ্ম কোন্ গভর্নর-জেনারেলের সময়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল ?

(ঝ) লক্ষীবাঈ কে ? কিভাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল ?

(ঞ) তান্তিয়া টোপি কে ? কিভাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল ?

(ট) নানা সাহেব কে ছিলেন ?

১৩। টীকা লিখ : (ক) টিপু সুলতান ; (খ) ইংরেজদের দেওয়ানি লাভ ; (গ) বশ্যতামূলক মিত্রতার নীতি ; (ঘ) স্বত্ববিলোপের নীতি ; (ঙ) শেষ মুঘল বাদশা।

১৪। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) পলাশীর যুদ্ধ হয়েছিল — খ্রীষ্টাব্দে।

(খ) সিপাহী বিদ্রোহ হয়েছিল — খ্রীষ্টাব্দে।

(গ) ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হয় — খ্রীষ্টাব্দে।

---

## অষ্টম অধ্যায়

# অষ্টাদশ শতাব্দীর জগৎ : যুক্তিবাদের যুগ

ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে নবজাগরণের পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল। তারই ফলশ্রুতিরূপে অষ্টাদশ শতাব্দীতে যুক্তিবাদ প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। এ বিষয়ে মন্টেস্কু, দালাঁবের, দিদেরো, ভলতেয়ার, রুশো, টম পেইন প্রভৃতির অবদান সবচেয়ে বেশি। এই যুক্তিবাদ মানুষকে নিজ অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছিল। এই যুগের প্রধান ঘটনাগুলি হ'ল আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ, ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্লব ও কৃষিবিপ্লব এবং ফরাসী বিপ্লব।

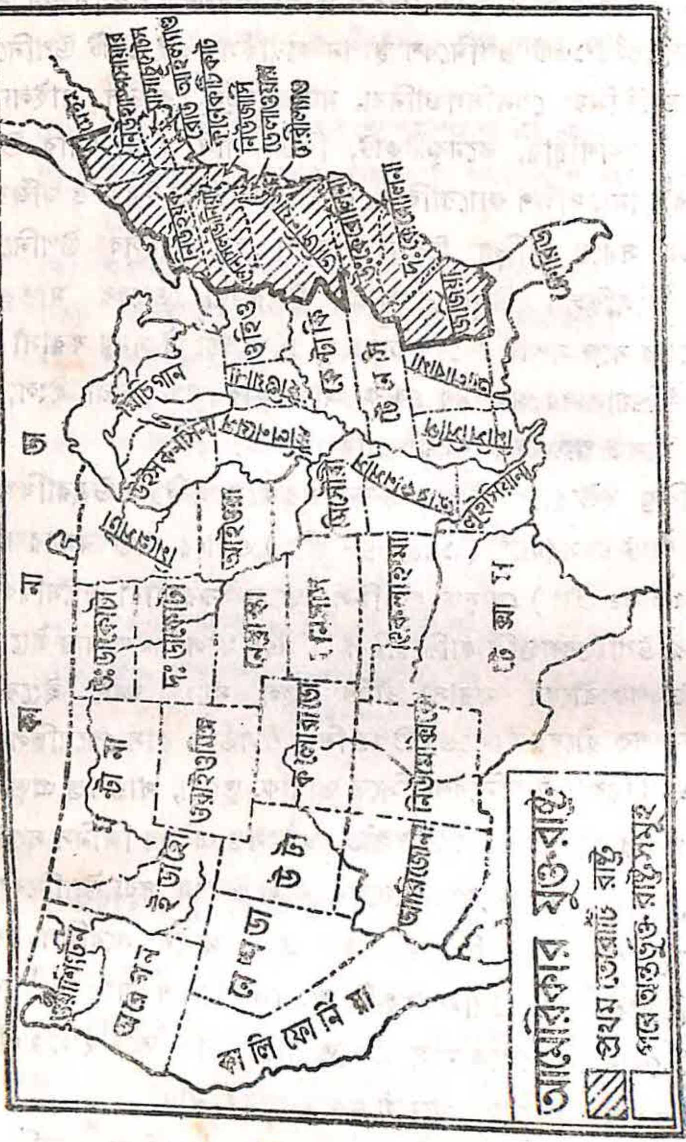
**আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধ :** ইংলণ্ড, হল্যাণ্ড ও ফ্রান্স উত্তর

আমেরিকায় কতকগুলি উপনিবেশ স্থাপন করেছিল । ইংরেজরা উত্তর আমেরিকায় ১৩টি উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। এই ১৩টি উপনিবেশ হ'ল ভার্জিনিয়া, পেন্সিলভানিয়া, মাসাচুসেট্স্, রোড্স আইল্যাণ্ড, নিউ হ্যাম্পশায়ার, কনেক্টিকাট, নিউ জার্সি, ডেলাওয়ার, উত্তর ক্যারোলিনা, দক্ষিণ ক্যারোলিনা, মেরীল্যাণ্ড, নিউ ইয়র্ক ও জর্জিয়া। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপনিবেশকারী দল এইসব উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল। উপনিবেশকারী ইংরেজরা তাদের মাতৃভূমি ইংলণ্ডের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেই চলত। বিশেষতঃ ঐ সময় ফরাসী ও রেড ইণ্ডিয়ানদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য তারা ইংলণ্ডের উপর যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভরশীল ছিল।

কিন্তু ইউরোপে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার নিয়ে আট বৎসরব্যাপী ( ১৭৪০-৪৮ খ্রীঃ ) ও পরে সাত বৎসরব্যাপী ( ১৭৫৬-৬৩ খ্রীঃ ) যে যুদ্ধ হয়েছিল, তাতে ফরাসীরা আমেরিকায় তাদের উপনিবেশগুলি হারিয়েছিল। এর ফলে এখন আর ইংরেজ উপনিবেশকারীদের ফরাসী-ভীতি ছিল না। তাই ইংরেজ-উপনিবেশকারীদের ইংলণ্ডের উপর নির্ভরশীলতাও হ্রাস পেয়েছিল।

আমেরিকার উপনিবেশগুলিতে তামাক, তুলো, খাদ্যশস্য প্রভৃতি নানাপ্রকার কৃষিজ দ্রব্য উৎপন্ন হ'ত। ইংলণ্ড এইসব জিনিস সস্তায় পাওয়ার জন্য এবং নিজেদের দেশের কলে উৎপন্ন দ্রব্য উপনিবেশ-গুলিতে বেশি দামে বিক্রয়ের জন্য এই আইন করেছিল যে, আমেরিকার ইংরেজ উপনিবেশগুলি অন্য কোন দেশে মাল পাঠাতে বা অন্য কোন দেশ থেকে মাল আনতে পারবে না। তবে ইংলণ্ড এই আইন খুব কড়াকড়িভাবে প্রয়োগ করতে পারত না।

কিন্তু ইউরোপে যেসব বড় বড় যুদ্ধে ইংলণ্ড জড়িয়ে পড়েছিল, তাতে ইংলণ্ড জয়ী হলেও তার অর্থব্যয় হয়েছিল প্রচুর। এই সব যুদ্ধে ফ্রান্স পরাজিত হয়ে আমেরিকায় তার প্রভুত্ব হারিয়েছিল, তাতে উপনিবেশবাসীদের নিরাপত্তা বেড়েছিল। সেজন্য ইংলণ্ডের সরকার মনে করল যে, যুদ্ধের বাবদ যে বিপুল অর্থব্যয় হয়েছে, তার কিছুটা


আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র
প্রথম তেরোটি রাষ্ট্র
পরে অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রসমূহ

আমেরিকার উপনিবেশগুলি থেকে উসুল করা দরকার। তাই ইংলণ্ডে **স্টাম্প অ্যাক্ট** নামে একটি আইন পাস হল। তাতে বলা হ'ল যে, আমেরিকার ইংরেজ উপনিবেশগুলির অধিবাসীদের দলিলপত্রে সরকারী টিকিট লাগাতে হবে এবং এই টিকিটের দাম ইংলণ্ড পাবে।

এই আইনের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন শুরু হ'ল। উপনিবেশ-বাসীরা বলল যে, যেহেতু ইংলণ্ডের পার্লামেন্টে উপনিবেশবাসীদের প্রতিনিধি নেই, সেইহেতু উপনিবেশের উপর কর ধার্য করার অধিকার ইংলণ্ডের নেই। আন্দোলনের ফলে ইংলণ্ড স্ট্যাম্প আইন বাতিল করল বটে, তবে তারা উপনিবেশবাসীদের যুক্তি মানল না। বলল, উপনিবেশগুলির উপর কর বসাবার অধিকার ইংলণ্ডের আছে। ইংলণ্ড চা, চিনি, কাচ ও কাগজের উপর আমদানি শুল্ক বসালো। আন্দোলনের ফলে ইংলণ্ড চিনি, কাচ ও কাগজের উপর থেকে শুল্ক তুলে নিলেও চায়ের উপর থেকে শুল্ক তুলল না। বোস্টন বন্দরে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এক জাহাজে চা এসেছিল। কয়েকজন লোক রেড ইণ্ডিয়ানের ছদ্মবেশে জাহাজে উঠে চায়ের বাক্সগুলি সমুদ্রে ফেলে দিল। ইংরেজ সরকার বোস্টন বন্দর বন্ধ করে দিল এবং সৈন্য মোতায়েন করল। নানাস্থানে হাঙ্গামা দেখা দিল। এই-ভাবে ইংলণ্ড ও উপনিবেশগুলির মধ্যে যুদ্ধ শুরু হ'ল (১৭৭৫ খ্রীঃ)। যুদ্ধ চলল সাত বছর ধরে।

ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে উপনিবেশবাসীদের আন্দোলনের নেতৃত্ব করছিলেন জর্জ ওয়াশিংটন, জন অ্যাডাম্‌স্, টমাস জেফারসন, আলেকজাণ্ডার হ্যামিল্টন, বিজ্ঞানী বেঞ্জামিন ফ্র্যাংকলিন প্রভৃতি। যুদ্ধে প্রধান সেনাপতি হলেন **জর্জ ওয়াশিংটন**।

**জর্জ ওয়াশিংটন** ছিলেন ভার্জিনিয়ার এক জমিদারের ছেলে। বাল্যকাল থেকেই তিনি ছিলেন সৎ, সত্যবাদী, নির্ভীক ও পরিশ্রমী। তিনি ইংলণ্ডের সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়ে ফরাসী ও রেড ইণ্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে উপনিবেশবাসীদের অসন্তোষ দেখা দেওয়ায় তিনি সৈন্যবাহিনী

থেকে পদত্যাগ করেন এবং ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে উপনিবেশবাসীদের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর সেনাপতিত্বে যুদ্ধে উপনিবেশবাসীরা অনুপ্রাণিত হয়ে উঠল। লেকসিন্‌টনের যুদ্ধে বৃটিশ বাহিনী পরাজিত হলেও বাংকার হিলের যুদ্ধে তারা জয়ী হ'ল। কিন্তু জর্জ ওয়াশিংটনের হস্তে বৃটিশ বাহিনী পরাজিত হয়ে মাসাচুসেট্‌স্ ত্যাগ করতে বাধ্য হ'ল। ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই ফিলাডেল্‌ফিয়া শহরে মার্কিন কংগ্রেসের যে অধিবেশন হ'ল, তাতে আমেরিকা স্বাধীনতা ঘোষণা করল।



জর্জ ওয়াশিংটন

যুদ্ধ চলতে লাগল। ফ্রান্স, স্পেন ও হল্যাণ্ডের সঙ্গে ইংলণ্ডের শত্রুতা ছিল। তাই ফ্রান্স, স্পেন ও হল্যাণ্ড ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। সমুদ্রে ইংলণ্ডের আধিপত্য বিপন্ন হওয়ায় যুদ্ধে ইংলণ্ডের বিপর্যয় ঘটল। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ সেনাপতি **লর্ড কর্নওয়ালিস** (পরে ভারতের বড়লাট) আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেন। প্যারিসে এক চুক্তিতে ইংরেজরা তেরোটি উপনিবেশের স্বাধীনতা স্বীকার করল এবং ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধের অবসান হ'ল।

চার বছর পরে ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে ফিলাডেল্‌ফিয়া শহরে স্বাধীন মার্কিন উপনিবেশগুলির সংবিধান রচিত হ'ল। এই সংবিধান অনুসারে তেরোটি উপনিবেশের এক একটি হ'ল রাষ্ট্র এবং এই তেরোটি রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত হ'ল **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র**। যুক্তরাষ্ট্রে প্রজাতন্ত্র ও গণতন্ত্র প্রবর্তিত হ'ল। রাষ্ট্রগুলির নিজের জন্য আইন করার অধিকার থাকল। ইচ্ছা করলে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাইরে যাওয়ার অধিকারও তাদের রইল। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জনসাধারণের ভোটে চার

বছরের জন্য নির্বাচিত হবেন। যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় আইনসভা রইল। এই আইনসভার নাম **কংগ্রেস**। কংগ্রেস দুইভাগে বিভক্ত—**সিনেট** ও **প্রতিনিধি-সভা**। একটি সর্বোচ্চ আদালত বা সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হ'ল। জর্জ ওয়াশিংটন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন।

পৃথিবীতে এই সর্বপ্রথম একটি সুস্থায়ী গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হ'ল, এবং এই ধরনের একটি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা মানুষের রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে আমূল বদলে দিল এবং দেশে দেশে মানুষের মনে বৈপ্লবিক চিন্তাধারা জাগিয়ে তুলল।

**ইংলণ্ডের শিল্প-বিপ্লব ও কৃষি-বিপ্লব ঃ** অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মানব সভ্যতার ইতিহাসে অতীব গুরুত্বপূর্ণ আর একটি ঘটনা ঘটেছিল—ইংলণ্ডের শিল্প-বিপ্লব ও কৃষি-বিপ্লব।

সাধারণত দ্রুত আমূল পরিবর্তনকেই বিপ্লব বলা হয়। শিল্প-বিপ্লবে উৎপাদন-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়েছিল সত্য, কিন্তু তা ধীরে ধীরে ও শান্তিপূর্ণভাবে ঘটেছিল। এই শিল্প-বিপ্লব পৃথিবীতে প্রথম ঘটেছিল ইংলণ্ডে।

ইংলণ্ড ভারতের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য ক'রে এবং তাকে নানাভাবে শোষণ করে প্রচুর অর্থের মালিক হয়েছিল। ভারত থেকে ইংলণ্ড কোটি কোটি টাকার বস্ত্র এনে ইউরোপে বিক্রি করত। তাই বস্ত্র-শিল্পের দিকেই ইংরেজদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল সকলের আগে।

এতদিন পর্যন্ত মানুষের দৈহিক শক্তি ও দক্ষতাই শ্রমশিল্পের মূলে ছিল। এতে সময় যথেষ্ট লাগায় উৎপাদন কম হ'ত, ফলে জিনিসের দাম হ'ত বেশি। কিভাবে যন্ত্রের সাহায্যে শ্রমশিল্পের, বিশেষতঃ বয়নশিল্পের উৎপাদন দ্রুত ও উন্নত করা যায়, সেদিকে ইংলণ্ডের বিজ্ঞানী ও যন্ত্রবিদ্‌রা দৃষ্টি দিলেন। ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের **জন কে** কলের মাকু আবিষ্কার করেন। কলের মাকুতে দ্রুত কাপড় বোনা সম্ভব হওয়ায় বেশী সূতোর প্রয়োজন হ'ল। বেশি সূতো দ্রুত উৎপাদনের জন্য ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে **হারগ্রীভ্‌স্** এক নূতন যন্ত্র আবিষ্কার করলেন। এর নাম **স্পিনিং জেনি**। **আর্করাইট** জলের

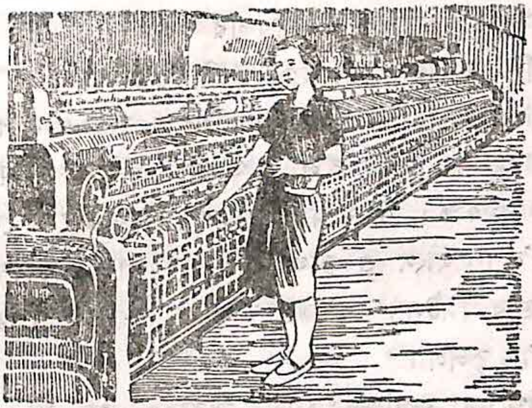
স্রোতের সাহায্যে চালিত যন্ত্রে শক্ত ও সূক্ষ্ম সূতো কাটা সম্ভব করলেন। এখন এত বেশি শক্ত মিহি সূতো কাটা হ'তে লাগল যে সব সূতো হাতে চালানো তাঁতে বোনা সম্ভব হ'ল না। তাই বাষ্পীয় শক্তির দ্বারা তাঁত চালাবার চেষ্টা চলতে লাগল। অবশেষে বাষ্প-চালিত তাঁত চালু হ'ল এবং দেশে বড় বড় কাপড়ের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হ'ল। বস্ত্রশিল্পে ইংলণ্ড এখন অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয় উঠল।

বাষ্প-শক্তিতে চালিত ইঞ্জিন ব্যবহারের চেষ্টা অনেক দিন থেকেই চলছিল। ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দ **জেমস্ ওয়াট** জল তোলার জন্য বাষ্প-চালিতপাম্প আবিষ্কার করলেন। বাষ্পচালিত-ইঞ্জিন দিয়েই তাঁত চালানোর ব্যবস্থা হ'ল। কিন্তু বাষ্পশক্তি উৎপাদনের জন্য বা বাষ্পশক্তিতে চালিত যন্ত্র নির্মাণের জন্য প্রয়োজন ছিল ভাল লোহা ও ইস্পাতের এবং কয়লার। এই সময় ইংলণ্ডে প্রচুর পরিমাণে লোহা ও কয়লার খনি আবিষ্কৃত হওয়ায় সে সমস্যার সমাধান হ'ল। কয়লা আবিষ্কারের ফলে উচ্চতাপে সহজে লোহা গলানো ও ইস্পাত তৈরি যেমন সহজ হ'ল, তেমনি বাষ্প উৎপাদনও সহজ হ'ল। কয়লা ও লোহা এখন আধুনিক সভ্যতার প্রাণশক্তি হয়ে উঠছিল।


জেমস্ ওয়াট

শিল্প-বিপ্লবের পূর্ণ বিকাশের জন্য প্রয়োজন ছিল কলকারখানায় কাঁচামাল, কয়লা প্রভৃতি দ্রুত ও প্রচুর সরবরাহ এবং উৎপন্ন পণ্যের একস্থান থেকে অন্যস্থানে প্রেরণ। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে **জর্জ স্টিফেনসন** বাষ্পচালিত গাড়ি তৈরী করলেন। এতে লোহার রেল বা পাতের উপর দিয়ে গাড়ি চালানো হ'ত। প্রথমে এই রেল গাড়িতে কয়লার

খনি থেকে কারখানায় কয়লা পাঠানো হ'ত। পরিবহনের খরচ কমায় কয়লার দাম সত্তর ভাগ কমে যায়। গোড়ার দিকে রেলগাড়ি ঘন্টায় পনের মাইল বেগে দৌড়ে মানুষকে অবাক করে দিয়েছিল। ক্রমেই এর গতিবেগ বাড়ে। কেবল কাঁচামাল, কয়লা ও পণ্যের বহনের কাজে নয়, লোক বইবার কাজেও রেলগাড়ি ব্যবহৃত হতে



আধুনিক সুতো-কাটা কল

থাকে। অল্পকালের মধ্যে বাষ্পচালিত জাহাজও খালে, নদীতে ও সমুদ্রে চলে। পথঘাটের উন্নতি হয়। পাকা রাস্তা ও পরে পিচ-ঢালা রাস্তাও তৈরী হয়। পরিবহণ ব্যবস্থার এই উন্নতি কেবল শিল্প বিপ্লবের বিকাশ দ্রুত করে না, মানব-সভ্যতাতেও যুগান্তর আনে।

**কৃষি-বিপ্লব ঃ** কলকারখানার উন্নতির ফলে অসংখ্য মানুষ কৃষি ও পশুপালন ছেড়ে কলকারখানায় যোগ দিয়েছিল। এতে দেশে খাদ্যাভাব দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফলে সে সমস্যারও সমাধান হ'ল। উর্বরা-শক্তি রক্ষার জন্য এতদিন দু'বছর পর পর এক জমিতে ফসল তুলে, তৃতীয় বছর সেই জমিতে আর চাষ করা হ'ত না। কিন্তু প্রতি বছর দেশের এক-তৃতীয়াংশ জমি অনাবাদী থাকত। ইংলণ্ডের এক মন্ত্রী, টাউনশেণ্ড পরীক্ষা করে দেখলেন যে,

জমিতে প্রতি বছর ফসল পরিবর্তন করে চাষ করলে জমির উৎপাদিকা-শক্তি কমে না। কাজেই দেশের এক-তৃতীয়াংশ জমি অনাবাদী ফেলে রাখার প্রয়োজন নেই। এই প্রথা প্রবর্তিত হওয়ায় খাদ্যশস্যের উৎপাদন বেড়ে গেল। জমিতে কোন্ ফসলের পর কোন্ ফসল দিলে ফসল ভালো হবে, তাও পরীক্ষা ক'রে আবিষ্কার করা হ'ল। জমিতে সার প্রয়োগের ব্যবস্থা হ'ল। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে **জেথরো টাল** জমি চষবার নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন। সারি করে সম দূরত্বে সমপরিমাণ বীজবপনের যন্ত্রও আবিষ্কৃত হ'ল।

কৃষিতে ফসল পরিবর্তন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ায় এখন সারা বছর পশুখাদ্যের যোগান সম্ভব হ'ল। আগে কেবল পশমের জন্যই মেষপালন করা হ'ত। এখন মাংসের জন্য বিশেষ ধরনের মেষপালন প্রচলিত হ'ল। মাংস ও দুধের সরবরাহ বাড়ায় দেশে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব মিটল। খাদ্যের উপযুক্ত সরবরাহ শিল্পবিপ্লবকে ত্বরান্বিত ক'রে তুলল।

**শিল্প-বিপ্লবের ফলাফল ঃ** শিল্প-বিপ্লবের ফল মানবসভ্যতায় যুগান্তকারী ও সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। বড় বড় কলকারখানা স্থাপিত হওয়ায় অল্পসময়ে ও অল্পব্যয়ে প্রচুর দ্রব্য উৎপন্ন হ'ল। এতে মানুষের জীবনযাত্রার মান যেমন উন্নত হ'ল, তেমনি শিল্পোন্নত দেশগুলির প্রচুর অর্থাগম হ'ল। এর ফলে সমাজে নূতন শ্রেণীর সৃষ্টি হ'ল। কলকারখানার মালিক ধনিক শ্রেণী এবং শ্রমিক শ্রেণী। এতদিন পর্যন্ত শ্রমশিল্পী বা করিগররাই তাদের শ্রম ও দক্ষতা দিয়ে বস্তু উৎপন্ন করত। সেই ছিল কাঁচামাল, যন্ত্র ও উৎপন্ন দ্রব্যের মালিক। উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করে সে পারিশ্রমিক পেত। কিন্তু এখন শ্রমিক-শ্রেণী কোন কিছুরই মালিক রইল না, কোন জিনিস সে একাও তৈরী করে না, সে এখন বেতনভোগী কর্মীমাত্র। কলকারখানার কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ও উৎপন্ন পণ্যের অধিকারী কলকারখানার মালিক। তিনিই উৎপন্ন পণ্য বিক্রয় করে লভ্যাংশ পান। মালিক শ্রমিককে যত কম পারিশ্রমিক দেন, ততই তাঁর লভ্যাংশ বাড়ে। এইভাবে চলে

শ্রমিকশোষণ। ফলে নিজেদের স্বার্থরক্ষায় শ্রমিকরা ধনিকদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়।

**ফরাসী বিপ্লব ঃ** অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ায় ফ্রান্সের রাজসভায় ঐশ্বর্য-বিলাস ও আদব-কায়দা সারা ইউরোপের সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষের কাছে অনুকরণীয় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু রাজা ও অভিজাতদের এই ভোগ-বিলাস ও ঐশ্বর্যসমারোহের জন্য যে বিপুল অর্থব্যয় হ'ত, তা যোগাত দেশের সাধারণ মানুষ। ক্রমাগত যুদ্ধের জন্যও অর্থ যোগাত জনসাধারণ। এর ফলে তাদের দুঃখ-দারিদ্র্যও চরম সীমায় এসে পেঁৗছেছিল। রাজ্যের যত কিছু সুখ-সুবিধা ভোগ করত অভিজাত ও যাজক সম্প্রদায়। দেশের বেশির ভাগ জমিই ছিল এদের দখলে। এরা ছিল ধনী। অথচ এদের কর দিতে হ'ত না। বড় বড় চাকরি ও সব সুখ-সুবিধা তারাই পেত, বিলাসে দিন কাটাত।

জনসাধারণ রাজ্যের ও রাজসভার সব খরচ যোগালেও তাদের কোন অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা ছিল না। আর জনসাধারণ বলতে কেবল কৃষক, শ্রমিক, কারিগর, ছোট-ব্যবসায়ী ও কর্মচারীকে বোঝাতো না, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক, ধনী ব্যবসায়ী ও কলকারখানার ধনী মালিকদেরও বোঝাত। এরা প্রচুর কর দিত, অর্থ দিয়ে রাজাকে সাহায্য করত, কিন্তু তবু সমাজ এদের সম্মান দিত না, অভিজাত ও যাজক শ্রেণীর লোকেরা এদের ঘৃণার চক্ষে দেখত। দেশের শাসন-ব্যাপারে এদের কোন কর্তৃত্ব ছিল না। অথচ এরা ছিল বুদ্ধিমান, শিক্ষিত, পরিশ্রমী ও নির্ভীক। এদেরও অসন্তোষের সীমা ছিল না। তাই এদের নেতৃত্বে সাধারণ মানুষ রাজা, অভিজাত ও যাজক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিপ্লব করল।

দেশের এই অসহনীয় ও অযৌক্তিক অবস্থা দূর করবার উপায় খুঁজছিলেন দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা। এঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য ছিলেন মন্টেস্কু, ভলতেয়ার ও রুশো। **মন্টেস্কু** দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সমালোচনা করেন। তিনি ফ্রান্সের স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের নিন্দা করেন এবং ইংলণ্ডের

নিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্রের প্রশংসা করেন। **ভল্‌তেয়ার** বলেন, রাজার কোন ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা নেই, ফ্রান্সের রাজাদের স্বেচ্ছাচারের ফল কখনই ভালো হ'তে পারে না। তিনি চার্চেরও নিন্দা করেন, বলেন, চার্চ মানুষকে পাপ থেকে উদ্ধার না ক'রে পাপের পথে ঠেলে দেয়। **রুশো** বললেন, মানব সভ্যতার প্রথম যুগে মানুষ ছিল স্বাধীন। মানুষ জন্মায় স্বাধীন হয়ে, কিন্তু সে সর্বত্র শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে আছে। আদিম কালে মানুষ প্রকৃতির রাজ্যে বাস করত, তখন তাদের পাপ ও অপরাধ-প্রবণতা ছিল না। সমাজ ও শিক্ষাই তাকে পাপী ক'রে তুলেছে। সুশাসনের শর্তেই জনসাধারণ রাজাকে শাসন-ক্ষমতা দিয়েছিল, সুতরাং রাজার স্বেচ্ছাচারের অধিকার নেই। মন্টেস্কু, ভল্‌তেয়ার, রুশো প্রভৃতির বাণী ফ্রান্সের জনসাধারণকে স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সচেতন করে তুলেছিল।


রুশো

ফ্রান্সের জনসাধারণের দুঃখ-দারিদ্র্য চরমে উঠেছিল। রাজা ও রাজপরিবারের বিলাস-ব্যসন এবং ক্রমাগত যুদ্ধে রাজার ভাণ্ডার প্রায় শূন্য হয়েছিল। রাজা ষোড়শ লুই ছিলেন দুর্বলচিত্ত। তিনি নূতন নূতন মন্ত্রী নিয়োগ ক'রেও এই সমস্যার সমাধান করতে পারলেন না। বুদ্ধিমান মন্ত্রীরা রাজকোষের অর্থাভাব দূর করার জন্য অভিজাত শ্রেণীর উপরও কর স্থাপন করতে বললেন কিন্তু তিনি অভিজাত শ্রেণীর চাপে তা না ক'রে মন্ত্রীদের পদচ্যুত করলেন। রাজা শেষে নিরুপায় হয়ে জাতির কাছে আবেদন করলেন। ইংলণ্ডের পার্লামেন্টের মতো ফ্রান্সেও একটি পার্লামেন্ট ছিল। এর নাম ছিল **স্টেট্‌স্‌-**

**জেনারেল**। একশ পঁচাত্তর বছরের মধ্যে এর অধিবেশন হয় নি। তাই নূতন ক'রে স্টেট্স্-জেনারেলের নির্বাচন হ'ল। জনসাধারণের প্রতিনিধিরা সংখ্যাধিক্য পেয়েছিলেন। কিন্তু অভিজাত সম্প্রদায়, যাজক সম্প্রদায় ও জনসাধারণের প্রত্যেকের ছিল ১টি করে ভোট। জনসাধারণের প্রতিনিধিরা সদস্য-পিছু ১টি করে ভোট চাইলেন তাতে রাজা সম্মত হলেন না। তখন জনসাধারণের প্রতিনিধিরা এক টেনিস-খেলার মাঠে সমবেত হয়ে ঘোষণা করলেন যে, তাঁরাই জাতির প্রকৃত **জাতীয় মহাসভা**। তাঁরা দেশের জন্য নূতন সংবিধান রচনা ক'রে রাজতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রিত না করা পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন। তাঁদের নেতৃত্ব করতে লাগলেন **কাউন্ট মিরাবো, দাতঁ, মারা, রব্‌স্‌পীয়ের** প্রভৃতি জননায়করা।



ষোড়শ লুই

এই অবস্থায় রাজা রাজধানী প্যারিসে সৈন্যদল ডেকে আনলেন। ফলে জনসাধারণের মধ্যে তুমুল বিক্ষোভ দেখা দিল। অজন্মার ফলে দেশে প্রচণ্ড খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছিল। হাজার হাজার ক্ষুধিত মানুষ গ্রামাঞ্চল থেকে এসে প্যারিসে জড় হয়েছিল। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই এক উন্মত্ত জনতা প্যারিসের কুখ্যাত কারাগার **বাস্তিল দুর্গ ধ্বংস** করে বন্দীদের মুক্ত করে দিল (১৪ই জুলাই)। এইভাবে ফরাসী বিপ্লব শুরু হ'ল। ঐ দিনটিকে ফরাসীরা জাতীয় দিবস হিসাবে পালন করে। বিপ্লবীরা শহরে শান্তিরক্ষার জন্য একটি পরিষদ ও সৈন্যদল গঠন করল। জনসাধারণের বিক্ষোভ প্যারিস থেকে অন্যান্য শহরে ও গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল।

এদিকে জাতীয় মহাসভার কাজ অনেক দূর এগিয়েছিল। অভিজাত ও যাজক সম্প্রদায়ের বিশেষ সুবিধা ও অধিকারগুলি লোপ করা হ'ল।

স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর আদর্শ গৃহীত হ'ল, বলা হ'ল স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার, তাতে হস্তক্ষেপ করা চলবে না ; সকল প্রজাই আইনের চক্ষে সমান এবং সকলেই সৌভ্রাত্র্য-সূত্রে আবদ্ধ।

কিন্তু দেশে খাদ্যাভাব ক্রমেই ভয়ংকর হয়ে উঠল। কেবল তাই নয়, ঐ সময় রাজভক্ত ফ্ল্যাণ্ডার্স বাহিনীও এসে পৌঁছল। প্যারিসে গুজব রটল যে, প্রজাদের জব্দ করার জন্য রাজার লোকে সমস্ত শস্য কিনে রেখেছে এবং রাজা বিপ্লবীদের দমন করছেন। তখন রাজা প্যারিসে থাকতেন না, থাকতেন ভার্সাই শহরে। ক্ষুধার্ত জনতা শোভাযাত্রা করে ভার্সাইয়ে গেল। উন্মত্ত জনতা দেখে রাজা ভীত হলেন। উল্লসিত জনতা তাঁকে প্যারিসে আনল।

এর পর প্রায় দেড় বছর কিছুটা শান্তিতে কাটল। এই সময় জাতীয় মহাসভা শাসন-সংস্কারে ব্যস্ত ছিল। নূতন সংবিধানে রাজার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত করা হ'ল। তখন রাজতন্ত্র উচ্ছেদের কথা বিপ্লবীরা ভাবেন নি। ইংলণ্ডের মতো একটি নিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁদের লক্ষ্য। তাই রাজা ও রানীর বিপদের কোনও ভয় ছিল না। রানী মারী আঁতোয়ানেত্ ছিলেন অস্ট্রিয়ার রাজকন্যা। তিনি চাইতেন যে, অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া প্রভৃতি ফ্রান্স আক্রমণ ক'রে তাঁদের এই অবস্থা দূর করুক। রাজা ষোড়শ লুই রানী আঁতোয়ানেতের প্ররোচনায় নির্বোধের মতো একটি কাজ করলেন। তিনি সপরিবারে রাজ্য ছেড়ে গোপনে পলায়নের চেষ্টা করলেন ( জুন, ১৭৯১ )। কিন্তু পথে জাতীয় রক্ষী-বাহিনীর হাতে ধরা পড়লেন। তাঁকে সপরিবারে প্যারিসে ফিরিয়ে আনা হ'ল। রাজার গোপন পলায়ন চেষ্টা দেখে



রানী মারী আঁতোয়ানেত্

প্রজারা ক্রুদ্ধ হ'ল। এই সময় অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার রাজারা ঘোষণা করলেন যে, তাঁরা ফ্রান্সের রাজাকে তাঁর পুরাতন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে দৃঢ়সংকল্প।

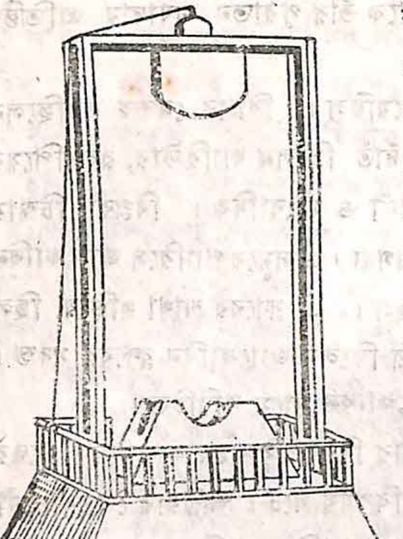
ইতিমধ্যে মিরাবোর মৃত্যু হয়েছিল। বিপ্লবে নেতৃত্ব করছিলেন দাঁতঁ, মারা ও রব্‌স্‌পিয়ের। দাঁতঁ ছিলেন ব্যারিস্টার, রব্‌স্‌পিয়ের উকিল এবং মারা ডাক্তার, বিজ্ঞানী ও সাংবাদিক। বিপ্লবী চিন্তায় কর্মদক্ষতায় মারাই ছিলেন সর্বাগ্রগণ্য। ঐ সময়ে প্যারিসে **জ্যাকোবিন** ক্লাব নামে একটি বিপ্লবী ক্লাব ছিল। ঐ ক্লাবের শাখা ছড়িয়ে ছিল সারা দেশে। মারা ও রব্‌স্‌পিয়ের ছিলেন জ্যাকোবিন ক্লাবের সদস্য। জ্যাকোবিন ক্লাবের সদস্যরা **জ্যাকোবিন** নামে পরিচিত।

১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। যুদ্ধের গোড়ার দিকে বিপ্লবী সৈন্যদলের বিপর্যয় ঘটে। অস্ট্রিয়ার সৈন্যবাহিনী ফ্রান্সের মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং প্যারিসের দিকে অগ্রসর হয়। প্যারিসের বিপ্লবী জনতা মনে করল, রাজাই অস্ট্রিয়ার সৈন্যদলকে ডেকে এনেছেন। তারা রাজার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে বহু রাজতন্ত্রী বন্দীকে হত্যা করল এবং রাজা সপরিবারে বন্দী হলেন।

১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ ক'রে দেশে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করা হ'ল। যুদ্ধের মোড়ও ফিরে গেল। নূতন অনুপ্রেরণায় বিপ্লবী বাহিনী উদ্‌বুদ্ধ হয়ে বীর বিক্রমে শত্রুদের দেশের মাটি থেকে বিতাড়িত করল এবং শত্রু রাজ্যের ভূমিতে গিয়ে পেঁ ীছল। বিপ্লবী বাহিনী যখন শত্রু রাজ্যের মধ্য দিয়ে বিজয় গৌরবে এগিয়ে চলেছে, তখন দেশের মধ্যে রাজতন্ত্রীরা কয়েক জায়গায় রাজাকে সিংহাসনে বসাবার জন্য বিদ্রোহ করল। তাই রাজাকে মুক্ত বা বন্দী অবস্থায় রাখা নিরাপদ ছিল না। রাজা ও রানীর বিচার হ'ল। বিচারে তাঁরা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হলেন।

ঐ সময়ে ডাঃ গিলাটন নামে একজন বিপ্লবী একটি শিরশ্ছেদ যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর নাম অনুসারে ঐ হত্যাযন্ত্রের নাম হয়েছিল **গিলটিন**। গিলটিনে রাজা সপরিবারে প্রাণ দিলেন

(জানুয়ারি, ১৭৯৩ খ্রীঃ)। গিলটিনে বহু রাজতন্ত্রী ও দেশদ্রোহীকে হত্যা করা হ'ল। এই সময় বিপ্লবের প্রধান নেতা মারা এক আততায়িনীর হস্তে নিহত হলেন। ফ্রান্সের বিপ্লবী জনসাধারণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। এখন সন্দেহ ক্রমে বহু বিপ্লবীকেও গিলটিনে হত্যা করা হ'ল। এমন কি, শত্রু দেশগুলির সঙ্গে আপোসের চেষ্টা করেছেন এই অভিযোগে দাঁতঁও গিলটিনে প্রাণ দিলেন। এখন বিপ্লবের সর্বময় কর্তা হয়ে উঠলেন রবস্‌পিয়ের। সারা দেশে সন্ত্রাসের রাজত্ব শুরু হ'ল।



গিলটিন যন্ত্র

অবশেষে রবস্‌পিয়েরকেও গিলটিনে হত্যা করা হ'ল। এইভাবে ১৪ মাস ব্যাপী সন্ত্রাসের রাজত্বের অবসান হ'ল। এখন ফ্রান্সের শাসনভার পাঁচজন বিপ্লবী নেতা নিয়ে গঠিত এক পরিচালকসভার উপর দেওয়া হ'ল। যুদ্ধে বিপ্লবী বাহিনী বিজয়ী হ'তে লাগল। দেশবাসীর মনোবল ফিরে এল।



রবস্‌পিয়ের

**নেপোলিয়ন বোনাপার্ট**ঃ কিন্তু দেশে তখনও কিছু কিছু রাজতন্ত্রী ছিল। তারা প্যারিসে একটি বিদ্রোহ করল। এই বিদ্রোহের দমনের ভার পড়ল এক তরুণ বিপ্লবী সেনাপতির উপর।

তিনি সহজেই বিদ্রোহ দমন ক'রে জনপ্রিয়তা অর্জন করলেন। এই তরুণ সেনাপতির নাম **নেপোলিয়ন বোনাপার্ট**।

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ছিলেন কর্সিকার এক উকিলের পুত্র। তিনি বিশ বছর বয়সে ফ্রান্সের বিপ্লবী বাহিনীতে যোগ দেন। ইতিহাস ও অঙ্কশাস্ত্রের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। তিনি অল্প বয়সেই রুশোর ভক্ত হয়ে ওঠেন। রবস্‌পিয়েরের পতন পর্যন্ত তিনি জ্যাকোবিন দলেই ছিলেন।



নেপোলিয়ন বোনাপার্ট

নেপোলিয়ন সামরিক সাফল্যের ফলে দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। তাঁর সামরিক সাফল্যে ফ্রান্স আবার তার হৃতগৌরব ফিরে পায়। ইটালি তখন অস্ট্রিয়ার অধীন ছিল। ইটালিতে পর পর তিনি কতকগুলি যুদ্ধে জয়লাভ করেন এবং উত্তর ইটালির কতকগুলি রাজ্যকে ঐক্যবদ্ধ ক'রে একটি প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর বিজয়-অভিযান অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনার কাছে গিয়ে পৌঁছলে অস্ট্রিয়া তাঁর সঙ্গে সন্ধি করে। অতঃপর তিনি মিশর অধিকার করেন। তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয় ওঠেন এবং ফ্রান্সে ফিরে এসে পরিচালক-সভা ভেঙে দিয়ে প্রধান কনসালরূপে দেশ শাসন করতে থাকেন।

কিন্তু ফ্রান্সের সর্বময় কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর তিনি বিপ্লবের কথা ভুলে যান এবং ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে নিজেকে ফ্রান্সের সম্রাট বলে ঘোষণা করেন। যে অস্ট্রিয়া ফ্রান্সের প্রধান শত্রু ছিল, তারই এক রাজকন্যাকে তিনি বিবাহ করেন। ক্রমেই ক্ষমতার নেশা তাঁকে উন্মত্ত করে তোলে। তিনি দক্ষিণ জার্মানির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি জয়

করে সেগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করেন। হল্যাণ্ড ও প্রাশিয়া তাঁর পদানত হয়। তিনি স্পেন জয় করেন। তিনি অল্পকালের মধ্যেই রাশিয়া-জয়ের জন্য ছয় লক্ষ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে রাশিয়া অভিযান করেন এবং রাশিয়ার রাজধানী মস্কোতে গিয়ে পৌঁছেন। কিন্তু রুশ সম্রাট তাঁর বশ্যতা স্বীকার করতে বা তাঁর সঙ্গে সন্ধি করতে রাজী হন না। এই সময় প্রচণ্ড শীত পড়ে। প্রচণ্ড শীত, খাদ্যাভাব, এবং রুশ বাহিনীর চোরা আক্রমণে ফরাসী সৈন্যরা পিপীলিকার মতো মরে। নেপোলিয়ন রাশিয়া ত্যাগ করতে বাধ্য হন। তাঁর ছয় লক্ষ সৈন্যের সুবিশাল বাহিনী মাত্র দুই লক্ষ্য সৈন্যের বাহিনীতে পরিণত হয়।

রাশিয়া-আক্রমণই নেপোলিয়নের কাল হ'ল। রাশিয়ায় তাঁর পরাজয়ের ফলে অস্ট্রিয়া, রাশিয়া, হল্যাণ্ড, স্পেন, ইংলণ্ড, সুইডেন, সকলেই তাঁর বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াল। এই সম্মিলিত শক্তির কাছে নেপোলিয়ন পরাজিত হয়ে সিংহাসন ত্যাগ করলেন। তাঁকে এল্‌বা দ্বীপে নির্বাসিত করা হ'ল। এখন রাজা যোড়শ লুইয়ের ভাই অষ্টাদশ লুই নামে ফ্রান্সের সিংহাসনে বসলেন।

নেপোলিয়ন এল্‌বা দ্বীপে এগারো মাস থাকার পর হঠাৎ গোপনে ফ্রান্সে ফিরে এলেন। আবার ফরাসী জনসাধারণ ও বিপ্লবীরা তাঁর পিছনে এসে দাঁড়াল। তিনি সৈন্য সংগ্রহ করে আবার যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। কিন্তু ওয়াটারলুর যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতি ডিউক অব ওয়েলিংটনের হাতে তাঁর চূড়ান্ত পরাজয় হ'ল (১৮১৫ খ্রীঃ)। এবার তাঁকে এই আটলান্টিক মহাসাগরে সুদূর নির্জন সেন্ট হেলেনা দ্বীপে বন্দী করে রাখা হ'ল (১৮১৮ খ্রীঃ)। সেখানে পরে ক্যান্সার রোগে তাঁর মৃত্যু হয়।

**ফরাসী বিদ্রোহের ফলাফল ঃ** ফরাসী বিপ্লবের ফলাফল মানব সভ্যতার ইতিহাসে সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। আমেরিকার স্বাধীনতা লাভ ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠায় পৃথিবীতে প্রজাতন্ত্র ও গণতন্ত্রের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ফরাসী বিপ্লব সঙ্গে সঙ্গে সাফল্যলাভ না করলেও

স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর যে বাণী ও আদর্শ প্রচার করেছিল, তা সভ্য মানুষের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল এবং তার ফল সুদূর-প্রসারী হ'ল। এই আদর্শের ভিত্তিতেই পরবর্তী অর্ধ শতাব্দীর বিপ্লবগুলি সংঘটিত হয়েছিল এবং ইউরোপের মানচিত্রে বহু পরিবর্তন ঘটেছিল। জার্মানি ও ইটালি ঐক্যবদ্ধ দুই শক্তিশালী জাতিরূপে আত্মপ্রকাশ করছিল, এমন কি এই আদর্শই পরবর্তী কালের রুশ বিপ্লবেরও প্রেরণা যুগিয়েছিল।

এই বিপ্লবের ফলে ইউরোপের সামন্তপ্রথা বিলুপ্ত হয়েছিল, সামন্ততন্ত্রের স্থলে ধনতন্ত্র ও গণতন্ত্রের বিকাশের পথ সুগম হয়েছিল। জনসাধারণ নিজেদের শক্তি সম্পর্কে সচেতন হয়েছিল এবং শাসক-শ্রেণীও জনসাধারণের শক্তি সম্পর্কে সাবধান হ'তে বাধ্য হয়েছিল। রাজতন্ত্রগুলি স্বেচ্ছাচারের পথ ত্যাগ করে জনসাধারণের সমর্থন লাভের জন্য সচেষ্ট হয়েছিল।

## প্রশ্নাবলী

১। আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধ কাদের মধ্যে হয়েছিল? এই যুদ্ধের কারণ কি? যুদ্ধের বিবরণ ও ফল সম্পর্কে যা জান লিখ।

২। টীকা লিখ: (ক) জর্জ ওয়াশিংটন, (খ) স্ট্যাম্প অ্যাক্ট।

৩। যে তেরটি উপনিবেশ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র গঠিত, তাদের নাম লিখ।

৪। ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লব সম্পর্কে যা জান লিখ।

৫। ইংলণ্ডে কৃষি-বিপ্লব সম্পর্কে যা জান লিখ।

৬। ইংলণ্ডের শিল্প-বিপ্লবে পরিবহণ ও যানবাহনের কি কি উন্নতি ঘটেছিল?

৭। টীকা লিখ: (ক) কার্টরাইট; (খ) জেম্‌স্ ওয়াট; (গ) স্পিনিং জেনি; (ঘ) জর্জ স্টিভেনসন; (ঙ) টাইনশেণ্ড; (চ) জেথ্‌রো টাল।

৮। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের যুক্তিবাদী লেখকদের সম্পর্কে কি জান? তাঁদের রচনা কিভাবে মানুষের মনে বিপ্লবী চেতনা ঘটিয়েছিল?

৯। স্টেট্‌স্-জেনারেল কি? স্টেট্‌স্-জেনারেলের অধিবেশন কিভাবে বিপ্লবের সূচনা করেছিল?

১০। ফরাসী বিপ্লবের প্রধান নায়করা কে? তাঁদের সম্পর্কে কি জান লিখ।

১১। কাদের 'জ্যাকোবিন' বলা হয়? বিপ্লবে এদের ভূমিকা বর্ণনা কর।

১২। টীকা লিখ: কাউন্ট মিরাবো; দাঁতঁ; মারা; রবস্পিয়ের।

১৩। ফরাসী বিপ্লবের ফলাফল কি হয়েছিল?

১৪। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট সম্পর্কে যা জান লিখ।

১৫। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট বিপ্লবের প্রতি কি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন? তাঁর পতনের প্রধান কারণ কি?

**সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:**

১। প্রথমে কয়টি উপনিবেশ নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল?

২। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্টের নাম কি?

৩। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের কয়েকজন প্রধান নেতার নাম বল।

৪। কত খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়েছিল? কত খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল? কত খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নূতন সংবিধান রচিত হয়েছিল?

৫। কোথায় সর্বপ্রথম স্থায়ী প্রজাতন্ত্র ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?

৬। স্পিনিং জেনি কে আবিষ্কার করেছিলেন?

৭। বাষ্পচালিত পাম্প কে আবিষ্কার করেছিলেন?

৮। রেলগাড়ি কে আবিষ্কার করেছিলেন?

৯। স্টেট্‌স্‌-জেনারেল কি?

১০। ফরাসী বিপ্লবের সময়ে ফ্রান্সের রাজা ও রানী কে ছিলেন?

১১। কাউন্ট মিরাবো কে?

১২। মারা কে? কিভাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল?

১৩। দাঁতঁ কে? কিভাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল?

১৪। 'গিলটিন' কি? কেন গিলটিন নাম হয়েছিল?

১৫। নেপোলিয়ন বোনাপার্টের বাবা পেশায় কি ছিলেন? নেপোলিয়ন বোনাপার্ট কোথায় জন্মেছিলেন?

১৬। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট শেষে কোথায় বন্দী ছিলেন? কিভাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল?

১৭। কোন্ কোন্ সেনাপতি নেপোলিয়নকে পরাজিত করেন?

১৮। নেপোলিয়ন কোথাকার রাজকন্যাকে বিবাহ করেছিলেন?

১৯। রাশিয়ায় নেপোলিয়নের অভিযান ব্যর্থ হয়েছিল কেন?

## নবম অধ্যায়

# ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ইউরোপের ইতিহাস

**জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র বনাম প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি :** নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর ফ্রান্সের বিজয়ী শত্রুরাজ্যগুলি অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় ইউরোপের রাজ্যগুলির পুনর্বিন্যাস ও শান্তিরক্ষা-ব্যবস্থা উদ্ভাবনের জন্য মিলিত হয়েছিল। এই সম্মেলন **ভিয়েনা কংগ্রেস** নামে পরিচিত। এতে প্রধান অংশ নিয়েছিলেন রাশিয়ার জার **প্রথম আলেকজাণ্ডার,** অস্ট্রিয়ার বিদেশ-মন্ত্রী **প্রিন্স মেটারনিক** ও ইংলণ্ডের বিদেশমন্ত্রী **ক্যাস্‌ল্‌রী**। এঁদের মধ্যেও বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছিলেন প্রিন্স মেটারনিক। তিনি এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মেছিলেন এবং যুদ্ধের সময়ে নেপোলিয়নের হস্তে বন্দী হয়েছিলেন। তিনি সুদীর্ঘকাল অস্ট্রিয়ার বিদেশ-মন্ত্রী ছিলেন, অনেকদিন প্রধান মন্ত্রীও ছিলেন। তিনি ছিলেন অতিশয় প্রতিক্রিয়াশীল ; স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রী প্রভৃতি শব্দগুলি তাঁর কাছে ছিল অর্থহীন।

ভিয়েনা কংগ্রেসে যারা সমবেত হয়েছিলেন, তাঁরা ফরাসী বিপ্লব এবং নেপোলিয়নের উত্থান ও পতন থেকে কোনও শিক্ষালাভ করেন নি। ফরাসী বিপ্লবের ফলে মানুষের মনে যে চেতনা জেগেছিল, তার মূলে ছিল দুটি প্রশ্ন—কিভাবে রাষ্ট্রগুলির পুনর্গঠন হবে এবং শাসনব্যবস্থায় জনসাধারণের ইচ্ছা কতখানি প্রতিফলিত হবে।

ভাষার মাধ্যমেই মানুষের সঙ্গে মানুষের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং ভাষাই মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে। একভাষাভাষী মানুষ পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ, সৌহার্দ্য ও মানসিক যোগ অনুভব করে। ফলে একভাষাভাষী মানুষ যতো সহজে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হয়, তেমনটি অন্য কিছুতে হয় না। তাই নেপোলিয়নের পতনের পরে ভিয়েনায় ইউরোপের রাজনীতিবিদ্‌রা যখন ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির পুনর্বিন্যাস করেছিলেন, তখন তাঁরা যদি ভাষার ভিত্তিতে রাষ্ট্রগুলির পুনর্বিন্যাসের কথা ভাবতেন, তবে ইউরোপে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত

হতে পারত। কিন্তু তাঁরা তা না ক'রে বিজয়ীর জন্য পুরস্কার ও বিজিতের জন্য শাস্তি—এই নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্রগুলির পুনর্বিন্যাস করেছিলেন। এর ফলে ইউরোপে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নি। মানুষ ভাষার ভিত্তিতে জাতীয় রাষ্ট্রগঠনের জন্য সংগ্রাম শুরু করেছিল।

ভিয়েনা কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুসারে বিজয়ী রাশিয়া মধ্য-পোল্যাণ্ড, ফিনল্যাণ্ড ও তুরস্কের কাছ থেকে কিছু অঞ্চল পেল। স্যাক্‌সনি নেপোলিয়নকে সাহায্য করায় রাশিয়া স্যাক্‌সনির কিছু অঞ্চল ও রাইন নদীর তীরবর্তী কিছু অঞ্চল পেল। বেলজিয়াম ও দক্ষিণ জার্মানী ছাড়া তার আগেকার প্রায় সব স্থানই ফিরে পেল অস্ট্রিয়া। দক্ষিণ জার্মানী হারিয়ে বেলজিয়ামের যে ক্ষতি হ'ল তা পুষিয়ে দেওয়া হ'ল তাকে ইটালির কিছু অঞ্চল দিয়ে। রোমে পোপকে এবং নেপল্‌স্, স্পেন ও ফ্রান্সের সিংহাসনে বুরবোঁ-বংশীয় রাজাদের বসানো হ'ল। হল্যাণ্ড রাজ্যটিকে বেলজিয়ামের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে নেদারল্যাণ্ড্‌স্ রাজ্য এবং ইটালির সাভয়, পিডমন্ট ও সার্দিনিয়া নিয়ে পিডমন্ট-সার্দিনিয়া নামে রাজ্য গঠিত হ'ল।

জার প্রথম আলেকজাণ্ডার ও প্রিন্স মেটারনিক স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রেরই পক্ষপাতী ছিলেন। নেপোলিয়নের অভ্যুত্থানে পূর্বে যেখানে যে রাজবংশ রাজত্ব করেছিল, তাদের সেখানকার সিংহাসনেই বসানো হয়েছিল। ঐসব রাজারা সকলেই স্বৈরতন্ত্রী বা স্বেচ্ছাচারী ছিলেন। তাঁদের বিরুদ্ধে প্রজারা সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিল। নেপোলিয়নের পর বুরবোঁ-বংশীয় রাজারাই ফ্রান্সের সিংহাসনে বসেছিলেন। তাঁরা সকলেই স্বেচ্ছাচারী ছিলেন। ফলে ফ্রান্সে ১৮৩০ ও ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় বিপ্লব হয়েছিল। এইসব বিপ্লব পুরোপুরি সফল না হ'লেও এর ঢেউ ইউরোপের বহু স্বৈরতন্ত্রী দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং পশ্চিম ইউরোপ ও স্ক্যাণ্ডেনেভিয়ার দেশগুলিতে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মানুষ স্বাধীনতা, জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ হয়েছিল। এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত ইটালি ও জার্মানিতে ঐক্যবদ্ধ জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা।

**ইটালির জাতীয় ঐক্যলাভঃ** ইটালি সব লোকের ভাষা, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, ধর্ম ও সংস্কৃতি এক। কিন্তু তারা কতকগুলি ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। ঐসব রাজ্যের উপর অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্স প্রভুত্ব করত। উত্তর ইটালির বিশাল অংশে প্রভুত্ব করত অস্ট্রিয়া। দক্ষিণ ইটালীতে প্রভুত্ব করত ফরাসীরা। রোম ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ছিল পোপের রাজ্য। উত্তর ইটালির উত্তর-পশ্চিম কোণে সার্দিনিয়া-পিডমন্ট রাজ্য। এখানেই কেবল একটি ইটালীয় রাজবংশ রাজত্ব করছিল।

বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে ইটালির মানুষ ক্রমেই সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। এই উদ্দেশ্যে বহু গুপ্ত সমিতি গড়ে উঠেছিল। এদের মধ্যে **কার্বোনারি** নামে পরিচিত একটি গুপ্ত সমিতি খুবই প্রভাব বিস্তার করেছিল। সকল শ্রেণীর মানুষ এই সমিতির সভ্য ছিল এবং জাতীয়তাবোধ ও গণতান্ত্রিক চিন্তাধারায় তারা উদ্বুদ্ধ ছিল। ১৮২০ ও ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে ইটালীয়রা বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। কিন্তু অস্ট্রিয়া কঠোর হস্তে এই বিদ্রোহ দমন করে।

তাতেও ইটালির ঐক্য ও স্বাধীনতার আন্দোলন থামে না। **মাৎসিনি, গারিবল্ডি ও কাভুরের** মতো শক্তিশালী নেতাদের অভ্যুদয় এই আন্দোলনকে প্রবলতর করে তুলল। মাৎসিনির প্রেরণা, গারিবল্ডির সামরিক প্রতিভা এবং কাভুরের রাজনৈতিক বুদ্ধি, এই তিনের মিশ্রণে ইটালি অবশেষে তাঁর বহুবাঞ্ছিত ঐক্যও স্বাধীনতা লাভ করল।



মাৎসিনি

**মাৎসিনি** ছিলেন জেনোয়ার এক ডাক্তারের পুত্র। তিনি **তরুণ ইটালি** নামে একটি সংঘ স্থাপন করে ইটালির ঐক্য, স্বাধীনতা ও প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচার

চালালেন। তিনি বললেন, রোম হবে ঐক্যবদ্ধ ইটালির রাজধানী। মাৎসিনির রচনা ও বক্তৃতা ইটালির তরুণদের জাতীয়তাবোধে ও বিপ্লবী চিন্তাধারায় উদ্‌বুদ্ধ করে। তরুণরা পিডমণ্টে বিদ্রোহ করে। কিন্তু এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়। এই বিদ্রোহে এক দুঃসাহসী তরুণ নাবিক মাৎসিনিকে বিশেষভাবে সাহায্য করেন। ইনি ইটালীর অন্যতম প্রধান নেতা **গারিবল্ডি**।


গারিবল্ডি

**গারিবল্ডি** এক সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র পনেরো বছর বয়সে ইনি বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে নৌবিদ্যা শিখে নাবিক হন। জাহাজে ক্যাপ্‌টেনের কাজ করবার সময়ে মাৎসিনির সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর আদর্শে ও ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে তাঁর সহকর্মীরূপে কাজ করেন। পিডমণ্টের বিদ্রোহ ব্যর্থ হলে মাৎসিনি নির্বাসিত হয়ে ইংলণ্ডে গিয়ে থাকেন। গারিবল্ডি দক্ষিণ আমেরিকায় পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করেন।

মাৎসিনি ইংলণ্ড থেকে ইটালীয় তরুণদের জাতীয়তাবোধ ও বিপ্লবে উৎসাহিত করতে লাগলেন, আর গারিবল্ডি আমেরিকায় থেকে যুদ্ধবিদ্যা শিখলেন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁরা দুজনেই ইটালিতে ফিরে এলেন।

এই সময় ইটালিতে আর একজন শক্তিশালী নেতার আবির্ভাব হ'ল, তাঁর নাম **কাভুর**। কাভুর ছিলেন সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান। তিনি সার্দিনিয়ার রাজার সৈন্যদলে কাজ করতেন। কিন্তু প্রগতিশীল মতামতের জন্য সার্দিনিয়ার রাজার অধীনে চাকরি করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হ'ল না। তিনি নিজের জমিদারিতে ফিরে গিয়ে বৈজ্ঞানিক

উপায়ে চাষের উন্নতি সাধনে মন দিলেন। এইভাবে তাঁর জীবনের পনের বছর কাটল। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন আবার বিপ্লবের তরঙ্গ সারা পশ্চিম ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ল, তখন তিনি রাজনীতিতে প্রবেশ করলেন। তাঁর চেষ্টাতেই সার্দিনিয়ার রাজা একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান গ্রহণ করলেন। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে কাভুর সার্দিনিয়ার নূতন রাজা **দ্বিতীয় ভিক্টর ইমানুয়েলের** প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হলেন। তাঁর চেষ্টাতেই রাজা ভিক্টর ইমানুয়েল ইটালির ঐক্য, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সংগ্রামে সামিল হলেন।



কাভুর

কাভুর সার্দিনিয়ার সৈন্যবাহিনী বাড়ালেন। এই সময়ে ইউরোপে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ বাধল। কাভুর অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে এবং ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের পক্ষে সার্দিনিয়াকে যুদ্ধে নামালেন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ফ্রান্সের সাহায্যে অস্ট্রিয়াকে পরাজিত করে উত্তর ইটালির লোম্বার্ডি অধিকার করলেন। কিন্তু ফ্রান্স হঠাৎ সাহায্য বন্ধ করল। তখন রাজা ভিক্টর ইমানুয়েল তাঁকে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্য করবার জন্য সমগ্র ইটালির জাতীয়তাবাদী ও ঐক্যকামী জনসাধারণের কাছে আবেদন জানালেন। বিদেশী অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দিল এবং মধ্য-ইটালির রাজ্যগুলি স্বেচ্ছায় সার্দিনিয়ার সঙ্গে যুক্ত হল।

দক্ষিণে গারিবল্ডি তাঁর দুর্ধর্ষ হাজার লাল কোর্তার বাহিনী নিয়ে সিসিলি থেকে অগ্রসর হয়ে নাপল্‌স্ জয় করে মধ্য ইটালির পথে রোমের দিকে অগ্রসর হলেন। মধ্যপথে তাঁর সঙ্গে মিলিত হ'ল সার্দিনিয়ার সৈন্যবাহিনী। সার্দিনিয়ার সৈন্যবাহিনীর হাতে রোম ছাড়া পোপ-শাসিত অঞ্চল মুক্ত হ'ল। অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রাশিয়াকে

সাহায্য করে রাজা ভিক্টর ইমানুয়েল ভেনেসিয়া অধিকার করলেন। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রোম অধিকার করলেন। এইভাবে সমগ্র ইটালি ভিক্টর ইমানুয়েলের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হ'ল এবং স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ ইটালির রাজধানী হ'ল রোম।

**জার্মানীর স্বাধীনতা ও ঐক্যের সংগ্রাম**ঃ জার্মানী নামে পবিত্র রোম সাম্রাজ্যে অর্থাৎ অস্ট্রিয়া ও স্পেনের অধীন হ'লেও কার্যত সেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য ছিল এবং সেগুলির মধ্যে কলহ-বিবাদ লেগেই ছিল। নেপোলিয়ন দক্ষিণ জার্মানী জয় করে দক্ষিণ জার্মানীর রাজ্যগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। জার্মানরা নেপোলিয়নের পদানত হ'লেও নিজেদের একজাতীয়তা, স্বাধীনতা ও ঐক্যের প্রয়োজন উপলব্ধি করেছিল। নেপোলিয়নের পতনের পর ভিয়েনা কংগ্রেসে আবার ঐসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যকে পৃথক ক'রে দেওয়া হ'ল।

জার্মানীর পূর্ব অঞ্চলে অবস্থিত ছিল প্রাশিয়া। প্রাশিয়া ছিল জার্মানীর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ। ইটালীর ঐক্য ও স্বাধীনতার সংগ্রামে সার্দিনিয়া যে ভূমিকা নিয়েছিল, জার্মানীর ঐক্য ও স্বাধীনতার সংগ্রামে প্রাশিয়া সেই ভূমিকা নিল। ভিয়েনা কংগ্রেসে জার্মানীকে উনচল্লিশটি রাজ্যে পরিণত করে একটি রাজ্য-সংঘ করা হয়। ঐ রাজ্য-সংঘের মধ্যে প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়াও থাকে। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে যে বিপ্লবের ঢেউ আসে, তা জার্মানীতেও লাগে। প্রাশিয়ার রাজা চতুর্থ ফ্রেডেরিক উইলিয়ম একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান রচনা করেন। অস্ট্রিয়া স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের বিরোধিতা করতে থাকে। তাই জার্মান জাতি প্রাশিয়ার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য সচেষ্ট হয়।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে চতুর্থ ফ্রেডেরিক উইলিয়মের ভাই **প্রথম উইলিয়ম** রাজা হন। এই সময়ে প্রাশিয়ায় এক ধুরন্ধর রাষ্ট্রনেতার আবির্ভাব হয়। ইনি **বিসমার্ক**। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী হন। প্রাশিয়ার অধীনে জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি শক্তিশালী

জাতিতে পরিণত করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। প্রথমেই তিনি প্রাশিয়াকে সামরিক শক্তিতে অজেয় করে তুললেন। জার্মানীর ঐক্যসাধনের প্রধান বাধা ছিল অস্ট্রিয়া। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে বিসমার্ক অস্ট্রিয়াকে যুদ্ধে পরাজিত ক'রে প্রাশিয়ার অধীনে উত্তর জার্মানীতে একটি রাজ্য সংঘ গড়ে তুললেন। এর ফলে জার্মানীর উপর অস্ট্রিয়ার আর কোন অধিকার রইল না।


বিসমার্ক

জার্মানীর কতকগুলি রাজ্য তখনও ফ্রান্সের অধীনে ছিল। সেগুলিকে মুক্ত করবার জন্য বিসমার্ক চেষ্টা করতে লাগলেন। অবশেষে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স ও প্রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ বাধল। যুদ্ধে ফ্রান্স পরাজিত হ'ল। প্রায় ২'শ বছর ধরে খনিসমৃদ্ধ অঞ্চল আলসাস ও লরেন ফ্রান্সের অধীনে ছিল। এখন এই অঞ্চল জার্মানীর অধীন হ'ল। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে প্রাশিয়ার রাজা **প্রথম উইলিয়ম** সমগ্র জার্মানীর **কাইজার** বা সম্রাট বলে ঘোষিত হলেন। এইভাবে সমগ্র জার্মানী ঐক্যবদ্ধ হ'ল।

**আমেরিকার গৃহযুদ্ধ ঃ** ইটালি ও জার্মানীতে যখন স্বাধীনতা ও ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রগঠনের সংগ্রাম চলছিল, তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল এবং তা দেখা দিয়েছিল মানুষের স্বাধীনতার অধিকারকে কেন্দ্র ক'রে।

ইউরোপীয়রা যখন আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন করেছিল, তখন ইউরোপীয়রা আমেরিকার ক্ষেত-খামারে ও খনিতে কাজ করার জন্য আফ্রিকা থেকে নিগ্রোদের ধরে আনত এবং ক্ষেত-খামার ও খনির মালিকদের কাছে ক্রীতদাসরূপে বিক্রি করত। এইভাবে আধুনিক

যুগেও প্রাচীন গ্রীস ও রোমের মতো আমেরিকায় ক্রীতদাস-প্রথা ব্যাপক হয়ে উঠেছিল। এইসব নিগ্রো ক্রীতদাসদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালানো হ'ত। মালিকরা তাদের কুকুর-বিড়ালের মতো দেখত। তাদের না ছিল বাসস্থানের ব্যবস্থা, না ছিল খাদ্যের ব্যবস্থা। দেশে অবাধে ক্রীতদাস কেনাবেচা চলত। স্ত্রীলোক, শিশু, কেউ এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেত না। স্ত্রীকে স্বামীর কাছ থেকে, শিশুকে মার বুক থেকে, ছিনিয়ে নিয়ে বিক্রি করে দেওয়া হ'ত। ক্ষেত-খামারে ও খনিতে তাদের অমানুষিকভাবে খাটিয়ে মারা হ'ত। সভ্য আমেরিকানরা এ-বিষয়ে ক্রমেই সচেতন হয়ে উঠেছিলেন এবং দাসপ্রথা লোপ করার জন্য আন্দোলন করছিলেন। **হেরিয়েট বীচার স্টো** নামে এক মার্কিন লেখিকা **টমকাকার কুটির** (Uncle Tom's Cabin) নামে একখানি উপন্যাস লেখেন; তাতে তিনি নিগ্রো ক্রীতদাসদের ভয়ংকর অবস্থার চিত্র তুলে ধরেন।

আমেরিকার স্বাধীনতা লাভের পূর্বেই ইংলণ্ড আইন ক'রে দাস-ব্যবসায় তুলে দিয়েছিল। কিন্তু এর পরেও অনেক উপনিবেশে দাসপ্রথা ছিল। দক্ষিণের উপনিবেশগুলিতেই দাসপ্রথার প্রচলন ছিল বেশি। কারণ, উত্তর অঞ্চলের আবহাওয়া শীতপ্রধান হওয়ায় সেখানে ইউরোপীয়রা নিজেরাই কাজ করতে পারত। উত্তর অঞ্চল ছিল শিল্প-প্রধান। কল-কারখানায় স্বাধীন শ্রমিকরাই ভালো কাজ করতে পারত, ক্রীতদাসরা এ কাজের উপযুক্ত ছিল না। তাই উত্তর অঞ্চলের উপনিবেশগুলিতে দাসপ্রথা ছিল না এবং উত্তর অঞ্চলের লোকেরা দাসপ্রথার বিরোধী হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু দক্ষিণ অঞ্চল ছিল অপেক্ষাকৃত গ্রীষ্মপ্রধান এবং কৃষি-প্রধান। তুলো ও তামাকের চাষ ছিল ব্যাপক। তখনও কৃষি-কার্যের উন্নতির জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ না হওয়ায় কৃষি-উৎপাদন বাড়াবার জন্য কৃষিক্ষেত্র বাড়াবার প্রয়োজন ছিল। দেশে অনাবাদী জমির অভাব ছিল না। ঐসব জমিকে ক্রমেই কৃষির উপযোগী করে দেশের ক্ষেত-খামার বাড়ানো চলছিল। এজন্য কৃষি-

কার্যে ক্রীতদাসের উপযোগিতা তখনও যথেষ্ট ছিল। তাই দক্ষিণ অঞ্চলের লোকেরা ক্রীতদাস প্রথার সমর্থক ছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে সংবিধান রচিত হয়েছিল, তাতে যেমন মানুষের সমান অধিকারের কথা বলা হয়েছিল, তেমনি রাষ্ট্রগুলিকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বেরিয়ে যাওয়ার অধিকারও দেওয়া হয়েছিল। রাষ্ট্রগুলির সার্বভৌমত্ব ও কেন্দ্রের সার্বভৌমত্ব নিয়ে প্রায় গোড়া থেকেই মতদ্বৈধ ছিল। ক্রীতদাস-প্রথা উচ্ছেদের প্রশ্নের সঙ্গে দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে রাষ্ট্রসমূহের অধিকারের প্রশ্নও জোরদার হয়ে উঠল।

তেরোটি উপনিবেশ নিয়ে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হ'লেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্রমেই পশ্চিমে সম্প্রসারিত হচ্ছিল এবং রাষ্ট্রের সংখ্যা বেড়েছিল। কতকগুলি রাষ্ট্রে নূতন ক'রে দাসপ্রথা প্রচলনের চেষ্টা চলতে থাকে। এতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দাসপ্রথা প্রচলিত আছে এমন রাষ্ট্রের সংখ্যা বেশি হওয়ার সম্ভবনা দেখা দেয়। তাই উত্তরের রাষ্ট্রগুলিতে দাসপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন প্রবলতর হয়ে ওঠে।

এই আন্দোলনে ন্যায়নীতি ও মানবিকতার দিকটিকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছিল, সকল মানুষই সমান। এই বাণী ও আদর্শ ই পুনরায় কবি হুইটিয়ার, দার্শনিক ইমার্সন প্রভৃতি জাতির শ্রেষ্ঠ মনীষীরাও প্রচার করতে লাগলেন। এই আন্দলনের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা ছিলেন **আব্রাহাম লিংকন**।

কেন্টাকির এক দরিদ্র পরিবারে আব্রাহাম লিংকনের জন্ম হয়। বাল্যকাল তাঁর খুবই দারিদ্র্যের মধ্যে কাটে। প্রথম জীবনে তাঁকে জাহাজে কুলির কাজ পর্যন্ত করতে হয়। পরে তিনি লেখাপড়া শিখে উকিল হন। তিনি অত্যন্ত সং ও বলিষ্ঠ চরিত্রের মানুষ ছিলেন। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের সার্বভৌম ক্ষমতার পক্ষে এবং ক্রীতদাস-প্রথার বিরুদ্ধে বক্তৃতা ক'রে খ্যাতিলাভ করেন। তিনি ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের নির্বাচনেরিপাবলিকান দলের পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট-পদের জন্য প্রার্থী হয়ে জয়লাভ করেন। তাঁর জয় ক্রীতদাস-প্রথার বিরোধীদের জয়ই

সূচিত করে। দক্ষিণ অঞ্চলের রাজ্যগুলি ভাবল যে, আব্রাহাম লিংকন এখন আইন ক'রে ক্রীতদাসপ্রথা তুলে দিয়ে ক্রীতদাসদের মুক্তি দেবেন। তাই তারা যুক্তরাষ্ট্র থেকে বেরিয়ে গিয়ে একটি সংযুক্ত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করল। এতে যুক্তরাষ্ট্রের ঐক্য বিপন্ন হ'ল। ঐক্যরক্ষার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হ'লে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের মধ্যে যুদ্ধ বাধল। এই যুদ্ধই **আমেরিকার গৃহযুদ্ধ** নামে পরিচিত।

গোড়ার দিকে কতকগুলি যুদ্ধে দক্ষিণ অঞ্চলেরই জয় হ'ল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেনাপতি গ্র্যান্ট ও শার্ম্যানের রণকৌশলে উত্তর অঞ্চল বিজয়ী হ'ল। এই গৃহযুদ্ধ পাঁচ বছর ধরে চলেছিল। যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগেই ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে লিংকন সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে দাসপ্রথার উচ্ছেদ ঘোষণা করলেন। যুদ্ধের শেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আবার ঐক্যবদ্ধ হ'ল।

যুদ্ধ শেষ হওয়ার দশদিন পরে থিয়েটার দেখবার সময়ে **বুথ** নামে এক গুপ্তঘাতকের গুলীতে লিংকন আহত হয়ে পরদিন মারা যান। এইভাবে আমেরিকা তার এক মহান সন্তানকে হারায়। যুক্তরাষ্ট্রের ঐক্যরক্ষা ও দাসপ্রথার বিলোপের জন্য লিংকন অমর হয়েছেন।

**ইউরোপের শিল্পোন্নয়ন ঃ** অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে যে শিল্প-বিপ্লব হয়েছিল, তা উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের অন্যান্য দেশে, বিশেষতঃ পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতে বেলজিয়াম, ফ্রান্স ও জার্মানিতেও ছড়িয়ে পড়ল। নানা আবিষ্কারের ফলে যন্ত্রশিল্পেরও উন্নতি ঘটল। বড় বড় কলকারখানা গড়ে উঠল দেশে দেশে। বাষ্পশক্তির পরে বৈদ্যুতিক শক্তিরও আবিষ্কার হ'ল।

দেশে দেশে কল-কারখানা যতোই বাড়ল, ততই কল-কারখানায় শ্রমিকের সংখ্যাও বাড়ল। কল-কারখানায়, খনিতে ও যানবাহনের কাজে সর্বত্রই কাজের জন্য দলে দলে লোক এল এবং কাজ পাওয়ার জন্য তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হ'ল। শ্রমিকদের প্রতিযোগিতার এই সুযোগে মালিকরা শ্রমিকদের তাদের ন্যায্য পারিশ্রমিকের পরিবর্তে কম পারিশ্রমিকে নিয়োগ করতে লাগল। এতে শ্রমিকদের

পারিশ্রমিক যেমন কমল, তেমনি শ্রমিকের অভাব না থাকায় প্রায়ই শ্রমিকদের কর্মচ্যুতির সম্ভাবনা দেখা দিল। তারা ক্রমেই অধিকতর পরিমাণে শোষিত ও বঞ্চিত হ'তে লাগল। এই ভয়ংকর অবস্থার প্রতিকারের জন্য শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধ হ'তে চেষ্টা করল। খনি, কল-কারখানা প্রভৃতিতে একসঙ্গে বহু শ্রমিক কাজ করায় তাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সুযোগ-সুবিধাও ছিল যথেষ্ট। ফলে বেতন বৃদ্ধি, দৈনিক কাজের সময় কমানো ও ছুটি, চাকরির স্থায়িত্ব, শ্রমিকদের জীবনের ও স্বাস্থ্যের নিরাপত্তা প্রভৃতির দাবীতে শ্রমিকরা সংঘবদ্ধ হয়ে উঠল। এইসব সংঘ **ট্রেড ইউনিয়ন** নামে পরিচিত। এইসব শ্রমিক সংঘ ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠল এবং রাজনীতিতেও তারা প্রাধান্য বিস্তারে সচেষ্ট হ'ল। ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লব প্রথমে হওয়ায় শ্রমিক আন্দোলনও সর্বপ্রথম ইংলণ্ডে দেখা দেয়। শ্রমিকদের আন্দোলনের অধিকার আদায় করতেও অনেক সংগ্রাম করতে হয়। ১৮৪৮ ও ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবে তারা নিজেদের রাজনৈতিক মতবাদ সুস্পষ্টরূপে ঘোষণা করল। ক্রমেই শ্রমিকশ্রেণী রাজনীতিতে প্রাধান্য বিস্তার করতে লাগল।

শ্রমিকরা তাদের দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য যতই সংঘবদ্ধ হ'ল, মালিকরাও ততই তাদের দমনের জন্য সচেষ্ট হ'ল। এইভাবে শ্রমিক-শ্রেণী ও মালিকশ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম ক্রমেই তীব্র হয়ে উঠল। এই দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামের ফলে নানা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মতবাদ দেখা দিল। এইসব মতবাদ **সোস্যালিজ্‌ম্‌, কমিউনিজ্‌ম্‌** প্রভৃতি নামে পরিচিত। সোস্যালিজ্‌ম্ বলতে দেশের সমস্ত ধনসম্পদ সমাজের সকল মানুষের কল্যাণে ব্যয়িত হবে, এই আদর্শকে বোঝায়। কমিউনিজ্‌ম্ বলতে সমাজের সকলেই সমান সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার ভোগ করবে, এই আদর্শকে বোঝায়। বাংলায় সোস্যালিজ্‌ম্‌কে **সমাজবাদ** বা **সমাজতন্ত্রবাদ** এবং কমিউনিজ্‌ম্‌কে **সাম্যবাদ** বলা হয়। এইসব মতবাদের মধ্যে যেটি আধুনিক কালের ইতিহাসকে প্রভাবিত করেছে সবচেয়ে বেশি, তা হ'ল **মার্কস্‌বাদ**।

মার্কস্‌বাদের প্রবর্তক হলেন জার্মানির দুই মনীষী ও বিপ্লবী—**কার্ল্ মার্ক্‌স্ ও ফ্রেডেরিক এঙ্গেল্‌স্।**

কার্ল্ মার্ক্‌স্ প্রাশিয়ার এক ইহুদী পরিবারে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালেই তাঁকে প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করা হয়। বাল্যকাল থেকে তিনি অত্যন্ত মেধাবী ও তীক্ষ্ণধী ছিলেন। তিনি আইন, ইতিহাস, অর্থনীতি ও দর্শনশাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন এবং মাত্র ২৩ বৎসর বয়সে দর্শনশাস্ত্রে 'ডক্টর' উপাধি পান। তিনি প্রথমে অধ্যাপনায় নিযুক্ত হবেন স্থির করেন। কিন্তু ঐ সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রগতিশীল ব্যক্তিদের উপর আক্রমণ চলায় তিনি অধ্যাপনা করার চিন্তা ত্যাগ করেন। সমাজের দরিদ্র শ্রমিকশ্রেণীর শোচনীয় জীবনযাত্রা তাঁকে আকৃষ্ট করে এবং তাঁকে বিপ্লবী চিন্তায় উদ্‌বুদ্ধ করে। তিনি তাঁর বিপ্লবী চিন্তা ও কার্যকলাপের জন্য জার্মানী থেকে বিতাড়িত হন। জার্মানী থেকে তিনি ফ্রান্সে ও বেলজিয়ামে কিছুদিন থাকেন এবং তাঁর বিপ্লবী চিন্তা ও ক্রিয়াকলাপের জন্য ঐসব দেশ থেকেও বিতাড়িত হন। শেষে তিনি ইংলণ্ডে গিয়ে বাস করেন এবং তাঁর বিপ্লবী চিন্তাধারাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাঁর বিখ্যাত বই ক্যাপিট্যাল রচনা করেন। তিনি অন্যান্য বহু প্রবন্ধ-নিবন্ধ এবং পুস্তকও রচনা করেন। ক্যাপিট্যাল কয়েক খণ্ডে রচনার পরিকল্পনা ছিল এবং ঐগুলির খসড়া পাণ্ডুলিপিও তিনি প্রস্তুত করেছিলেন। কিন্তু ক্যাপিট্যাল-এর প্রথম খণ্ডই তিনি সম্পূর্ণরূপে লিখে প্রকাশ করতে পারেন এবং পরবর্তী দুই খণ্ডের রচনা শেষ করেন তাঁর বিপ্লবী বন্ধু ফ্রেডেরিক এঙ্গেল্‌স্। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে তাঁর মৃত্যু হয়।

কার্ল্ মার্ক্‌সের মতবাদ **মার্ক্‌স্‌বাদ** নামে পরিচিত। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন প্যারিসে আবার বিপ্লব দেখা দেয়, তখন শ্রমিকশ্রেণীও ঐ বিপ্লবে অংশ নেয়। মার্ক্‌স্ ও তাঁর বন্ধু ফ্রেডেরিক এঙ্গেল্‌স্‌ও ঐ বিপ্লবে অংশ নিয়েছিলেন। তাঁরা ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে **কমিউনিষ্ট**

**মেনিফেস্টো বা সাম্যবাদীর ইস্তাহার** নামে একটি প্রচার-পুস্তিকায় মার্ক্‌স্‌বাদের মূলকথা প্রকাশ করেন।

ফ্রেডেরিক এঙ্গেল্‌স্‌ও ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রাশিয়ার এক কারখানার মালিকের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। মার্ক্‌সের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ তাঁর হয়নি। তবে তিনি নিজের চেষ্টায় ইতিহাস, সমাজতন্ত্র, অর্থনীতি ও দর্শনশাস্ত্র গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। তিনি প্রথম জীবনে কারখানার কর্মচারীরূপে কাজ করেন। ইংলণ্ডের একটি ব্যবসায়ী সংস্থায় তাঁর বাবার অংশ ছিল। তাই তিনি ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে ঐ ব্যবসায়ী-সংস্থায় কাজ নিয়ে ইংলণ্ডে চ'লে আসেন। তিনি ইংলণ্ডের অন্যতম প্রধান শিল্পকেন্দ্র ম্যাঞ্চেস্টারে থাকতেন। এখানে থাকার ফলে শ্রমিকদের জীবনযাত্রা ঘনিষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করেন এবং শ্রমিক আন্দোলনে অংশ নেন। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্যারিসে যান। এ সময় মার্ক্‌স্‌ প্যারিসে ছিলেন। সেখানে দুজনের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গি এক হওয়ায় তাঁরা পরবর্তীকালে কি বিপ্লবী কাজকর্মে, কি গ্রন্থরচনায়, একযোগে কাজ করেন। মার্ক্‌সের মৃত্যুর পর ক্যাপিট্যালের দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড তিনিই সম্পূর্ণরূপে রচনা ও প্রকাশ করেন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। কার্ল্‌ মার্ক্‌স্‌ ও ফ্রেডেরিক এঙ্গেল্‌স্‌ যে মতবাদ প্রচার করেন, তাকে **বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ** বলা হয়। কারণ, তাঁদের আগেও অনেকে সমাজতন্ত্রের কথা বলেছিলেন। কিন্তু তাঁরা বলেছিলেন, মানবকল্যাণের জন্য মানবতাবাদীদের চেষ্টাতেই এইরূপ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কিন্তু মার্ক্‌স্‌ ও এঙ্গেল্‌স্‌ বললেন, ইতিহাসের বিধানেই পৃথিবীতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করবে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে শোষিত ও নির্যাতিত জনগণ।

তাঁরা বললেন, আদিমকালে মানুষের সমাজে সাম্যবাদী ব্যবস্থাই ছিল, তখন উৎপাদন-ব্যবস্থা খুব অনুন্নত থাকায় যা সংগৃহীত বা উৎপন্ন হ'ত, তা সমাজের সকলে ভাগ ক'রে নিত। উৎপাদন-

ব্যবস্থার উন্নতি হওয়ায় উদ্‌বৃত্ত দেখা দিল। উদ্‌বৃত্ত কিছুসংখ্যক লোক অধিকার করে শক্তিশালী হয়ে উঠল। সমাজে শোষক ও শোষিত দুইটি শ্রেণীর সৃষ্টি হ'ল। শোষকরা নিজেদের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য শাসনতন্ত্র ও সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলল। শাসক ও শাসিত এবং শোষক ও শোষিতের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলল। এই দ্বন্দ্বের ফলেই ইতিহাসের বিভিন্ন কালে দেখা দিল বিভিন্ন ধরনের সমাজ-ব্যবস্থা—আদিম সাম্যবাদী সমাজ থেকে ক্রীতদাসদের সমাজ, ক্রীতদাসদের সমাজ থেকে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ, সামন্তত ন্ত্রিক সমাজ থেকে ধনতান্ত্রিক সমাজ। ধনতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদন-ব্যবস্থা এমন এক স্তরে এসেছে, যেখানে উদ্‌বৃত্ত পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে। তা সকলের মধ্যে সমভাবে বন্টন না করলে উৎপন্ন বস্তুর সদ্‌ব্যবহার ও উৎপাদন-ব্যবস্থা রক্ষা করা অসম্ভব। এই উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমিকশ্রেণী ক্রমেই অধিকতর শক্তিশালী হচ্ছে, তারাই বিপ্লবের দ্বারা সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তন করবে। তাই মার্ক্‌স্‌ ও এঙ্গেল্‌স্‌ পৃথিবীর সকল শ্রমিককে ঐক্যবদ্ধ হ'তে আহ্বান জানালেন—"দুনিয়ার মজদুর এক হও।"

## প্রশ্নাবলী

১। মেটারনিক কে ছিলেন? ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী ইউরোপের রাজনীতিতে তাঁর ভূমিকা কিরূপ ছিল?

২। ভিয়েনা কংগ্রেস বলতে কি বোঝ? ইউরোপীয় রাজনীতিতে ঐ সম্মেলন কি নীতি অনুসরণ করেছিল?

৩। ইটালির ঐক্য ও স্বাধীনতার সংগ্রাম সম্পর্কে যা জান লিখ।

৪। জার্মানীর ঐক্যসাধন সম্পর্কে যা জান লিখ।

৫। আমেরিকার গৃহযুদ্ধ কেন হয়েছিল? এই গৃহযুদ্ধের বিবরণ দাও।

৬। আব্রাহাম লিংকন কে ছিলেন? তাঁর সম্পর্কে যা জান লিখ।

৭। ইউরোপীয় শিল্পোন্নয়নের ফল কি হয়েছিল? শ্রমিক আন্দোলনের সূচনা সম্পর্কে যা জান লিখ।

৮। মার্ক্‌স্‌ ও এঙ্গেল্‌স্‌ সম্পর্কে কি জান? তাঁদের মতবাদ কি নামে পরিচিত? ঐ মতবাদের মূলকথা কি?

৯। টীকা লিখ : (ক) ভিয়েনা কংগ্রেস ; (খ) টমকাকার কুটির ; (গ) মার্ক্সবাদ ; (ঘ) প্রিন্স মেটারনিক ; (ঙ) আব্রাহাম লিংকন ; (চ) ম্যাৎসিনি ; (ছ) গ্যারিবল্ডি ; (জ) কাভুর ; (ঝ) বিসমার্ক।

১০। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

(ক) কত খ্রীষ্টাব্দে ভিয়েনা কংগ্রেস হয়েছিল ?

(খ) ভিয়েনা কংগ্রেসে প্রধান ভূমিকা কে নিয়েছিলেন ?

(গ) ঐক্যবদ্ধ ইটালির রাজা হয়েছিলেন কে ?

(ঘ) ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর প্রথম সম্রাট ও তাঁর প্রধানমন্ত্রীর নাম কি ?

(ঙ) আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় কে প্রেসিডেণ্ট ছিলেন ?

(চ) 'টমকাকার কুটির' উপন্যাস কে লিখেছিলেন ?

(ছ) মার্কসবাদ কারা প্রবর্তন করেছিলেন ?

(জ) কার্ল মার্ক্সের লেখা প্রধান গ্রন্থের নাম কি ?

---

## দশম অধ্যায়

[ক]

## ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চীনের ঘটনা-প্রবাহ

**অহিফেন-যুদ্ধ, নানকিংয়ের সন্ধি ও টিয়েনসিনের সন্ধি :** তোমরা সপ্তম শ্রেণীতে চীনা সম্রাট কুবলাই খানের কথা পড়েছ। ঐ মঙ্গোল-রাজবংশ ইউয়ান রাজবংশ নামে পরিচিত ছিল। ইউয়ান রাজবংশের পর চীনে মিং রাজবংশ রাজত্ব করে। মিং-রা চীনা ছিলেন। মিং রাজবংশের পতনের পর মাঞ্চুরা অধিকার বিস্তার করে। মাঞ্চু রাজবংশের লোকেরা বিদেশী ছিলেন। তাই স্বভাবতঃই চীনারা তাঁদের ভালো চোখে দেখত না।

চীন অর্থনৈতিক দিক থেকে খুবই উন্নত ছিল। তার ঐশ্বর্যের কথা মার্কোপোলোর বিবরণ থেকে ইউরোপের লোকেরা জেনেছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে নূতন জলপথ আবিষ্কৃত হ'লে ইউরোপীয় বণিকরা

চীনের সঙ্গে বাণিজ্য করতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু চীনে সকল দ্রব্য যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং বিদেশী পণ্যে তার প্রয়োজন নেই, এই কারণ দেখিয়ে মাঞ্চু-সম্রাটরা ইউরোপীয় বণিকদের সঙ্গে ব্যবসা করতে চান না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইংরেজ বণিকরা চীনের সঙ্গে ব্যবসা শুরু করে।

তারা চীনে প্রচুর পরিমাণে আফিম আমদানি করে এবং চীনারা আফিমে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। আফিম কিনতে চীনের মণ মণ রূপা বিদেশে চলে যেতে থাকে। তাই মাঞ্চু-সম্রাট চীনে আফিম বিক্রি নিষিদ্ধ করলেন। ইংরেজরা কিন্তু এই লাভজনক ব্যবসা বন্ধ করতে রাজী হ'ল না। ফলে ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে চীনের সঙ্গে ইংলণ্ডের যুদ্ধ বাধল। এই যুদ্ধ **অহিফেন যুদ্ধ** নামে খ্যাত। এই যুদ্ধ তিন বছর ধরে চলে। যুদ্ধে চীনারা পরাজিত হয় এবং ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে নানকিংয়ে ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হয়। এই সন্ধির ফলে চীন ক্যান্টন, ফুচাও, নিংপো, আময় ও সাংহাই—এই পাঁচটি বন্দর ইউরোপীয়দের অবাধ বাণিজ্যের জন্য মুক্ত ক'রে দেয়। আফিমের ব্যবসা আবার চলতে থাকে। ইংরেজরা যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ চীনের কাছ থেকে বহু টাকা ও হংকং দ্বীপ আদায় করে।

ইংরেজদের দেখাদেখি অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও এসে পৌঁছল। কিছুদিন পরে চীনারা একটা বৃটিশ জাহাজকে চোরাই কারবার করার অপরাধে বাজেয়াপ্ত করল। ঐ সময়ে এক ফরাসী মিশনারি চীনে রাজদ্রোহ প্রচারের অভিযোগে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। এই দুই ব্যাপারে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স মিলিত হয়ে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। আগে একা ইংলণ্ডের কাছেই চীন পরাজিত হয়েছিল, এখন ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অসম্ভব বুঝে চীনা সম্রাট টিয়েন্‌সিনে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সঙ্গে সন্ধি করলেন। এই সন্ধি অনুসারে আরো এগারোটি বন্দরে ইউরোপীয়দের অবাধ বাণিজ্যের অধিকার দেওয়া হ'ল। ইউরোপীয়রা চীনে ইচ্ছামত যাতায়াতের ও বসতি স্থাপনের অধিকার পেল।

চীনকে আরও একটি অপমানজনক শর্তে রাজী হ'তে হ'ল—কোন ইউরোপীয় চীনে অপরাধ করলে চীনা আইনে তার বিচার করা চলবে না, ইউরোপীয়রাই তার বিচার করবে। এই ব্যবস্থায় ইউরোপীয়রা অপরাধ করার অবাধ সুযোগ পেল।

ইংলণ্ড ও ফ্রান্স যখন চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল, তখন চীনে মাঞ্চু-সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ চলছিল। এই বিদ্রোহ **তাইপিং বিদ্রোহ** নামে পরিচিত। চীনের সিংহাসনে প্রাচীন তাইপিং চীনা রাজবংশের এক ব্যক্তির দাবীকে কেন্দ্র ক'রে এই বিদ্রোহ হয়েছিল। যদি বিদ্রোহীরা সফল হয় এবং মাঞ্চু-সম্রাট সিংহাসনচ্যুত হ'ন তবে নূতন তাইপিং-বংশীয় সম্রাট ইউরোপীয়দের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করবেন, সে সম্পর্কে সন্দেহ ছিল। তাই ইংরেজরা তাইপিং বিদ্রোহ দমনে মাঞ্চু-সম্রাটকে সাহায্য করে। ইউরোপীয়দের সাহায্যে তাইপিং বিদ্রোহ দমন করার ফলে ইউরোপীয়রা চীনের রাজনীতিতেও অংশ নেয় এবং চীনে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি আরও বৃদ্ধি পায়।

ইতিমধ্যে চীনের প্রতিবেশী জাপান ইউরোপীয় শিক্ষা-দীক্ষা ও সভ্যতা-সংস্কৃতি গ্রহণ ক'রে ইউরোপীয় দেশগুলির মতোই শক্তিশালী হয়ে উঠছিল। সে-ও ইউরোপীয় দেশগুলির মতোই চীনের উপর প্রাধান্য বিস্তারে সচেষ্ট হ'ল। অবশেষে কোরিয়ায় আধিপত্য নিয়ে চীন ও জাপানের মধ্যে যুদ্ধ বাধল। চীন জাপানের কাছে পরাজিত হ'ল। সন্ধির শর্ত অনুসারে জাপান ফরমোসা দ্বীপ, পেঙ্গু দ্বীপপুঞ্জ, প্রচুর ক্ষতিপূরণ ও বহু সুযোগ-সুবিধা লাভ করল। চীনের দুর্বলতা জগৎ সমক্ষে প্রকট হয়ে পড়ল। এখন ইউরোপীয় শক্তিগুলি চীনের বিভিন্ন অংশে অধিকার বিস্তারে সচেষ্ট হ'ল এবং আরও অনেক সুযোগ-সুবিধা আদায় করল। রাশিয়া পোর্ট আর্থার এবং জার্মানি শানটুং প্রদেশের কিয়াউচাউ বন্দর অধিকার করল। শানটুং প্রদেশে জার্মানি আরও অনেক সুযোগ-সুবিধা আদায় করল। রাশিয়া মাঞ্চুরিয়ার মধ্য দিয়ে পোর্ট আর্থার পর্যন্ত রেলপথ বসাবার সুযোগ পেল। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের হাতেও কয়েকটি বন্দর ও কিছু স্থান গেল।

চীনের অনেক অঞ্চল ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, রাশিয়া ও জাপানের প্রভাবিত এলাকা বলে গণ্য হ'ল। ইউরোপীয়রাও জাপানে এবং চীনে আধিপত্য বিস্তারে প্রতিযোগিতা করতে লাগল। এই সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রী জন হে চীনকে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উন্মুক্ত দ্বারের নীতি গ্রহণে বাধ্য করলেন।

কিন্তু বিদেশীদের আধিপত্য চীনাদের কাছে দুঃসহ হয়ে উঠেছিল। চীনারা তাদের এই দুরবস্থার জন্য প্রধানতঃ বিদেশীদেরই দায়ী করছিল। বিদেশীদের বিরুদ্ধে চীনে বহু গুপ্ত সমিতি গ'ড়ে উঠল। এগুলির মধ্যে মুষ্টিযোদ্ধা সমিতি প্রধান। মুষ্টিযোদ্ধা সমিতির শাখা সারা চীনে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই সময়ে রাজমাতা সম্রাজ্ঞী **ইয়েহোনালা** চীনাদের কাছে অতিশয় শ্রদ্ধার পাত্রী ছিলেন। লোকে তাঁকে বুড়ী বুদ্ধ বা ৎস্থ হ্শি বলত। ৎস্থ শি শব্দের অর্থ মাতৃরূপা ও পূতচরিত্রা। মাঞ্চু-রাজবংশের বিরুদ্ধে যাতে বিদ্রোহ না ঘটে, সেজন্য তিনি মুষ্টিযোদ্ধা সমিতিকে বিদেশীদের বিরুদ্ধে উৎসাহিত করেছিলেন।



ৎস্থ হ্শি

মুষ্টিযোদ্ধা বিদেশীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল। অনেক খ্রীষ্টান মিশনারি এবং চীনা খ্রীষ্টানকে হত্যা করল। ইউরোপীয়রা প্রাণভয়ে দূতাবাসে গিয়ে আশ্রয় নিল। এই অবস্থায় ইউরোপীয়রা চীনে দ্রুত সৈন্যবাহিনী নামাল এবং কঠোরহস্তে বিদ্রোহ দমন করল (১৯০০ খ্রীঃ)। এই বিদ্রোহ দমন করে ইউরোপীয়রা চীনের উপর ভয়ানক অত্যাচার শুরু করল। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে তারা অবাধ লুণ্ঠন ও ধ্বংসকার্য চালাল। তারা চীনকে গ্রাস করবার জন্য উদ্যত হ'ল। এই সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

ঘোষণা করল যে, সে চীনের অখণ্ডতা রক্ষা করবে। ইংলণ্ড এবং জার্মানী-ও অনুরূপ নীতি ঘোষণা করল। তবে চীনে কিছু ইউরোপীয় সৈন্য থাকার শর্ত চীন মেনে নিল। এইভাবে ইউরোপীয় শক্তিগুলির পরস্পর দ্বন্দ ও রেষারেষিই চীনকে রক্ষা করল।

**রাজমাতা ৎস্থ হ্‌শি-র প্রতিক্রিয়া—অভ্যন্তরীণ সংস্কারের নব প্রচেষ্টাঃ** চীন নিজের দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিল এবং ইউরোপীয় শিক্ষা-দীক্ষা, কলাকৌশল গ্রহণ ক'রে জাপান কিভাবে অল্পকালের মধ্যে ইউরোপীয় দেশগুলির সমকক্ষ হয়ে উঠেছিল, তাও লক্ষ্য করেছিল। এ বিষয়ে রাজমাতা সাম্রাজ্ঞী ৎস্থ হ্‌শি-ও সচেতন ছিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে চীনারা পাছে মাঞ্চু-শাসনের বিরোধী হয়ে ওঠে, সেই ভয়ে তিনি ইউরোপীয় শিক্ষা-দীক্ষা ও সভ্যতা-সংস্কৃতি থেকে দেশকে দূরে রাখতে চেয়েছিলেন। মুষ্টিযোদ্ধা বিদ্রোহের ব্যর্থতার পরে তিনি তাঁর মনোভাব পরিবর্তন করলেন এবং জাপানের মতোই পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষা ও সভ্যতা-সংস্কৃতি গ্রহণ ক'রে চীনকে ইউরোপীয় শক্তিগুলির ও জাপানের সমকক্ষ ক'রে তুলতে চাইলেন। তিনি দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন করলেন, বহু মন্দিরকে বিদ্যালয়ে পরিণত করলেন, প্রাচীন পরীক্ষা-ব্যবস্থা তুলে দিলেন। শাসন-ব্যবস্থারও কিছু পরিবর্তন করলেন। অদূর ভবিষ্যতে দেশে সংসদীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের আশ্বাস দিলেন। কিন্তু ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাজ্ঞী ৎস্থ হ্‌শি-র মৃত্যু হ'ল। এইভাবে চীনা রাজতন্ত্র তার শক্তিশালিনী রক্ষয়িত্রীকে হারাল।

চীনারা বিদেশীদের প্রতি তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করলেও তাদের এই দুর্দশা ও অধঃপতনের জন্য রাজতন্ত্র ও মাঞ্চু-শাসন যে প্রধানতঃ দায়ী সে বিষয়ে তারা সচেতন হয়ে উঠেছিল। তাই তারা মাঞ্চু-শাসনের উচ্ছেদ ক'রে দেশে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংকল্প করেছিল।

এই আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন ডাঃ **সান ইয়াৎ-সেন**। ক্যান্টনের অদূরে এক কৃষক পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। অভাবের তাড়নায় তাঁর দাদা হনলুলুতে চলে যান। কিছুদিন বাদে সান

ইয়াৎ-সেনও সেখানে যান। সেখানে তিনি একটি খ্রীষ্টান বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখে হাওয়াইয়ের মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন এবং পরে হংকং থেকে ডাক্তারি পাস করেন। তিনি ছাত্রাবস্থাতেই রাজনীতিতে যোগ দিয়েছিলেন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ক্যান্টনে একটি বিদ্রোহে যোগ দেওয়ায় তাঁকে দেশ ত্যাগ করতে হয়। তিনি জাপান, ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঘুরে বেড়ান এবং দেশের বাইরে থেকে চীনে রাজনৈতিক প্রচার ও সংগঠন গড়ার কাজ চালাতে থাকেন। তিনি তুং মেং হুই বা চীনা বিপ্লবী সংঘ নামে একটি রাজনৈতিক দলকে সুসংগঠিত ও শক্তিশালী করে তোলেন। ঐ দলের নেতৃত্বে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ চীনে প্রচণ্ড বিদ্রোহ দেখা দেয়। বিদ্রোহীরা দক্ষিণ চীনে মাঞ্চু-শাসনের অবসান ঘটিয়ে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। সান ইয়াৎ-সেন দেশে ফিরে এসে প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট হন।


সান ইয়াৎ-সেন

কিন্তু তখনও উত্তর চীনে মাঞ্চু-শাসন চলতে থাকে। উত্তর চীনে মাঞ্চু-বংশীয় এক শিশুকে সিংহাসনে বসান হয় এবং তাঁর প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান সেনাপতি **ইউয়ান শি-কাই** উত্তর চীন শাসন করতে থাকেন। ফলে উত্তর ও দক্ষিণ চীনের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় এবং চীন দেশ দুই খণ্ডে বিভক্ত হওয়ার সম্ভাবনা ঘটে। এই অবস্থায় সান ইয়াৎ-সেনের পরামর্শে ইউয়ান শি-কাই মাঞ্চু-বংশীয় শিশু-সম্রাটকে সিংহাসনচ্যুত করেন। উত্তর চীনেও প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। সমগ্র চীনা প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট হন ইউয়ান শি-কাই ( ১৯১২ খ্রীঃ )।

### বৃহৎ শক্তিরূপে জাপানের অভ্যুদয়

**সম্রাটের শক্তিরূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠা—মেইজি যুগঃ** পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য দেশের মতোই জাপানে একটি সামন্ততান্ত্রিক সমাজ গ'ড়ে উঠেছিল। জাপানে রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল। জাপানের রাজা বা সম্রাটকে বলা হয় **মিকাডো**। মিকাডো সম্রাট হলেও তাঁর কোন শাসনক্ষমতা ছিল না। প্রধান সেনাপতিরা বংশানুক্রমে দেশ শাসন করতেন। তাঁদের বলা হ'ত **শোগান**। দেশে বড় বড় জমিদার ছিলেন। তাঁদের বলা হ'ত **দাইমিও**। তাঁরাই ছিলেন দেশের জমির মালিক। তাঁদের অধীনে **সামুরাই** নামে একটি শক্তিশালী সামরিক সম্প্রদায় ছিল। দেশে এদের ছিল দোর্দণ্ডপ্রতাপ।

ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে জাপান সর্বপ্রথম ইউরোপীয় জাতিগুলির সংস্পর্শে আসে। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ইউরোপীয়দের সম্পর্কে জাপান সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে। খ্রীষ্টান ধর্ম-প্রচারকদের কাছ থেকে জাপান জানতে পারে যে, অন্যান্য দেশে কিভাবে ইউরোপীয়রা সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে। জাপান এখন ইউরোপীয়দের জাপানে প্রবেশ নিষিদ্ধ করল। জাপানীদের জাপানের বাইরে যাওয়া বন্ধ হ'ল। বড় নৌকা বা জাহাজ তৈরিও নিষিদ্ধ হ'ল। এইভাবে জাপান বহির্জগত থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখল।

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকজন নাবিক জাহাজডুবি হয়ে জাপানে উঠলে জাপানীরা তাদের বন্দী করল। একটি মার্কিন জাহাজ এসে তাদের দাবি করলে জাপানীরা তাদের তাড়িয়ে দিল। এর পর ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কমোডোর ( ক্যাপটেন ) পেরি চারখানা রণতরী নিয়ে এলেন এবং জাপানের মিকাডো ও শোগানের কাছে দুটি পত্র ও কিছু আধুনিক যন্ত্র উপহার পাঠালেন। তিনি আমেরিকার জন্য জাপানী বন্দরগুলি উন্মুক্ত রাখার দাবি রাখলেন। ব'লে গেলেন, এক বছর পরে তিনি আবার আসবেন, তখন তিনি যেন এর জবাব পান। ঠিক এক বছর পরে পেরি

কয়েকটি যুদ্ধজাহাজ নিয়ে এসে পৌঁছলেন। জাপানীরা ভীত হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য দুটি বন্দর উন্মুক্ত ক'রে দিল।

এর পরে বৃটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশগুলিও এল এবং তারাও সুযোগ-সুবিধা আদায় করল। বিদেশীর কাছে মাথা নত হওয়ায় শোগানের প্রতিপত্তি নষ্ট হ'ল। জাপানীরা শোগানকে ক্ষমতাচ্যুত ক'রে মিকাডোকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করল (১৮৬৭ খ্রীঃ)। মিকাডো **মুৎসোহিটো** অতিশয় প্রতিভাবান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি জাপানকে আধুনিক পাশ্চাত্য ধারায় শক্তিশালী করতে সংকল্প করলেন। তিনি দেশকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য জাপানীদের মধ্যে যে ক্ল্যান বা গোষ্ঠীর বিভাগ ছিল তা তুলে দিলেন এবং সমস্ত সামন্ত ও জমিদারশ্রেণীকে হয় ভাতা, নয় ক্ষতিপূরণ দিয়ে বিদায় করলেন। যুদ্ধের ক্ষেত্রে সামুরাই সম্প্রদায়ের স্থলে সকলের জন্য দ্বার উন্মুক্ত করলেন।


মুৎসোহিটো

মুৎসোহিটো পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষা প্রবর্তন ক'রে জাপানকে ইউরোপীয় দেশগুলির সমকক্ষ ক'রে তুলতে চাইলেন। তিনি শিক্ষাকে আবশ্যিক করলেন। দেশে সরকারী উদ্যোগে বহু বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্প-শিক্ষালয় স্থাপিত হ'ল। ইংরেজী ভাষা বিদ্যালয়ে অবশ্যপাঠ্য করা হ'ল এবং বিদেশী শিক্ষকদের জাপানে আনা হ'ল। জাপানী ছাত্ররাও দলে দলে শিক্ষালাভের জন্য বিদেশে গেল। সামরিক শিক্ষা হল বাধ্যতামূলক। স্থলবাহিনীকে গড়ে তোলা হল প্রাশিয়ার আদর্শে এবং নৌবাহিনীকে ইংলণ্ডের আদর্শে। সমস্ত জাপানে রেলপথ, ডাক-তার, ডক, পোতাশ্রয় নির্মিত

হ'ল। আধুনিক কলাকৌশল ও যন্ত্রপাতি আয়ত্ত ক'রে বড় বড় কল-কারখানা স্থাপিত হ'ল। উৎকৃষ্ট পণ্য উৎপন্ন ক'রে ও বড় বড় জাহাজ তৈরি ক'রে জাপানীরা পৃথিবীময় বাণিজ্য করতে লাগল। অল্পকালের মধ্যে জাপান শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হ'ল।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট মুৎসোহিটোর মৃত্যু হয়। তাঁর শাসন-কালকে জাপানের গৌরবময় যুগ বা **মেইজি যুগ** বলা হয়।

**জাপ সাম্রাজ্যবাদের সূচনা: চীন-জাপ যুদ্ধ: রুশ-জাপ যুদ্ধ:** জাপান শক্তিশালী হয়ে উঠে সাম্রাজ্যবাদের পথে পা দিল। জাপান তার প্রতিবেশী চিনের উপরই প্রথম প্রাধান্য বিস্তারে সচেষ্ট হ'ল। কোরিয়ায় প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টা করার ফলে চীনের সঙ্গে জাপানের যুদ্ধ বাধল (১৮৯৪-৯৫ খ্রীঃ)। এই যুদ্ধে চীন পরাজিত হ'ল এবং জাপান ফরমোসা, পেস্কু দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করল। চীনের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভের ফলে বিশ্বের সমক্ষে সে নিজেকে একটি শক্তিমান্ জাতিরূপে প্রমাণ করল। ইউরোপীয় জাতিগুলি তার সঙ্গে যেসব সন্ধি করেছিল, সেগুলি পরিবর্তন ক'রে সম্মানজনক শর্তে সন্ধি করল।

জাপান জাপ আইনে ইউরোপীয়দের বিচারের ভার ফিরে পেল। রাশিয়া এশিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তার করছিল। তা ছিল ইংলণ্ড ও জাপানের পরিপন্থী। তাই ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড ও জাপান মিত্রতার সন্ধি করল। কোন এশীয় দেশের সঙ্গে ইউরোপীয় দেশ এই প্রথম মিত্রতাসূচক সন্ধি করল। সন্ধির শর্তে বলা হ'ল, ইংলণ্ড বা জাপান একাধিক শত্রুর দ্বারা একসঙ্গে আক্রান্ত হ'লে জাপান ও ইংলণ্ড পরস্পরকে সাহায্য করবে। এই সন্ধি প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে জাপানের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় বিশেষ সহায়ক হ'ল।

রাশিয়া মাঞ্চুরিয়ায় অধিকার বিস্তার করেছিল এবং কোরিয়ায় আধিপত্য বিস্তারে সচেষ্ট হয়েছিল। ফলে রাশিয়ার সঙ্গে জাপানের যুদ্ধ বাধল ( ১৯০৪-০৫ খ্রীঃ )। রাশিয়া তখন ইউরোপের অন্যতম শক্তিশালী দেশ বলে পরিচিত ছিল। কিন্তু স্থলে ও জলে সর্বত্রই রুশ বাহিনী জাপ বাহিনীর কাছে পরাজিত হ'ল। রাশিয়া জাপানের

কয়েকটি যুদ্ধজাহাজ নিয়ে এসে পৌঁছলেন। জাপানীরা ভীত হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য দুটি বন্দর উন্মুক্ত ক'রে দিল।

এর পরে বৃটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশগুলিও এল এবং তারাও সুযোগ-সুবিধা আদায় করল। বিদেশীর কাছে মাথা নত হওয়ায় শোগানের প্রতিপত্তি নষ্ট হ'ল। জাপানীরা শোগানকে ক্ষমতাচ্যুত ক'রে মিকাডোকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করল (১৮৬৭ খ্রীঃ)। মিকাডো **মুৎসোহিটো** অতিশয় প্রতিভাবান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি জাপানকে আধুনিক পাশ্চাত্য ধারায় শক্তিশালী করতে সংকল্প করলেন। তিনি দেশকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য জাপানীদের মধ্যে যে ক্ল্যান বা গোষ্ঠীর বিভাগ ছিল তা তুলে দিলেন এবং সমস্ত সামন্ত ও জমিদারশ্রেণীকে হয় ভাতা, নয় ক্ষতিপূরণ দিয়ে বিদায় করলেন। যুদ্ধের ক্ষেত্রে সামুরাই সম্প্রদায়ের স্থলে সকলের জন্য দ্বার উন্মুক্ত করলেন।


মুৎসোহিটো

মুৎসোহিটো পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষা প্রবর্তন ক'রে জাপানকে ইউরোপীয় দেশগুলির সমকক্ষ ক'রে তুলতে চাইলেন। তিনি শিক্ষাকে আবশ্যিক করলেন। দেশে সরকারী উদ্যোগে বহু বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্প-শিক্ষালয় স্থাপিত হ'ল। ইংরেজী ভাষা বিদ্যালয়ে অবশ্যপাঠ্য করা হ'ল এবং বিদেশী শিক্ষকদের জাপানে আনা হ'ল। জাপানী ছাত্ররাও দলে দলে শিক্ষালাভের জন্য বিদেশে গেল। সামরিক শিক্ষা হল বাধ্যতামূলক। স্থলবাহিনীকে গড়ে তোলা হল প্রাশিয়ার আদর্শে এবং নৌবাহিনীকে ইংলণ্ডের আদর্শে। সমস্ত জাপানে রেলপথ, ডাক-তার, ডক, পোতাশ্রয় নির্মিত

হ'ল। আধুনিক কলাকৌশল ও যন্ত্রপাতি আয়ত্ত ক'রে বড় বড় কল-কারখানা স্থাপিত হ'ল। উৎকৃষ্ট পণ্য উৎপন্ন ক'রে ও বড় বড় জাহাজ তৈরি ক'রে জাপানীরা পৃথিবীময় বাণিজ্য করতে লাগল। অল্পকালের মধ্যে জাপান শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হ'ল।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট মুৎসোহিটোর মৃত্যু হয়। তাঁর শাসন-কালকে জাপানের গৌরবময় যুগ বা মেইজি যুগ বলা হয়।

**জাপ সাম্রাজ্যবাদের সূচনা : চীন-জাপ যুদ্ধ : রুশ-জাপ যুদ্ধ :** জাপান শক্তিশালী হয়ে উঠে সাম্রাজ্যবাদের পথে পা দিল। জাপান তার প্রতিবেশী চিনের উপরই প্রথম প্রাধান্য বিস্তারে সচেষ্ট হ'ল। কোরিয়ায় প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টা করার ফলে চীনের সঙ্গে জাপানের যুদ্ধ বাধল (১৮৯৪-৯৫ খ্রীঃ)। এই যুদ্ধে চীন পরাজিত হ'ল এবং জাপান ফরমোসা, পেস্কু দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করল। চীনের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভের ফলে বিশ্বের সমক্ষে সে নিজেকে একটি শক্তিমান্ জাতিরূপে প্রমাণ করল। ইউরোপীয় জাতিগুলি তার সঙ্গে যেসব সন্ধি করেছিল, সেগুলি পরিবর্তন ক'রে সম্মানজনক শর্তে সন্ধি করল।

জাপান জাপ আইনে ইউরোপীয়দের বিচারের ভার ফিরে পেল। রাশিয়া এশিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তার করছিল। তা ছিল ইংলণ্ড ও জাপানের পরিপন্থী। তাই ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড ও জাপান মিত্রতার সন্ধি করল। কোন এশীয় দেশের সঙ্গে ইউরোপীয় দেশ এই প্রথম মিত্রতাসূচক সন্ধি করল। সন্ধির শর্তে বলা হ'ল, ইংলণ্ড বা জাপান একাধিক শত্রুর দ্বারা একসঙ্গে আক্রান্ত হ'লে জাপান ও ইংলণ্ড পরস্পরকে সাহায্য করবে। এই সন্ধি প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে জাপানের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় বিশেষ সহায়ক হ'ল।

রাশিয়া মাঞ্চুরিয়ায় অধিকার বিস্তার করেছিল এবং কোরিয়ায় আধিপত্য বিস্তারে সচেষ্ট হয়েছিল। ফলে রাশিয়ার সঙ্গে জাপানের যুদ্ধ বাধল ( ১৯০৪-০৫ খ্রীঃ )। রাশিয়া তখন ইউরোপের অন্যতম শক্তিশালী দেশ বলে পরিচিত ছিল। কিন্তু স্থলে ও জলে সর্বত্রই রুশ বাহিনী জাপ বাহিনীর কাছে পরাজিত হ'ল। রাশিয়া জাপানের

সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হ'ল। রাশিয়া চীনকে মাঞ্চুরিয়া ছেড়ে দিল এবং কোরিয়া জাপানের প্রভাবিত এলাকা বলে স্বীকার করল। আধুনিক কালে এই প্রথম একটি এশীয় দেশের কাছে একটি ইউরোপীয় দেশ পরাজয় স্বীকার করল। জয়ের তুলনায় অবশ্য জাপান বিশেষ কিছুই পেল না। ফলে জাপান ক্ষুব্ধ হ'ল এবং চীনের উপর আধিপত্য বিস্তারে সচেষ্ট হ'ল। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে সে কোরিয়া অধিকার করে নিল। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধলে সে মিত্র-পক্ষে যোগ দিল এবং চীনের জার্মান অধিকৃত শানটুং প্রদেশে জার্মানিকে পরাজিত করে শানটুং অধিকার করল। তারপর সে প্রজাতান্ত্রিক চীনের প্রেসিডেন্ট ইউয়ান শি-কাইয়ের কাছে একুশ দফা দাবি পেশ করল। তাতে শানটুং প্রদেশের জাপ সাম্রাজ্যে অন্তর্ভুক্তি, পোর্ট আর্থার, ডাইরেন ও মাঞ্চুরিয়ার রেলপথের ইজারা লাভ, চীনের বড় বড় কল-কারখানা ও খনিতে যৌথভাবে কার্য-পরিচালনা প্রভৃতির দাবি রাখল। জাপান ইউয়ান শি-কাইকে চীনের সম্রাট হ'তে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। ইউয়ান শি-কাই একুশ দফা দাবির কয়েকটি মেনে নেন এবং বাকিগুলি সম্পর্কে আলোচনা চলতে থাকে। এই সময়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়। যুদ্ধ-শেষে ভার্সাইয়ে যে সন্ধি হয়, তাতে জাপান কেবল শানটুং লাভ করে, অন্যান্য দাবি সম্পর্কে কোন আলোচনা হয় না। ফলে জাপান মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয় এবং উগ্র সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ করতে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সে মিত্রশক্তির বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করে।

## প্রশ্নাবলী

১। অহিফেন যুদ্ধ ও নানকিংয়ের সন্ধি সম্পর্কে যা জান লিখ।

২। টিয়েন্‌সিনের সন্ধি কাদের মধ্যে হয়েছিল? এই সন্ধির কারণ ও শর্তাবলী সংক্ষেপে লিখ।

৩। চীনে পাশ্চাত্য অধিকার বিস্তারের বর্ণনা দাও।

৪। চীনে অধিকার বিস্তারে জাপানের প্রচেষ্টা সম্পর্কে যা জান লিখ।

৫। চীনে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার বিবরণ দাও।

৬। জাপানের বৃহৎ শক্তিরূপে অভ্যুদয়ের বিবরণ দাও।

৭। মেইজি যুগ ও সম্রাট মুৎসোহিটোর কৃতিত্ব বর্ণনা কর।

৮। জাপানের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশের বিবরণ দাও।

৯। টীকা লিখ:

(ক) অহিফেন যুদ্ধ; (খ) মুষ্টিযোদ্ধা বিদ্রোহ; (গ) তাইপিং বিদ্রোহ; (ঘ) চীন-জাপ যুদ্ধ (১৮৯৪-৯৫ খ্রী:); (ঙ) রুশ-জাপ যুদ্ধ (১৯০৪-০৫ খ্রী:); (চ) ৎসু হুশি; (ছ) সান ইয়াৎ-সেন; (জ) মিকাডো মুৎসোহিটো; (ঝ) কমোডার পেরি; (ঞ) ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ইঙ্গ-জাপ মৈত্রী; (ট) চীনের কাছে জাপানের একুশ দফা দাবি।

১০। সংক্ষেপে উত্তর দাও:

(ক) কোন্ যুদ্ধের ফলে ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে নানকিংয়ের সন্ধি হয়?

(খ) সম্রাজ্ঞী ইয়েহোনালা কি নামে পরিচিত ছিলেন? ঐ নামের অর্থ কি?

(গ) হে-র উন্মুক্তদ্বার নীতি বলতে কি বোঝ?

(ঘ) দক্ষিণ চীনে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা কে করেছিলেন?

(ঙ) চীন প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট কে হয়েছিলেন? কেন ও কিভাবে তিনি চীনে প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন?

(চ) উন্মুক্তদ্বার নীতি গ্রহণ করতে জাপানকে কে সর্বপ্রথম বাধ্য করেছিলেন?

(ছ) মিকাডো কাকে বলা হয়?

(জ) শোগান বলতে কি বোঝ?

(ঝ) দাইমিও ও সামুরাই কাদের বলে?

(ঞ) চীনে প্রজাতন্ত্র কত খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?

১১। শুদ্ধ উত্তরটির নীচে দাগ দাও:

(ক) চীনে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন—ৎসু হুশি, সান ইয়াৎ-সেন, ইউয়ান শি-কাই।

(খ) চীনে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়—১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে, ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে, ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে।

(গ) জাপানে প্রধান সেনাপতিকে বলা হত—মিকাডো, শোগান, দাইমিও।

## একাদশ অধ্যায়

### বৃটিশরাজের অধীনে ভারতবর্ষ ( ১৮৫৮—১৯১৪ খ্রীঃ )

**নূতন শাসন-ব্যবস্থা ঃ** ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহ দমনের পর বৃটিশ সরকার ভারতের মতো একটি বিশাল ভূখণ্ডের শাসনভার একটি ব্যবসায়ী কোম্পানীর ( বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ) হাতে রাখা সমীচীন মনে করেন না। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বৃটিশ পার্লামেন্টের একটি আইনের দ্বারা ভারতের শাসনভার বৃটিশ সরকার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। ইংলণ্ডের রানী ভিক্টোরিয়া এখন ভারতেশ্বরী বলে ঘোষিত হন। এখন ভারতের গভর্নর-জেনারেল বা বড়লাট **ভাইসরয়** বা রাজপ্রতিনিধি নামেও পরিচিত হন। ইংলণ্ডের একজন মন্ত্রীর হাতে ভারত-শাসন পরিচালনার দায়িত্ব থাকে। তিনি **ভারত-সচিব** নামে পরিচিত হন।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে বৃটিশ পার্লামেন্ট ভারতের আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে কিছু নূতন ব্যবস্থা করেন। এতদিন বড়লাট তাঁর কাউন্সিলের সদস্যদের পরামর্শ নিয়ে আইন প্রণয়ন করতেন। তাঁর কাউন্সিলে চারজন সাধারণ সদস্য ও ভারতের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। নূতন আইন অনুসারে আইন-প্রণয়নের জন্য এখন কাউন্সিলে আরও অনধিক বারো ও অন্যূন ছয় জন সদস্য যোগ করা হ'ল। অবশ্য, আইন-প্রণয়নের বিষয়ে ও শাসন-বিষয়ে সর্বোচ্চ ক্ষমতা রইল বড়লাটের হাতে। বোম্বাই ও মাদ্রাজের এবং পরে আরও অনেকগুলি প্রদেশের গর্ভনরদের কাউন্সিলের সদস্য-সংখ্যাও আইন-প্রণয়নের জন্য বাড়ানো হ'ল। কাউন্সিলগুলিতে নূতন যে সদস্য যোগ করা হ'ল তাঁদের অর্ধেক বেসরকারী হ'লেও তাঁরা সকলেই বড়লাট বা গর্ভনর কর্তৃক মনোনীত হ'তেন—কেউ জনসাধারণের প্রতিনিধিরূপে নির্বাচিত হতেন না। তাই আইনের মধ্যে জনসাধারণের ইচ্ছা কখনই প্রতিফলিত হ'ত না, আইন সম্পর্কে জনসাধারণের মতামত কি, তাও জানা যেত না। শাসন-ব্যবস্থা একান্তই স্বেচ্ছাচারী ও

স্বৈরতন্ত্রী ছিল—ইংলণ্ডের স্বার্থেই শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হ'ত, ইংলণ্ডের স্বার্থেই আইন-প্রণয়ন হ'ত।

**সাম্রাজ্য বিস্তার :** সিপাহী-বিদ্রোহের পূর্বেই প্রায় সারা ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়েছিল। সিপাহী-বিদ্রোহের পরে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বালুচিস্থান, বাংলাদেশ ও আসামের উত্তরে অবস্থিত কিছু অঞ্চল এবং উত্তর ব্রহ্ম বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। রাশিয়া ক্রমাগত মধ্য এশিয়ায় রাজ্য বিস্তার ক'রে দক্ষিণে অগ্রসর হ'লে ইংরেজরা ভীত হয় এবং আফগানিস্তানে প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট হয়। কিন্তু আফগানিস্তান রাশিয়ার সঙ্গে মিত্রতার নীতি গ্রহণ করায় ইংরেজরা আফগানিস্থানে কয়েকবার অভিযান করে এবং গৃহ-বিবাদের সুযোগে নিজ মনোমত ব্যক্তিকে আফগানিস্থানে বসায়। আফগানরা বার বার বিদ্রোহ করে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইংরেজরা আফগানিস্থানে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় সফল হয়। আফগানিস্থানে প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টার সূত্রে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজরা কোয়েটা অধিকার করে এবং বালুচিস্থানের একাংশ বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। আফগানিস্থান ও ভারতবর্ষের মধ্যবর্তী অঞ্চলে কিছু দুর্ধর্ষ পার্বত্য জাতি বাস করত। ইংরেজরা অভিযান চালিয়ে এবং সেখানে পথঘাট ও রেলপথ নির্মাণ করে আধিপত্য বিস্তার ক'রে।

বাংলাদেশের কোচবিহার রাজ্যের উপর ভুটান আধিপত্য করত। কোচবিহারের সঙ্গে ভুটানের বিবাদের সুযোগে ইংরেজরা কোচবিহার থেকে ভুটানীদের বিতাড়িত করে ও বক্সাদুর্গ অধিকার করে নেয়। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে আসাম ইংরেজ অধিকারে আসে। ভুটানের দক্ষিণে আসামের ধনসিরি থেকে বাংলাদেশে তিস্তা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত একটি ভূখণ্ড ছিল। এই ভূখণ্ডে প্রবেশের জন্য বাংলাদেশের দিকে এগারোটি ও আসামের দিকে সাতটি পথ বা দরজা ছিল। এগুলিকে বলা হয় **ডুয়ার্স** (doors)। আসাম ও বাংলাদেশের দিকের এই ডুয়ার্সগুলি দিয়ে ভুটানীরা প্রবেশ করত। ইংরেজরা ডুয়ার্সগুলি অধিকার করে নিলে ভুটানের সঙ্গে বিবাদ বাধল। ইংরেজরা ভুটান আক্রমণে উদ্যত

হ'লে ভুটান সরকার সন্ধি করিতে বাধ্য হ'ল এবং ডুয়ার্সগুলিতে ইংরেজের অধিকার ও আধিপত্য স্বীকার করে নিল ( ১৮৬৫ খ্রীঃ )। ইংরেজরা ভুটানকে ক্ষতিপূরণ বা সাহায্য রূপে প্রতিবছর পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হ'ল। এইভাবে বৃটিশ ভারত ভুটান ও সিকিম পর্যন্ত উত্তরে বিস্তৃত হ'ল।

লর্ড ডালহৌসি ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ ব্রহ্ম জয় করেছিলেন। ব্রহ্মদেশের উত্তরে ফরাসীরা ইন্দোচীন ও তংকিনে সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল। ব্রহ্মরাজ থিবো ফরাসীদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন ক'রে উত্তর ব্রহ্ম থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করতে চাইলেন। তিনি এক ইংরেজ ব্যবসায়ীকে কাঠ চুরির অপরাধে চৌত্রিশ লক্ষ টাকা জরিমানা করলেন এবং উত্তর ব্রহ্মের বনগুলি ফরাসীদের ইজারা দিতে চাইলেন। এর প্রতিবাদে বড়লাট লর্ড ডাফরিন ব্রহ্মদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন (১৮৮৫ খ্রীঃ)। রাজা থিবো পরাজিত ও সিংহাসনচ্যুত হলেন। উত্তর ব্রহ্মও ইংরেজদের অধিকারভুক্ত হ'ল।

তিব্বতের উপরে প্রাধান্য বিস্তার নিয়ে ইংরেজ ও রুশদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে। বড়লাট লর্ড কার্জনের সময়ে ইংরেজবাহিনী তিব্বতে অভিযান করে জয়ী হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইংলণ্ড ও রাশিয়া মিলিতভাবে তিব্বতের উপর চীনের সার্বভৌমত্ব স্বীকার ক'রে নেয়।

**উনবিংশ শতাব্দীতে সমাজ-সংস্কার**ঃ মধ্য যুগ থেকে বহু কুসংস্কার ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। নিঃসন্তান হিন্দুরা সন্তান কামনায় গঙ্গাদেবীর কাছে সন্তান হ'লে তাকে গঙ্গাসাগরে বিসর্জন দেবে এইরূপ মানত করত। রাজপুতরা কন্যাসন্তানকে অবাঞ্ছিত বিবেচনায় শিশুকালে হত্যা করত। খোন্দ জাতির লোকেরা এবং কাপালিক প্রভৃতি হিন্দু সাধকরা নরবলি দিত। হিন্দু স্বামী মারা গেলে তার বিধবা স্ত্রীকে মৃত স্বামীর চিতায় মহাসমারোহে পুড়িয়ে মারা হ'ত। একে বলা হ'ত সতীদাহ। হিন্দু পুরুষরা বহুবিবাহ করত, কিন্তু হিন্দু স্ত্রীলোক বিধবা হ'লে তার আর বিবাহ করার উপায় ছিল না। তাকে সমস্ত জীবন শ্বশুরালয়ে বা পিত্রালয়ে বহু অপমান,

লাঞ্ছনা, গঞ্জনা প্রভৃতি সহ্য করে জীবন কাটাতে হ'ত। ইংরেজ শাসকরা এই সব নির্মম হৃদয়হীন প্রথা ও কুসংস্কারকে আইন করে নিষিদ্ধ করেছিলেন।

১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন ও ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে শিশুকন্যাবধ আইন ক'রে নিষিদ্ধ করা হয়। পরে বড়লাট **হার্ডিঞ্জ** আইন করে নরবলি বন্ধ করেছিলেন। বড়লাট **লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক** সতীদাহ-প্রথা নিষিদ্ধ করে চিরস্মরণীয় হয়েছেন। হিন্দু সমাজে সতীদাহ-প্রথা বহু পূর্ব থেকেই প্রচলিত ছিল। **রাজা রামমোহন রায়** এই নির্মম প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। বাংলাদেশে সতীদাহ-প্রথা অত্যন্ত বিস্তারলাভ করেছিল। বছরে শত শত বিধবাকে নৃশংসভাবে পুড়িয়ে মারা হ'ত। রাজা রামমোহন রায়ের উৎসাহে ও পরামর্শে ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক আইন ক'রে সতীদাহ-প্রথা নিষিদ্ধ করেন। সতীদাহ-প্রথা নিষিদ্ধ হওয়ায় হিন্দু বিধবারা বাঁচল সত্য, কিন্তু সমাজে তারা নিতান্ত দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে দিন কাটাতে বাধ্য হ'ল। তাদের দুঃখে বিগলিত হয়ে পণ্ডিত **ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর** বিধবা-বিবাহ যে হিন্দু-শাস্ত্রসম্মত তা প্রমাণ ক'রে দেখালেন এবং বিধবা-বিবাহ প্রচলনের চেষ্টা করলেন। তাঁর চেষ্টায় বড়লাট লর্ড ডালহৌসী বিধবা-বিবাহকে আইনসিদ্ধ করেন।

**জাতীয়তাবাদী মনোভাবের বিকাশ :** ইংরেজ শাসনের পূর্বে সারা ভারতবর্ষ কখনও এইভাবে একই শাসনে ঐক্যবদ্ধ হয়নি। উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে কন্যাকুমারী এবং পশ্চিমে আফগানিস্থানের সীমা থেকে পূর্বে ব্রহ্মদেশের সীমা পর্যন্ত একই শাসনে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। পথঘাট, রেলপথ, জলপথ, ডাক, তার প্রভৃতি বিশাল দেশের মধ্যে যোগাযোগ সাধন সহজ করেছিল। সারা ভারতে ইংরেজী ভাষার শিক্ষা প্রবর্তিত হওয়ায় এবং ইংরেজী সরকারী ভাষা হওয়ায় তা ভারতের সকল অংশের শিক্ষিত মানুষের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান সম্ভব ও সহজ ক'রে তুলেছিল। ভারতের মানুষ এখন নিজ ভাষাভাষী অঞ্চলকেই তার দেশ বলে না ভেবে সমস্ত ভারতবর্ষকেই তার দেশ

বলে ভাবতে শিখেছিল। ভারতের সকল অংশের মানুষ নিজেকে একজাতি ও একপ্রাণ বলে অনুভব করতে পেরেছিল। তাদের সকলের উপর ইংরেজ শাসকদের অবিচার, অত্যাচার, শাসন ও শোষণ তাদের মধ্যে ঐক্যের মনোভাবকে দৃঢ়তর করেছিল। এইভাবে ভারতের জাতীয়তাবোধের উদ্ভব হয়েছিল।

ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে কৃষক, শ্রমিক, কারিগর, সাধারণ মানুষ সকলেই বিক্ষুব্ধ হ'লেও জাতীয়তাবোধের সূচনা হয়েছিল প্রথমে ইংরেজী-শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে, পরে তা কৃষক, শ্রমিক প্রভৃতি অন্যান্য শ্রেণীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। সিপাহী-বিদ্রোহের অবসানের পর মহারানী ভিক্টোরিয়া যে ঘোষণা প্রচার করেছিলেন, তাতে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল ভারতীয়কে যোগ্যতা অনুসারে সরকারী কার্যে নিয়োগের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। দেশে ইংরেজী ও পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্য বহু বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। ভারতীয় তরুণরা দলে দলে ইংরেজী ভাষা ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছিল। কিন্তু তাদের যোগ্যতা অনুসারে সরকারী কাজে নিয়োগ করা হচ্ছিল না। দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তাদের মনে ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়েছিল। তারা পাশ্চাত্য দেশের রাজনৈতিক ইতিহাস পড়েছিল। আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম, ইটালীর স্বাধীনতা ও ঐক্যের সংগ্রাম প্রভৃতি কাহিনী তাদের উদ্দীপিত করেছিল। ফলে তাদের মনে দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবোধ জেগেছিল।

শিক্ষিত শ্রেণীর এই মনোভাবকে রাজনৈতিক রূপ দিলেন **সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়**। সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন কৃতী ছাত্র এবং বিলাত গিয়ে আই. সি. এস. ( ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস ) পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু ইংরেজ সরকার তাঁকে চাকরিতে নিতে চাইল না। তিনি এর বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের কুইন্‌স্ বেঞ্চে মামলা ক'রে জিতলেন। সরকার তাঁকে চাকরি দিতে বাধ্য হ'ল, কিন্তু সামান্য ত্রুটির অভিযোগে তাঁকে পদচ্যুত করল। সুরেন্দ্রনাথ এই

অবিচার নীরবে সহ্য করলেন না। তিনি এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রচার শুরু করলেন। কয়েক বছর বাদে ইংরেজ সরকার ভারতীয় তরুণরা যাতে আই. সি. এস. পরীক্ষা দিতে না পারে, সেজন্য পরীক্ষা দেওয়ার বয়স-সীমা একুশ থেকে কমিয়ে আঠারো করল। সুরেন্দ্রনাথ এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রচার ও আন্দোলন শুরু করলেন। তিনি সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়ালেন এবং এই অবিচারের বিরুদ্ধে শিক্ষিত শ্রেণীকে সচেতন ক'রে তুললেন। তিনি **ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন** বা **ভারত-সভা** নামে একটি রাজনৈতিক সংস্থা স্থাপন করলেন।

দেশে ইংরেজবিরোধী মনোভাব খুবই প্রবল হয়ে উঠেছিল। এদেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলিতে ইংরেজ সরকারের কাজের যেসব সমালোচনা প্রকাশিত হ'ত, সেগুলি জনসাধারণ পড়ে সহজেই বুঝতে পারত। তাই বড়লাট লর্ড লিটন **মাতৃভাষা সংবাদপত্র আইন** পাস ক'রে এদেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলির কণ্ঠরোধ করলেন। ভারতবাসীর মধ্যে বিক্ষোভ এতোই প্রবল হয়ে উঠেছিল যে, ইংরেজ সরকার সশস্ত্র বিদ্রোহের আশংকাও করছিল। তাই লর্ড লিটন **অস্ত্র আইন** পাস ক'রে ভারতবাসীর অস্ত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ করলেন। এইসবের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন গ'ড়ে উঠল, তাতে ইংরেজ সরকার বাধ্য হয়ে আই. সি. এস. পরীক্ষার বয়স-সীমা বাড়াতে ও মাতৃভাষা সংবাদপত্র আইন রদ করতে বাধ্য হ'ল। এদেশীয় ম্যাজিস্ট্রেট ও জজদের ইউরোপীয়দের বিচার করার অধিকার ছিল না। বড়লাট **লর্ড রিপন** এই অন্যায় ব্যবস্থা তুলে দেওয়ার জন্য **ইলবার্ট বিল** নামে একটি আইনের খসড়া করেন। এর বিরুদ্ধে ইউরোপীয়রা প্রবল আন্দোলন শুরু করে। ভারত-সভাও এই বিলের সমর্থনে পালটা আন্দোলন শুরু করে। শেষ পর্যন্ত **ইলবার্ট বিল** পাস হয়, তবে এদেশীয় বিচারকদের ইউরোপীয়দের বিচারকালে ইউরোপীয় জুরির সাহায্য নিতে হবে, এই ব্যবস্থা থাকে।

দেশব্যাপী এইসব আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটতে থাকে। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ একটি সর্বভারতীয়

জাতীয় রাজনৈতিক সংস্থা গঠনের জন্য নিখিল ভারতীয় জাতীয় সম্মেলন আহ্বান করেন।

**ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ঃ** বড়লাট লর্ড ডাফরিনের পরামর্শে ভূতপূর্ব পদস্থ ইংরেজ রাজকর্মচারী **অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম** ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় সংঘবদ্ধ করতে সচেষ্ট হন। তাঁর চেষ্টায় ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইয়ে ভারতের বিশিষ্ট শিক্ষিত ব্যক্তিদের নিয়ে এক সম্মেলন হয়। ঐ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন কলকাতার বিশিষ্ট ব্যারিস্টার **উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়**। এইভাবে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ঘটে। সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি নেতারাও কংগ্রেসে নেতৃত্ব করতে থাকেন।



হিউম

কংগ্রেস ক্রমেই জনপ্রিয় ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। কংগ্রেস শাসনব্যবস্থায় ভারতীয়দের অংশগ্রহণ দাবি করে। কংগ্রেসের এই জনপ্রিয়তা ইংরেজ সরকার ভালো চোখে দেখে না। সরকার এর পৃষ্ঠপোষকতা বন্ধ করেন। বড়লাট ডাফরিন কংগ্রেসকে 'মুষ্টিমেয় শিক্ষিতের প্রতিষ্ঠান' বলে হেয় প্রতিপন্ন করতেও চেষ্টা করেন।

**চরমপন্থী আন্দোলন ঃ** ১৮৯৬ থেকে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ভারতের নানা স্থানে ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ ও প্লেগরোগের মহামারী দেখা দেয়। কিন্তু সরকার এ ব্যাপারে নির্বিকার থাকে। ফলে কংগ্রেসের এক অংশ, মহারাষ্ট্রের **লোকমান্য গঙ্গাধর তিলক**, পাঞ্জাবের **লালা লাজপত রায়** ও বাংলাদেশের **বিপিনচন্দ্র পাল** প্রভৃতির নেতৃত্বে সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পথ গ্রহণ করেন। এঁরা কংগ্রেসে **চরমপন্থী** নামে পরিচিত। যাঁরা সরকারের কাছে আবেদন-নিবেদনের পথ অনুসরণ করতে চান, তাঁরা **নরমপন্থী** নামে পরিচিত হন। ফিরোজ শাহ

মেটা, গোপালকৃষ্ণ গোখেল, সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি এঁদের নেতৃত্ব করতে থাকেন। এইভাবে কংগ্রেসে চরমপন্থী ও নরমপন্থী নামে দুটি উপদলের সৃষ্টি হয়।

বাংলাদেশের কলিকাতা ছিল বৃটিশ ভারতের রাজধানী। তাই পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার বাংলাদেশেই সর্বাগ্রে হয়েছিল। বাঙালীরা ছিল রাজনৈতিক আন্দোলনের পুরোভাগে। এজন্য বাংলাদেশ ও বাঙালীদের দুর্বল ক'রে দিতে চাইল ইংরেজ সরকার। পশ্চিমবাংলায় ছিল হিন্দুদের ও পূর্ববাংলায় ছিল মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য। ইংরেজ সরকার হিন্দু-মুসলমানের মধ্যেও বিভেদ সৃষ্টি করতে চাইল। এইসব উদ্দেশ্যে বড়লাট লর্ড কার্জন বাংলাদেশকে দু-টুকরো ক'রে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে একটি প্রদেশ এবং পূর্ববঙ্গ ও আসাম নিয়ে অপর একটি প্রদেশ গঠনের কথা ঘোষণা করলেন। বাংলাদেশকে এইভাবে দু-টুকরো করাকে বলা হয় **বঙ্গভঙ্গ**।

এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সারা দেশে তুমুল আন্দোলন হ'ল। ইংরেজরা এদেশে বিলাতী মাল বিক্রি ক'রে বছরে কোটি কোটি টাকা নিয়ে যায়। তাই ইংরেজদের জব্দ করার জন্য বিদেশী পণ্য বর্জন ও স্বদেশী পণ্য ব্যবহারের আন্দোলনও গ'ড়ে তোলা হ'ল। এই আন্দোলন **স্বদেশী আন্দোলন** নামে পরিচিত। দেশব্যাপী এই তুমুল আন্দোলনেও কিন্তু ইংরেজ সরকার কর্ণপাত করল না। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে বাংলাদেশকে দ্বিখণ্ডিত ক'রে দুটি প্রদেশ গঠন করা হ'ল। ইংরেজ সরকার কঠোর হস্তে আন্দোলন দমন করতে চেষ্টা করল।

বাংলার তরুণরা ক্রমেই কিন্তু হিংসার পথ বেছে নিল। বাংলাদেশে **সন্ত্রাসবাদ** দেখা দিল। কুখ্যাত ম্যাজিস্ট্রেট কিংস্‌ফোর্ডকে হত্যার চেষ্টার অপরাধে কিশোর **ক্ষুদিরাম বসু** ফাঁসিতে প্রাণ দিলেন। পুলিসের হাতে ধরা পড়ার ভয়ে **প্রফুল্ল চাকি** পিস্তলের গুলিতে আত্মহত্যা করলেন। কলিকাতার মানিকতলায় একটি বাগানবাড়িতে বোমা, পিস্তল প্রভৃতি ধরা পড়ায় বাগানবাড়ির মালিক **অরবিন্দ ঘোষ** ( পরে

শ্রীঅরবিন্দ ) ও তাঁর ভাই বারীন্দ্রনাথ ঘোষ-সহ ৩৪ জন সন্ত্রাসবাদী ধরা পড়লেন। বিচারে শেষ পর্যন্ত অরবিন্দ ঘোষ-সহ ১৭ জন মুক্তি পেলেও অনেকের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হ'ল। এতেও কিন্তু সন্ত্রাসবাদ দমন করা গেল না। সরকার নির্মম হস্তে দমননীতি চালাতে লাগল। এই অবস্থায় চরমপন্থী ও নরমপন্থী মতভেদ আরও তীব্র হয়ে উঠল। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে সুরাটে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হ'ল, তাতে উভয় দলের বিরোধের ফলে অধিবেশন ভণ্ডুল হয়ে গেল। চরমপন্থীরা কংগ্রেস ত্যাগ করল। কংগ্রেস এখন নরমপন্থীদের কবলে গেল। সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে তিলক ব্রহ্মদেশে নির্বাসিত হয়ে মান্দালয় জেলে আটক রইলেন। লালা লাজপত রায়ও নির্বাসিত হলেন।

একদিকে ইংরেজ সরকার যেমন কঠোর দমননীতি চালাল, অন্যদিকে তেমনি ভারতবাসীকে কিছুটা শান্ত করার জন্য ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রোধ করল। এখন পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গ নিয়ে একটি প্রদেশ, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে অন্য একটি প্রদেশ গঠিত হ'ল এবং আসামকে একটি চীফ কমিশনার-শাসিত অঞ্চল করা হ'ল। বাংলাদেশ ও বাঙালীদের কঠিন শাস্তি দেওয়ার জন্যই বৃটিশ ভারতের রাজধানী কলিকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করা হ'ল। শাসনব্যবস্থাতেও কিছু সংস্কার সাধন করা হ'ল। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভা-গুলিতে সদস্যসংখ্যা কিছু বাড়ানো হ'ল। কিছুসংখ্যক নির্বাচিত সদস্য নেওয়া হ'ল। হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য মুসলমান সদস্যদের পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা হ'ল।

এর পর কয়েক বৎসর জাতীয়তাবাদী সংগ্রামে ভাটা পড়ে। এই সময়, ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে, এল **প্রথম বিশ্বযুদ্ধ**।

## প্রশ্নাবলী

১। সিপাহী বিদ্রোহের পর শাসনব্যবস্থার কি পরিবর্তন হয়েছিল?
২। সিপাহী বিদ্রোহের পর ইংরেজরা কিরূপে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল?
৩। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজ সরকার কি কি সমাজ-সংস্কার করেছিল?

৪। ভারতে জাতীয়তাবাদের সূচনা ও বিকাশ কিভাবে হয়েছিল ?

৫। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে যা জান লিখ।

৬। কংগ্রেসে চরমপন্থী কাদের বলা হ'ত ? এদের মতান্তর ও বিরোধের বিবরণ দাও :

৭। বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কে যা জান লিখ।

৮। সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) সতীদাহ-প্রথা কি ? কার উৎসাহে ও পরামর্শে কোন্ বড়লাট এই সতীদাহ-প্রথা নিষিদ্ধ করেন ?

(খ) কোন্ বড়লাট নরবলি নিষিদ্ধ করেছিলেন ?

(গ) কার চেষ্টায় বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হয়েছিল ? কোন্ বড়লাট বিধবা-বিবাহকে বৈধ ক'রে আইন করেছিলেন ?

(ঘ) ভারত-সভা কি ? কে ভারত-সভা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ?

(ঙ) মাতৃভাষা সংবাদপত্র আইন ও অস্ত্র আইন কোন্ বড়লাট পাস করেছিলেন ?

(চ) ইলবার্ট বিল কি ? কে এই বিল এনেছিলেন ?

(ছ) কত খ্রীষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ?

(জ) বঙ্গভঙ্গ কি ? কত খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ হয়েছিল ? কত খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়েছিল ?

(ঝ) কত খ্রীষ্টাব্দে সুরাট কংগ্রেসের অধিবেশন ভণ্ডুল হয়েছিল ?

(ঞ) বৃটিশ ভারতের রাজধানী কোথায় ছিল ? পরে তা কোথায় স্থানান্তরিত হয়েছিল ?

---

## দ্বাদশ অধ্যায়

# প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

**প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ** : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রধান কারণজার্মানির আক্রমণাত্মক মনোভাব। বিসমার্ক প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মানিকে শক্তিশালী ক'রে তুলেছিলেন। তিনি নির্লজ্জ সাম্রাজ্যবাদের পথ গ্রহণ না ক'রে "সন্তুষ্ট জার্মানি"-র নীতি অনুসরণের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু জার্মানিতে যে শিল্পবিপ্লব ঘটেছিল, তার ফলে জার্মানি শিল্প-

বিজ্ঞানে অসাধারণ উন্নতি করেছিল। উৎকর্ষের জন্য জার্মানিতে উৎপন্ন পণ্যের চাহিদা সারা পৃথিবীতে দেখা দিয়েছিল। উৎপাদন অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় জার্মানির প্রয়োজন হয়েছিল বাইরের বাজারের। সাম্রাজ্য-বিস্তার ছাড়া এই বাজার পাওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া এশিয়া ও আফ্রিকায় সাম্রাজ্য-বিস্তার ক'রে সিংহ-ভাগ নিয়েছিল। ফলে সাম্রাজ্য-বিস্তারের জন্য ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়ার সঙ্গে বিরোধ ও যুদ্ধ ছিল অনিবার্য। তুরস্ক একটি বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হ'লেও তার দুর্বলতার সুযোগে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া তুর্কী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট ছিল।


দ্বিতীয় উইলিয়ম

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে **দ্বিতীয় উইলিয়ম** জার্মানির কাইজার বা সম্রাট হন। তিনি প্রথমেই ঘোষণা করেন যে, জার্মানির উপনিবেশ ও সাম্রাজ্য চাই। তিনি এ বিষয়ে সচেষ্ট হলেন। তিনি জার্মানিকে সামরিক দিক থেকে দ্রুত শক্তিশালী ক'রে তোলার ব্যবস্থা করলেন। বিসমার্কের নীতি পরিবর্তন ক'রে তিনি জার্মানিকে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রুতে পরিণত করলেন। আলসাস-লরেন নিয়ে ফ্রান্সের সঙ্গে তার স্থায়ী শত্রুতা ছিল। রাশিয়ার সঙ্গে ফ্রান্স এই সুযোগে মৈত্রী চুক্তি করল। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় উইলিয়ম বিসমার্ককে পদচ্যুত ক'রে রাষ্ট্র-পরিচালনার সমস্ত দায়িত্ব স্বহস্তে নিলেন। জার্মানি তার স্থলবাহিনীকে দুর্জয় করে তুলল। কিন্তু তখন ইংলণ্ড ছিল নৌবাহিনীতে দুর্জয়। জার্মানি এখন শক্তিশালী নৌবাহিনী গড়ে তোলায় ইংলণ্ডও জার্মানি সম্পর্কে সচেতন হ'ল।

এইভাবে জার্মানি, ইলংণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি ও অস্ত্র-সজ্জার প্রতিযোগিতা চলল।

অবশেষে যুদ্ধ বাধল একটি সামান্য কারণে। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রিয়া বস্‌নিয়া অধিকার করেছিল। বস্‌নিয়ার অধিবাসীরা ছিল সার্ব। সার্বরা অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী দল গড়ে তুলেছিল। অস্ট্রিয়ার যুবরাজ বস্‌নিয়া সফরে গেলে বস্‌নিয়ার রাজধানী সেরাজেভোতে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ২৮শে জুন একজন সার্ব সন্ত্রাসবাদীর হাতে নিহত হলেন। অস্ট্রিয়া ক্রুদ্ধ হয়ে সার্বিয়ার কাছে প্রচুর ক্ষতিপূরণ দাবি করল। হত্যাকারী জাতিতে সার্ব হলেও সে সার্বিয়ার অধিবাসী ছিল না। তাছাড়া, এত ক্ষতিপূরণ দেওয়া সার্বিয়ার মতো ক্ষুদ্র দেশের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ফলে জার্মানির উৎসাহে অস্ট্রিয়া সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। এই অঞ্চলে আধিপত্য-বিস্তার নিয়ে অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছিল। কাজেই, রাশিয়া সার্বিয়ার পক্ষে যোগ দিল। জার্মানি অস্ট্রিয়ার পক্ষ সমর্থন করল এবং রাশিয়া ও তার মিত্র ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল।

জার্মানি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল। জার্মানী এখন ফ্রান্স আক্রমণের জন্য বেলজিয়ামের মধ্যে দিয়ে সৈন্য চালনা করল। বেলজিয়াম ছিল নিরপেক্ষ দেশ। জার্মানি নিরপেক্ষ বেলজিয়াম আক্রমণ করায় ইংলণ্ড জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। এইভাবে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বেধে গেল। জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার পক্ষে তুরস্ক যোগ দিল। পরে বুলগেরিয়া-ও জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার পক্ষে যোগ দেয়। জার্মানি, অস্ট্রিয়া, তুরস্ক ও বুলগেরিয়ার মিলিত শক্তি **কেন্দ্রীয় শক্তি** নামে পরিচিত। ইংলণ্ডের সঙ্গে জাপানের মৈত্রী-চুক্তি ছিল। তাই জাপান ইংলণ্ডের পক্ষে যোগ দিল। ইটালি এবং পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের পক্ষে যোগ দেয়। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া, জাপান, ইটালি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতির মিলিত শক্তি **মিত্র-শক্তি** নামে পরিচিত।

**যুদ্ধের ব্যাপকতা :** এই যুদ্ধ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। এই

যুদ্ধে সর্বস্থদ্ধ তেত্রিশটি দেশ ও প্রায় সাড়ে সাত কোটি যোদ্ধা অংশ নেয়। প্রায় এক কোটি লোক মারা যায় এবং দু কোটি লোক আহত হয়। প্রায় ছ লক্ষ কোটি টাকা ব্যয় হয়। তাছাড়া, ধ্বংস হয় অসংখ্য কল-কারখানা, ডক, বাড়ি-ঘর, শস্যক্ষেত্র। যুদ্ধ জলে, স্থলে এবং আকাশে চলে। এই যুদ্ধেই সর্বপ্রথম সাবমেরিন, জেপেলিন ও পরে এরোপ্লেন এবং ট্যাংক ব্যবহৃত হয়। নূতন নূতন মারণাস্ত্র ও ক্ষেপণাস্ত্র উদ্ভাবিত হয়। শত্রু-দেশকে অনাহারে রেখে মারার জন্য পণ্যবাহী জাহাজ সমুদ্রে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। যাত্রীবাহী জাহাজও রক্ষা পায় না। জার্মান সাবমেরিন যাত্রীবাহী জাহাজ লুসিতানিয়া ডুবিয়ে দেওয়ার ফলেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জার্মানির বিরুদ্ধে যোগ দেয়। এই যুদ্ধ ব্যাপকতায় পূর্ববর্তী সকল যুদ্ধকেই ছাড়িয়ে যায়।

**ফলাফল ঃ** চার বছর (আগস্ট, ১৯১৪—নভেম্বর, ১৯১৮ খ্রীঃ) ধরে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলল। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মিত্রপক্ষে যোগ দেয়। ঐ বৎসর নভেম্বর মাসে রাশিয়ায় বিপ্লব ঘটায়, রাশিয়া যুদ্ধ থেকে বিদয় নেয়। উভয়পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ চললেও শেষ, পর্যন্ত কেন্দ্রীয় শক্তি পরাজিত হ'ল। কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ম দেশ ছেড়ে হল্যাণ্ডে পালিয়ে গেলেন। আগেই বুলগেরিয়া, তুরস্ক ও অস্ট্রিয়া আত্মসমর্পণ করেছিল। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর জার্মানী বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করলে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান হ'ল। জার্মানীর সঙ্গে ভার্সাইয়ে সন্ধি করা হ'ল। অন্যান্য বিজিত দেশগুলির সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে পৃথকভাবে চারটি সন্ধি করা হয়। জার্মানী ও অস্ট্রিয়ায় রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটে ও প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। জার্মানী ও অস্ট্রিয়া তার বহু অঞ্চল হারায় এবং তুর্কী সাম্রাজ্যের সাম্রাজ্য বলতে প্রায় কিছুই থাকে না। রাজ্যগুলির পুনর্বিন্যাস, ক্ষতিপূরণ প্রভৃতির ব্যবস্থা প্যারিসে অনুষ্ঠিত শান্তি-সম্মেলনে সম্পন্ন হয়।

### প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কালে ভারতবর্ষ (১৯১৪—১৯১৮ খ্রীঃ)

**যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় ভারতের সহযোগিতা ঃ** ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধলে ইংরেজরা পরাধীন ভারতবর্ষকেও যুদ্ধে নামাল এবং

তার জনবল ও ধনসম্পদ যুদ্ধেরজন্য যথাসম্ভব ব্যবহার করতে লাগল। নানা কারণেই তা তার পক্ষে সহজ হয়েছিল।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে সুরাটে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়েছিল, তা নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের প্রচণ্ড কলহের মধ্যে শেষ হয়, চরমপন্থীরা কংগ্রেস ত্যাগ করেন এবং কংগ্রেস নরম পন্থীদের কবলে যায়। নরমপন্থীরা ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতার পক্ষপাতী ছিলেন। ইংরেজ সরকার **বঙ্গভঙ্গ রদ** করে এবং শাসনব্যবস্থায় **মর্লে-মিণ্টো সংস্কার** নামে কিছু পরিবর্তন ঘটিয়ে ভারতীয়দের কিছুটা সন্তুষ্ট ও শান্ত করতে চেয়েছিল। লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক মান্দালয় জেলে কারারুদ্ধ ও নির্বাসিত হয়েছিলেন। অন্যান্য চরমপন্থী নেতারাও অনেকে নির্বাসিত বা কারারুদ্ধ হয়েছিলেন এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে ভাটা পড়েছিল। মিত্রপক্ষ তাদের যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও আদর্শ হিসাবে স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও মানুষের অধিকার রক্ষার কথা বার বার বলছিলেন। তাই ভারতীয় নেতাদের এইরূপ ধারণা হয়েছিল যে, যুদ্ধে বৃটেন বিজয়ী হলে, ভারতবর্ষকে স্বায়ত্ত-শাসন ও গণতান্ত্রিক অধিকার দেবে।

তাই ভারতীয় নেতারা দেশবাসীকে যুদ্ধে ইংলণ্ডকে সাহায্য করবার জন্য উৎসাহিত করছিলেন। গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে স্বদেশে ফিরে এসেছিলেন। তিনি অহিংস সংগ্রামে বিশ্বাসী হলেও যুদ্ধকালে ইংলণ্ডকে সাহায্য করবার নীতি গ্রহণ করেছিলেন, এমন কি নিজে যুদ্ধের জন্য সৈন্যসংগ্রহেও আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ফলে, দলে দলে ভারতীয় তরুণরা এই যুদ্ধে বৃটিশ বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল এবং এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের বহু রণাঙ্গনে মিত্রপক্ষে যুদ্ধ করেছিল।

**অর্থনৈতিক চাপ ও জনসাধারণের অসন্তোষ** : কেবল জনবল নয়, ইংরেজরা ভারতের ধনসম্পদ্ও এই যুদ্ধে নিঃশেষে ব্যবহার করেছিল। যুদ্ধের প্রয়োজনে এ দেশ থেকে শুধু বিপুল পরিমাণ অর্থই ইংরেজ সরকার নিয়ে যায়নি, খাদ্য, কাঁচামাল ও অত্যাবশ্যক বহু পণ্যও নিয়ে গিয়েছিল। ফলে, দেশে খাদ্যাভাব, প্রয়োজনীয় দ্রব্যের

অভাব, মুদ্রাস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি দেখা দিয়েছিল। যুদ্ধে জমিদার, ধনী ব্যবসায়ী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকে কিছু লাভবান হলেও, দরিদ্র জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা চরমে পৌঁছেছিল।

**বিপ্লবীদের ক্রিয়াকলাপ** ঃ জনসাধারণের এই ক্ষোভ ও অসন্তোষের ফলে, দেশে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা আবার সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। বিদেশে পলায়িত প্রবাসী বিপ্লবীরাও তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। জার্মানির সঙ্গে ইংলণ্ডের যুদ্ধ চলছিল। জার্মানীর সাহায্যে যাতে এ দেশে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভ্যুত্থান ঘটানো যায়, সেজন্য এদেশের ও বিদেশের প্রবাসীরা সচেষ্ট হয়েছিলেন। এইরূপ ব্যাপক অভ্যুত্থান ঘটাবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করতে জার্মানিও সম্মত হয়েছিল। এই ধরনের ব্যাপক সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটাবার কাজে যাঁরা অগ্রণী হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য **রাসবিহারী বসু ও যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়**।

রাসবিহারী বসু উত্তর ভারতে বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। তিনি দেরাদুনে বনবিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন এবং তাঁর কাজকর্ম ও আচরণ থেকে সরকার এতোটুকুও সন্দেহ করতে পারেনি যে, তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর বিপ্লবী। কলকাতা থেকে দিল্লিতে বৃটিশ ভারতের রাজধানী স্থানান্তরিত হলে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর দিল্লিতে নূতন রাজধানীর উদ্বোধন উপলক্ষে বড় লাট লর্ড হার্ডিংকে নিয়ে একটি শোভাযাত্রা বার হয়। রাসবিহারী বসু ও তাঁর সহযোগীরা লর্ড হার্ডিংকে হত্যার চেষ্টায় হার্ডিংয়ের সুসজ্জিত হাতীর ওপর বোমা ফেলেন। কিন্তু লর্ড হার্ডিং রক্ষা পান। রাসবিহারী পলায়ন করেন। তাঁর সহযোগীরা ধরা পড়েন ও তাঁদের ফাঁসি হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধলে তিনি সৈন্যবাহিনীর মধ্যেও বিদ্রোহ ঘটাবার ব্যবস্থা করেন। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারি অভ্যুত্থানের দিন স্থির হয়। তাঁর প্রধান সহকারী ছিলেন **গণেশবিষ্ণু পিংলে**। অভ্যুত্থানের পূর্বদিন লাহোর সেনানিবাসে তিনি বোমা-সহ ধরা পড়েন ; বিচারে তাঁর ফাঁসি হয় এবং সমস্ত ব্যাপারটাই জানাজানি

হয়ে যায়। রাসবিহারী বসুই যে লর্ড হার্ডিং হত্যার চেষ্টার ও এই অভ্যুত্থান ঘটাবার চেষ্টার প্রধান উদ্যোক্তা, তা প্রকাশ হয়ে পড়ে। রাসবিহারী বসু দেশে থাকা নিরাপদ নয় জেনে, ছদ্মবেশে গোপনে জাহাজে করে জাপানে পালিয়ে যান। তিনি জাপানে থেকে অবশিষ্ট জীবন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তিনি জাপানের সাহায্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রথম আজাদ হিন্দ্ সরকার ও আজাদ হিন্দ্ ফৌজ গঠন করেন।

রাসবিহারী বসুর অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই উত্তর ভারতে আর একটি অভ্যুত্থান ঘটাবার চেষ্টা হয়! এর প্রধান নায়ক ছিলেন **যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন)**। তাঁর অন্যতম প্রধান সহযোগী ছিলেন বিপ্লবী **নরেন্দ্র ভট্টাচার্য**। ইনি পরবর্তীকালে **মানবেন্দ্রনাথ রায়** নামে পরিচিত হন। প্রবাসী বিপ্লবীদের যোগাযোগে জার্মান এঁদের প্রচুর অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু, আমেরিকা থেকে জার্মানির দেওয়া গোপন অস্ত্রশস্ত্র যথাসময়ে না পৌঁছানোয় এবং এই অভ্যুত্থানের ষড়যন্ত্রের সংবাদ ইংরেজ সরকার জানতে পারায়, এই অভ্যুত্থানের চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। উড়িষ্যার বুড়ী বালাম নদীর তীরে পুলিসের সঙ্গে সংঘর্ষে যতীন্দ্রনাথ ও তাঁর সঙ্গীরা **নিহত** হন (৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৫ খ্রীঃ)।

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ সরকার **ভারত রক্ষা আইন চালু** করে এবং সামান্য সন্দেহক্রমেই বিনাবিচারে বহুলোককে বন্দী করে। এইভাবে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পথ রুদ্ধ হয়।

**হোম রুল আন্দোলন ঃ** ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক নির্বাসন দণ্ডভোগ শেষে দেশে ফিরে আসেন। তিনি এখন ভারতবর্ষের জন্য হোম রুল বা পরিপূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে মহারাষ্ট্রে আন্দোলন শুরু করেন। ইংলণ্ডের অধীন আয়ারল্যাণ্ডেও ঐরূপ হোম রুল-এর দাবিতে আন্দোলন হয়েছিল। বিখ্যাত ইংরেজ মহিলা ও ভারতপ্রেমিক **মিসেস অ্যানী বেসাণ্ট**-ও মাদ্রাজে 'হোম রুল'-এর দাবিতে আন্দোলন শুরু করেন। নরমপন্থী কংগ্রেসীরাও

হোম রুল-এর আন্দোলন সমর্থন করতে থাকেন। এইভাবে কংগ্রেসের নরমপন্থী ও চরমপন্থী পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হয়।

**মুসলিম মনোভাবে পরিবর্তন :** কংগ্রেস ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের পথ লওয়ায় ইংরেজ সরকার এদেশে মুসলমানদের তোষণের নীতি গ্রহণ করে। মুসলমানরাও ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে থাকে এবং কংগ্রেসকে হিন্দুদের প্রতিষ্ঠান বলে কংগ্রেসের কার্যের বিরোধিতা করে। কিন্তু, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় মুসলিম সম্প্রদায়ের মনোভাবে পরিবর্তন দেখা দেয়।

তুরস্কের সুলতান ছিলেন মুসলমানদের প্রধান ধর্মনেতা বা **খলিফা**। তুরস্ক জার্মানির পক্ষে ও ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামায়, ক্রমেই ইংরেজবিরোধী হয়ে উঠল। **মওলানা মহম্মদ আলি, সওকত আলী,** ডাঃ **আনসারি ও মওলানা আবুল কালাম আজাদ** প্রভৃতি মুসলিম নেতারা ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেন। তাঁরাও কংগ্রেসের মতোই স্বায়ত্তশাসনের দাবি তুললেন এবং কংগ্রেসের সঙ্গে এই দাবিতে আন্দোলনে সংকল্প করলেন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে লখ্‌নৌয়ে এই মর্মে একটি চুক্তিও হল। ইংরেজরা যুদ্ধে জয়ী হলে তুরস্কের সুলতানের প্রতি কোনও অন্যায় আচরণ করবে না, এরূপ আশ্বাস দেওয়ায় তারাও যুদ্ধকালে কংগ্রেসের মতোই ব্যাপক আন্দোলন থেকে বিরত রইল।

**শাসন-সংস্কারের আশ্বাস-দান :** ভারতবর্ষ যেমন যুদ্ধে সহযোগিতা করল, তেমনি ইংলণ্ডও যুদ্ধশেষে ভারতবর্ষের শাসন-ব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তৎকালীন ভারতসচিব মন্টেগু ও বড় লাট লর্ড চেম্বার্সফোর্ডের নাম অনুসারে ঐ প্রতিশ্রুত শাসন-সংস্কার পরে **মণ্টফোর্ড-সংস্কার** নামে পরিচিত হয়। কিন্তু এই শাসন-সংস্কার ভারতবাসীর কাছে আশানুরূপ ছিল না। অন্যপক্ষে, ইংরেজ সরকার আন্দোলন দমনের জন্য রাউলাট বিল আনে।

ভারতীয় নেতাদের মোহভঙ্গ হয়। তাঁরা আবার সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন।

## প্রশ্নাবলী

১। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ বর্ণনা কর।

২। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপকতা ও ফলাফল সম্পর্কে কি জান লিখ।

৩। 'মিত্র শক্তি' ও 'কেন্দ্রীয় শক্তি' বলতে কি বোঝ? ঐরূপ দুই শক্তি জোট কিভাবে গড়ে উঠেছিল?

৪। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংলণ্ডের সঙ্গে ভারতবর্ষের সহযোগিতা সম্পর্কে কি জান?

৫। প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে ভারতবর্ষে বিপ্লবীদের কার্যকলাপ সম্পর্কে কি জান?

৬। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারতীয় মুসলিমদের মনোভাব পরিবর্তনের কারণ কি?

৭। সংক্ষেপে উত্তর দাও:

(ক) প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কত খ্রীষ্টাব্দ থেকে কত খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চলেছিল?

(খ) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানীর সম্রাট কে ছিলেন?

(গ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কত খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ দিয়েছিল?

(ঘ) রাশিয়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে কত খ্রীষ্টাব্দে এবং কেন বিদায় নিয়েছিল?

(ঙ) জার্মানীর সঙ্গে মিত্রপক্ষের কোথায় সন্ধি হয়েছিল?

(চ) হোমরুল কি? কারা ভারতে হোমরুল আন্দোলন শুরু করেছিলেন?

---

# ত্রয়োদশ অধ্যায়

## রুশ বিপ্লব

**বিপ্লবের কারণ:** বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও ইউরোপের অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় রাশিয়া অনগ্রসর ছিল। রাশিয়ার সমস্ত জমি ছিল বড় বড় জমিদারের হাতে। চাষীদের জমি ছিল না, তারা ছিল অত্যন্ত দরিদ্র। কল-কারখানা যা ছিল, তাপ্রধানতঃ বিদেশীদের

অর্থে পরিচালিত হ'ত। ফলে শ্রমিকদের অবস্থাও খুব শোচনীয় ছিল। দেশে বেকার ও ভবঘুরের সংখ্যা ছিল অত্যধিক।

রাশিয়ার সম্রাটকে বলা হ'ত **জার**। তাঁরা ছিলেন স্বৈরাচারী, তাঁরা ইচ্ছামতো দেশ শাসন করতেন। কিন্তু ইউরোপ থেকে গণ-তান্ত্রিক আন্দোলনের ঢেউ রাশিয়াতেও এসে লেগেছিল। ফলে শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা জারের স্বেচ্ছাচার ও অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে থাকেন। দেশে সন্ত্রাসবাদী দল গড়ে ওঠে। জারের অনেক কর্মচারী এদের হাতে নিহত হয়। এরা জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারকেও হত্যা করে (১৮৮১ খ্রীঃ)। ঐ হত্যা-কাণ্ডের ফলে জনসাধারণের উপর কঠোর উৎপীড়ন চলতে থাকে।

দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের পর জার হন **তৃতীয় আলেকজাণ্ডার।** তাঁকেও হত্যা করার ষড়যন্ত্র চলতে থাকে। তৃতীয় আলেকজাণ্ডারকে হত্যার চেষ্টার অভিযোগে অনেকের প্রাণদণ্ড হয়। তাঁদের মধ্যে আলেকজাণ্ডার উলিয়ানভ নামে এক তরুণও ছিলেন। আলেকজাণ্ডার উলিয়ানভের যখন প্রাণদণ্ড হয়, তখন তাঁর ভাই ভ্লাদিমির ইলিইচ্ উলিয়ানভের বয়স মাত্র সতের বছর। ভ্লাদিমির দাদার প্রাণদণ্ডের সংবাদে অভিভূত হলেও ছাত্রাবস্থাতেই এই শপথ নেন যে, তিনি রাশিয়া থেকে জারতন্ত্র উৎখাত করবেন। এই ভ্লাদিমির ইলিইচ্ উলিয়ানভ-ই ইতিহাসে মহাবিপ্লবী লেনিন নামে অমর হয়েছেন।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে লেনিন কাজানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন সরকারী বিদ্যালয়-পরিদর্শক। লেনিন খুবই মেধাবী ও কৃতী ছাত্র ছিলেন। তিনি কৃতিত্বের সঙ্গেই আইন পাস করেন। কিন্তু ছাত্র-জীবন থেকে তিনি রাজনীতিতে অংশ নেন এবং সন্ত্রাসবাদের পথে না গিয়ে শ্রমিক, কৃষক ও জনসাধারণের দ্বারা বিপ্লব ঘটাতে সচেষ্ট হন। তিনি মার্কস্‌বাদের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন এবং মার্কস্‌বাদী পথেই বিপ্লব সংঘটনের চেষ্টা করেন। তিনি ছাত্রাবস্থাতেই বিপ্লবী কাজের অভিযোগে কারারুদ্ধ হন এবং কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়ান এবং শেষে সুইজার-

ল্যাণ্ডে আশ্রয় নেন। বিপ্লবীদের আত্মগোপনের জন্য প্রায়ই ছদ্ম-নাম ব্যবহার করতে হয়। ভ্লাদিমির উলিয়ানভ লেনিন ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন। রুশ দেশে বহু মার্কস্‌বাদী পাঠচক্র ও ছোট ছোট দল ছিল। লেনিন সেগুলিকে ঐক্যবদ্ধ ক'রে **সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি** নামে একটি বিপ্লবী দল গঠন করেছিলেন। ঐ দলের অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে লেনিনের মতভেদ হওয়ায় ঐ দল দ্বিধা বিভক্ত হয়। লেনিনের নেতৃত্বে সংখ্যাগরিষ্ঠরা **বলশেভিক** নামে পরিচিত হন এবং তাঁর বিরোধীদের নেতৃত্বে সংখ্যালঘুরা পরিচিত হন **মেনশেভিক** নামে।



লেনিন

রুশ-জাপ যুদ্ধে (১৯০৪-০৫ খ্রীঃ) পরাজয়ের ফলে রাশিয়ার দুর্বলতা প্রকট হয়ে পড়ে। দেশে প্রবল অসন্তোষ ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। কল-কাখানায় ধর্মঘট হয়। সৈন্যদলে বিদ্রোহী মনোভাব ছড়িয়ে পড়ে, গ্রামাঞ্চলেও দাঙ্গা-হাঙ্গামা দেখা দেয়। কিন্তু ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের এই বিপ্লবকে জার দমন করলেও ডুমা নামে একটি সংসদ গঠন করেন। এতে ধনিক শ্রেণীর হাতে কিছু ক্ষমতা এলেও জনসাধারণ কোনও ক্ষমতা পায় না। তাছাড়া, শাসন-ব্যাপারে ডুমার কোন কর্তৃত্ব থাকে না। ক্ষমতা থাকে জারের হাতেই। জার **দ্বিতীয় নিকোলাস** রাসপুটিন নামে এক ধূর্ত ভণ্ড সন্ন্যাসীর দ্বারা পরিচালিত হতেন। রাসপুটিনই শাসনব্যবস্থায় কর্তৃত্ব করতে থাকে। বিপ্লবী আন্দোলন কঠোর হস্তে দমন করার চেষ্টা চলে।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধ বাধলে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের পক্ষে রাশিয়া যুদ্ধে যোগ দেয়। রাশিয়ার উপযুক্ত সমরোপকরণ ছিল না। রাশিয়া

গোড়ার দিকে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে কয়েকটি যুদ্ধে জিতলেও পরে জার্মানির হাতে অস্ত্র, পোশাক ও রসদের অভাবে দলে দলে রুশ সৈন্য মরতে থাকে। সৈন্যদল জারের প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তাদের মধ্যেও বিপ্লবী মনোভাব ছড়িয়ে পড়ে। রাসপুটিনের স্বেচ্ছাচার অসহ্য হয়ে উঠেছিল। তাই সম্ভ্রান্তরা ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে রাসপুটিনকে হত্যা করে। খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব ও অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধির ফলে দেশবাসীর অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে রাজধানী পেত্রোগ্রাদে বিপ্লবী অভ্যুত্থান ঘটলে সৈন্যরাও বিপ্লবে যোগ দিল। জার দ্বিতীয় নিকোলাস সিংহাসন ত্যাগ করলেন এবং মেনশেভিক ও সোস্যালিস্ট-রিভল্যুসনারি দলের সাহায্যে ক্যাডেট দল সাময়িক সরকার গঠন করল। ক্যাডেটরা ছিল ধনিকশ্রেণীর প্রতিনিধি। তাই শাসনক্ষমতা ধনিকশ্রেণীর হাতেই গেল।

এই সময় লেনিনের নেতৃত্বাধীন বলশেভিক পার্টির প্রাধান্য ছিল না। দেশে এইসময় বহু শ্রমিক ও সৈনিকদের সোভিয়েট বা পঞ্চায়েত গঠিত হয়েছিল। বলশেভিকরা নিজেদের আদর্শ ও কর্মসূচীর ভিত্তিতে দ্রুত সোভিয়েটগুলিতে প্রাধান্য বিস্তার করল। সাময়িক সরকার কোনও সমস্যার সমাধান করতে না পারায় জনসাধারণ বিরক্ত হ'ল। যুদ্ধ ত্যাগ না করায় সৈনিকরাও ক্রুদ্ধ হ'ল। এই সময় রাজতন্ত্রী জেনারেল কর্নিলভ সাময়িক সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে নিরুপায় হয়ে সাময়িক সরকার বলশেভিকদের সাহায্য চাইল। বলশেভিকরা এই বিদ্রোহ দমন করল এবং অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠল। এখন ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে হঠাৎ লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিকরা অভ্যুত্থান ঘটালো এবং সাময়িক সরকারকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করল। এইভাবে সোভিয়েট বিপ্লব বা নভেম্বর বিপ্লব সংঘটিত হ'ল। বলশেভিকরা শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হলেন।

লেনিন যুদ্ধ বন্ধ, কৃষকদের মধ্যে ভূমি বন্টন, কল-কারখানায় শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ, কাজের সময় হ্রাস ও বেতন বৃদ্ধি, ভূ-সম্পত্তির

জাতীয়করণ প্রভৃতির নীতি ঘোষণা করলেন। এইভাবে সোভিয়েট সরকার সৈনিক, শ্রমিক, কৃষক ও সাধারণ মানুষের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা পেল। সোভিয়েট সরকার ব্রেট্-লিটভ্স্কের সন্ধি অনুসারে যুদ্ধ থেকে বিদায় নিল। দেশের সম্ভ্রান্ত ও ধনী ব্যক্তিরা অনেকে দেশ ছেড়ে পালাল। অনেকে সোভিয়েট সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবিপ্লব সংগঠিত ক'রে বহু স্থানে বিদ্রোহ ঘটালো। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান প্রভৃতি যুদ্ধ থেকে রাশিয়ার হঠাৎ বিদায় নেওয়ায় এবং পৃথিবীতে একটি সাম্যবাদী রাষ্ট্রের বাস্তবিক প্রতিষ্ঠা ঘটায় সন্তুষ্ট হয়নি। তারাও বিভিন্ন দিক থেকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাল। উত্তর-পশ্চিমে মূরমান্স্ক ও আর্কএঞ্জেলে বৃটিশ, পশ্চিমে পোল, দক্ষিণে ফরাসী ও রুমানীয়, গ্রীক ও চেক এবং পূর্বে জাপ সৈন্যবাহিনী রাশিয়াকে আক্রমণ করল। সেই সঙ্গে রাশিয়ার জারের আমলের কলচাক, দেনিকিন, ইউদেনিচ, র‍্যাঙ্গেল প্রভৃতি কুখ্যাত জেনারেলরা বিপ্লবীদের দমনে অগ্রসর হ'ল। লেনিনের নেতৃত্বে সোভিয়েট সরকার ও বলশেভিকরা বিপ্লবী সৈনিক, শ্রমিক, কৃষক ও জনসাধারণের সাহায্যে এই গৃহযুদ্ধ ও বহিরাক্রমণ দমন করলেন।


স্টালিন

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে সোস্যাল রিভল্যুসনারি দলের এক আততায়িনীর গুলিতে লেনিন আহত হলেন। এই অবস্থাতেই তিনি দেশগঠনের কাজ চালিয়ে গেলেন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ায় বলশেভিকদের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হ'ল। গৃহযুদ্ধ, বহিরাক্রমণ ও অনাবৃষ্টির ফলে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে দেশে ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। লেনিনের

নেতৃত্বে বলশেভিকরা এই সমস্যার সমাধান করলেন। বিদেশী রাষ্ট্রগুলিও একে একে সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রকে স্বীকৃতি ও সাহায্য দিয়ে মিত্রতা করল। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রের সংবিধান রচিত হ'ল। ঐ সংবিধান অনুসারে সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রের নাম হ'ল **সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক প্রজাতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্র,** সংক্ষেপে সোভিয়েট ইউনিয়ন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে লেনিনের মৃত্যু হয়। এখন সোভিয়েট রাষ্ট্র-পরিচালনার ভার পড়ে লেনিনের অনুগামী **স্টালিনের** ওপর। স্টালিন-ও ছদ্মনাম। তাঁর প্রকৃত নাম **জোসেফ জুগাস**ভিলি।

**সোভিয়েট বিপ্লবের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া ঃ** সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা, যা এতদিন মানবতাবাদী মনীষীদের স্বপ্ন ও কল্পনা ছিল, তা সোভিয়েট বিপ্লবের দ্বারা বাস্তবে পরিণত হ'ল। ফলে মার্কস্‌বাদী বিপ্লবী চিন্তাধারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত ও মেহনতী মানুষকে অনুপ্রাণিত করল এবং নিজ শক্তি সম্পর্কে সচেতন ক'রে তুলল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-শেষে ইউরোপের কোন কোন দেশে—যেমন, জার্মানি ও ইটালিতে—সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও হয়। অবশ্য, নানা কারণে, বিশেষতঃ মেনশেভিক, সোস্যাল-ডেমোক্র্যাট, কমিউনিস্ট প্রভৃতি দলগুলি ঐক্যবদ্ধ হতে না পারায় সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। অবশ্য, মার্ক্‌স্‌বাদী আন্দোলন দ্রুত প্রসার লাভ করে এবং পৃথিবীর বহু দেশে সোভিয়েট ইউনিয়নের আদর্শে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়।

সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার ফলে ধনতান্ত্রিক দেশগুলি শ্রমিক, কৃষক ও জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ বিপ্লবী শক্তি সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। অনেক ক্ষেত্রে তারা শ্রমিক, কৃষক ও মেহনতী মানুষের অবস্থার কিছু উন্নতি ঘটিয়ে তাদের সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করে। অনেক স্থলে তারা শ্রমিক, কৃষক ও মেহনতী মানুষ যাতে সংঘবদ্ধ হ'তে না পারে, সেদিকে লক্ষ্য দেয় এবং কঠোর দমননীতি চালাতে থাকে। জার্মানি, ইটালি, স্পেন, জাপান প্রভৃতি দেশে ফাসিবাদ ও নাৎসিবাদ উদ্ভবের ফলে তাদের ধর্মঘটের সাধারণ অধিকার পর্যন্ত কেড়ে নেওয়া হয়।

## প্রশ্নাবলী

১। বিপ্লবপূর্ব রাশিয়ার অবস্থা বর্ণনা কর।

২। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাশিয়ায় বিপ্লব প্রচেষ্টার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৩। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ ও নভেম্বর বিপ্লবের বিবরণ দাও।

৪। সোভিয়েট বিপ্লবের পরে রাশিয়ায় গৃহযুদ্ধ ও বহিরাক্রমণ সম্পর্কে যা জান সংক্ষেপে লিখ।

৫। লেনিনের বিপ্লবী-জীবন সম্পর্কে যা জান লিখ।

৬। সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) বলশেভিক বলতে কি বোঝ ? বলশেভিক কেন বলা হয় ?

(খ) সোভিয়েট শব্দের অর্থ কি ?

(গ) লেনিনের প্রকৃত নাম কি ?

(ঘ) রাশিয়া কখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে বিদায় নেয় ?

(ঙ) সোভিয়েট ইউনিয়নের পুরো নাম কি ?

(চ) কত খ্রীষ্টাব্দে লেনিনের মৃত্যু হয় ?

(ছ) লেনিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েট রাষ্ট্র পরিচালনার ভার কে নেন ?

(জ) স্টালিনের প্রকৃত নাম কি ?

---

# চতুর্দশ অধ্যায়

# ইউরোপ ( ১৯১৯—১৯৩৯ খ্রীঃ )

**প্যারিসের শান্তি-সম্মেলন ও ইউরোপের পুনর্গঠন :** ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে ভার্সাইয়ের সন্ধি অনুসারে জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধ-বিরতি হয়। অতঃপর যুদ্ধে পরাজিত দেশগুলির সঙ্গে সন্ধির শর্তাদি আলোচনার জন্য প্যারিসে শান্তি সম্মেলন বসে (১৯১৯ খ্রীঃ)। এই সম্মেলনে বত্রিশটি দেশ যোগ দিলেও মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট **উড্রো উইলসন,** ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী **লয়েড জর্জ,** ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী ক্লেমাঁসো ও ইটালির প্রধানমন্ত্রী অর্ল্যাণ্ডো প্রধান ভূমিকা

নেন। প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন স্থায়ী শান্তি-প্রতিষ্ঠার জন্য ১৪ দফা প্রস্তাব দেন। এতে জার্মান-অধিকৃত অঞ্চল থেকে জার্মান বাহিনীর অপসারণ, ফ্রান্সকে আলসাস-লরেন প্রত্যর্পণ, পোল্যাণ্ডকে স্বাধীনতা দান এবং বল্‌কান (দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপীয়) রাষ্ট্রগুলি, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি ও ইটালির জাতীয়তাবাদী নীতির ভিত্তিতে পুনর্বিন্যাস, গোপন চুক্তি নিষিদ্ধকরণ, সমুদ্রে সকলের সমান অধিকার, অস্ত্রহ্রাস, জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু কেমাঁসো, লয়েড জর্জ ও অর্ল্যাণ্ডো এতটা উদার নীতির পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁরা পরাজিতের কঠোর শাস্তি এবং বিজয়ীর পুরস্কার ও ক্ষতিপূরণ ইত্যাদির উপরই জোর দিলেন। জার্মানী, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, বুলগেরিয়া ও তুরস্কের সঙ্গে পৃথক পাঁচটি সন্ধি করা হ'ল।

**ইউরোপের পুনর্গঠন ঃ** ভার্সাইয়ের সন্ধি (১৯১৯ খ্রীঃ) অনুসারে জার্মানী ফ্রান্সকে আলসাস-লরেন, বেলজিয়ামকে প্রাশিয়ার কিছু অংশ এবং পোল্যাণ্ডকে প্রাশিয়ার ও পোসেনের কিছু অংশ ছেড়ে দিতে বাধ্য হ'ল। জার্মানীর এক লক্ষের বেশি সৈন্য রাখা ও সৈন্যবাহিনীতে বাধ্যতামূলক যোগদান নিষিদ্ধ হ'ল। তার কামান ও যুদ্ধজাহাজের আকার ও সংখ্যা কমানো হ'ল। তাকে প্রচুর পরিমাণে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা হ'ল। ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও ইটালিকে সে কয়লা সরবরাহ করতে বাধ্য থাকল। এখন জার্মানীর আকার ও আয়তন হ্রাস পেল।

অস্ট্রিয়ার সঙ্গে সন্ধি অনুসারে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি সাম্রাজ্যকে ভেঙে দিয়ে অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, চেকোস্লোভাকিয়া ও যুগোস্লাভিয়া রাজ্যগুলি গঠিত হ'ল। অস্ট্রিয়া ভিয়েনা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল নিয়ে একটি ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত হ'ল। রুমানিয়ার আয়তন কিছু বাড়ল। পোল্যাণ্ড রাশিয়া, জার্মানী ও অস্ট্রিয়ার কিছু অঞ্চল পেয়ে একটি স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হ'ল। বুলগেরিয়ার আয়তন অনেক কমল। গ্রীস বুলগেরিয়ার কিছু অঞ্চল পেল। বিজয়ী দেশ হিসাবে ইটালির আয়তন কিছু বাড়লেও ফিউম বন্দর না পাওয়ায় সে অসন্তুষ্ট হ'ল।

ইউরোপে কনস্টান্টিনোপল ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ছাড়া তুরস্কের কিছুই রইল না। ফিনল্যাণ্ড, লুথিয়ানিয়া, ল্যাটভিয়া ও এস্টোনিয়া রাজ্যগুলি গঠিত হ'ল।

বহু রাষ্ট্র তাদের পূর্ব অধিকার হারাল। যেসব রাষ্ট্র নূতন অঞ্চল পেল, তারাও যথেষ্ট পেল না বলে অসন্তুষ্ট হ'ল। এর ফলে ইউরোপে স্থায়ী শান্তি স্থাপিত হ'ল না। এর ফলে বিশ বছরের মধ্যেই আর একটি বিশ্বযুদ্ধ ঘটল।

**ইটালিতে ফাসিবাদের উদ্ভব ঃ** প্যারিসের সন্ধি অনুসারে ইটালি কিছু অঞ্চল পেলেও ফিউম বন্দর না পাওয়ায় অসন্তুষ্ট হয়েছিল। অন্যপক্ষে যুদ্ধের জন্য ইটালিতে অর্থসংকট দেখা দিয়েছিল। যুদ্ধে ইটালির প্রায় সাত লক্ষ লোক মারা গিয়েছিল। তাই ইটালীয়দের মধ্যে প্রচণ্ড অসন্তোষ ও বিক্ষোভ এবং দেশে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দেখা দিয়েছিল। দেশের যখন এই অবস্থা তখন ইটালিতে **বেনিটো মুসোলিনির** নেতৃত্বে **ফাসিবাদী** নামে পরিচিত একটি রাজনৈতিক দলের উদ্ভব হয়। মুসোলিনি ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ইটালির একটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথম জীবনে সমাজ-তন্ত্রী ও শান্তিবাদী ছিলেন। কিন্তু পরে সমাজতন্ত্র ও শান্তির ঘোর শত্রু হয়ে ওঠেন এবং ফাসিবাদের প্রবর্তন করেন। এক গোছা লাঠির মধ্যে বাঁধা একটি শাণিত কুঠার ছিল রোম সাম্রাজ্যের শাসনকর্তৃত্বের প্রতীক। তাকে বলা হ'ত **ফাসেস**। ঐ প্রতীক-চিহ্ন ব্যবহার করায় মুসোলিনির দল ফাসিস্ট বা ফাসিবাদী নামে পরিচিত হয়।


মুসোলিনি

ফাসিবাদ গণতন্ত্রের বিরোধী হওয়ায় স্বৈরতন্ত্রী। সকল মানুষের

রাজনৈতিক বুদ্ধি সমান নয়, সকলের ভোটে শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলা ও জনসাধারণের ইচ্ছা অনুসারে শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করা অর্থহীন। যেমন সকলের রাজনৈতিক বুদ্ধি সমান নয়, তেমনি অর্থনৈতিক বুদ্ধিও সমান নয়। সুতরাং সমাজে ধনী-দরিদ্র থাকবেই এবং সমাজতন্ত্র অর্থহীন। সকল জাতি বুদ্ধিতে ও শক্তিতে সমান নয়, অধিক বুদ্ধিমান ও শক্তিমান জাতি কম শক্তিমান ও কম বুদ্ধিমান জাতিকে শাসন করাই স্বাভাবিক। এইভাবে ফাসিবাদ স্বৈরতন্ত্র, ধনতন্ত্র, যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদে বিশ্বাসী।

যুদ্ধের পরে ইটালিতে সোস্যালিস্ট ও কমিউনিস্টরা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে ; কিন্তু তা ব্যর্থ হয়। ইটালিতে সমাজতন্ত্রীরা দুর্বল হয়ে পড়ে। সেই সুযোগে ফাসিস্ট দল শক্তি সঞ্চয় করে এবং দেশের সর্বত্র ফাসিস্ট সংগঠন গড়ে ওঠে। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের নির্বাচনে তারা ইটালিতে অনেকগুলি আসন পায়। ঐ বৎসরের শেষভাগে ফাসিস্ট দল মুসোলিনিকে তাদের একাধিনায়ক ব'লে ঘোষণা করে। ফাসিস্ট দল দেশের সর্বত্র সন্ত্রাস সৃষ্টি ক'রে জনসাধারণের সমর্থন ও আনুগত্য আদায় করে। বিরুদ্ধবাদীদের খুন-জখম করে এবং তাদের সংগঠন ভেঙে দেয়। ফাসিস্ট দল রাজা ভিক্টর ইমানুয়েলকে তাঁর মন্ত্রিসভা বাতিল ক'রে মুসোলিনির নেতৃত্বে নূতন মন্ত্রিসভা গঠনে বাধ্য করে। তারপর ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে নূতন সংবিধান ও নির্বাচন-পদ্ধতির দ্বারা মুসোলিনির নেতৃতে ফাসিস্ট দল দেশ-শাসনের সর্বময় কর্তৃত্ব অধিকার করে।

মুসোলিনি কৃষি ও শিল্পকে সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনলেন এবং তাতে কিছু কিছু উন্নতি ঘটালেন। অস্ত্রসজ্জা, পথঘাট, খাল-নালা প্রভৃতির পরিকল্পনা নিয়ে বহু বেকার শ্রমিককে কাজ দেওয়া হ'ল। সৈন্যবাহিনী বাড়িয়ে বহু তরুণকে চাকরি দেওয়া হ'ল। অস্ত্রসজ্জা ও সৈন্যবাহিনী বৃদ্ধির ফলে মুসোলিনি শীঘ্র সাম্রাজ্যবাদের পথে পা দিলেন। তিনি উত্তর আফ্রিকার আবিসিনিয়া রাজ্য আক্রমণ করলেন এবং বোমা ও বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার করে আবিসিনিয়া অধিকার

করলেন ( ১৯৩৬ খ্রীঃ )। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আলবেনিয়া অধিকার করলেন।

**জার্মানীতে নাৎসীবাদের উদ্ভব ঃ** ইটালির মতো জার্মানীতেও ফাসিবাদের উদ্ভব হ'ল। তবে এর নাম দেওয়া হয়েছিল ন্যাশন্যাল সোস্যালিজ্‌ম্, সংক্ষেপে **নাৎসীবাদ**। নাৎসীবাদও ফাসিবাদের মতোই স্বৈরতন্ত্র, ধনতন্ত্র, যুদ্ধ, সাম্রাজ্যবাদ ও একনায়কতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও শান্তির শত্রু।

ইটালির চেয়ে জার্মানীতে অসন্তোষ ছিল অনেক বেশি। তার অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল আরও শোচনীয়। ভার্সাই সন্ধির শর্তগুলি জার্মানীর প্রতি অত্যন্ত কঠোর ও অপমানজনক হয়েছিল। এখানেও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয়েছিল এবং সোস্যালিস্ট ও কমিউনিস্টদের মতবিরোধের ফলে তা ব্যর্থ হয়েছিল। এই সুযোগে জার্মানীতে নাৎসীবাদের উদ্ভব হ'ল। নাৎসীবাদের অভ্যুত্থান ঘটেছিল **এডলফ্ হিটলার** নামে এক ব্যক্তির নেতৃত্বে।


এডলফ্ হিট্‌লার

এডল্‌ফ্ হিটলার অস্ট্রিয়ায় ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথম জীবনে ছবি আঁকতেন এবং প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের সময়ে জর্মান বাহিনীতে যোগ দেন। যখন ভার্সাইয়ের সন্ধি হয়, তখন তিনি আহত অবস্থায় হাসপাতালে ছিলেন। তিনি হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এসে সৈনিকের ছিন্ন ও মলিন পোশাকেই ঘুরে বেড়াতে লাগলেন এবং সুযোগ পেলেই হোটেলে, রেস্তরাঁয়, রাস্তার মোড়ে ভার্সাইয়ের সন্ধির অন্যায় অবিচায় সম্পর্কে বলতে লাগলেন। তিনি বলতে লাগলেন, জার্মানীর পরাজয়ের জন্য ইহুদী আর কমিউনিস্টরাই দায়ী। এরাই দেশের প্রকৃত শত্রু। তিনি একথাও বললেন, জার্মান জাতি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি, এরাই প্রকৃত আর্য জাতি, মানব সভ্যতার যা কিছু শ্রেষ্ঠ,

তা আর্যরাই করেছে। জার্মানরা শ্রেষ্ঠ জাতি, সুতরাং তাদের অপর জাতিকে শাসন করার সম্পূর্ণ অধিকার আছে।

যুদ্ধ-বিধ্বস্ত জার্মানীর জনসাধারণের মনে গভীর নৈরাশ্যবোধ এসেছিল। তাঁর এইসব কথা তাদের মনে আশার সঞ্চার করল। দেখতে দেখতে হিটলারের সমর্থক জুটতে লাগল। হিটলার একটি রাজনৈতিক দল গঠন করলেন। তিনি এই দলের নাম দিলেন **ন্যাশন্যাল সোস্যালিস্ট দল,** সংক্ষেপে নাৎসীদল। নাৎসীদল ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠল। অবশেষে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে হিটলার জার্মানীর চ্যান্সেলার বা প্রধানমন্ত্রী হলেন। তিনি কমিউনিস্ট ও সোস্যাল-ডেমক্র্যাটদের হত্যা করলেন। ইহুদীদের হত্যা বা বিতাড়িত করলেন। পর বৎসর তিনি জার্মানীর শাসনকর্তৃত্বের একমাত্র অধিকারী বা একনায়ক হলেন।

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভার্সাই সন্ধির চুক্তি অমান্য ক'রে আবার অস্ত্রসজ্জা ও বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার নীতি ঘোষণা করলেন। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রকে ধ্বংস করাই তাঁর অস্ত্রসজ্জা ও সামরিক শক্তি-বৃদ্ধির উদ্দেশ্য বলে তিনি প্রচার করলেন। তাই ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ তাঁকে বাধা দিল না।

ইটালির মতোই শহর-পরিকল্পনা, ঘরবাড়ি, পথঘাট-নির্মাণ, খাল-নালা খনন প্রভৃতি কাজে বহু লোককে চাকরি দিলেন। সৈন্য-বাহিনীতেও বহু লোক চাকরি পেল। বহু কলকারখানা গড়ে তুললেন, ব্যবসা-বাণিজ্যেরও উন্নতি করলেন। নাৎসী পার্টি দেশে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করল।

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইটালির সঙ্গে জার্মানীর মৈত্রী-চুক্তি এবং জাপানের সঙ্গে কমিউনিস্ট বিরোধী এক চুক্তি করলেন। এইভাবে জার্মানী, ইটালি ও জাপানকে নিয়ে একটি শক্তিজোট তৈরি হ'ল। এই জোট **অক্ষশক্তি** নামে পরিচিত।

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে হিটলার অস্ট্রিয়া অধিকার ক'রে নিলেন। পর বৎসর চেকোস্লোভাকিয়া অধিকার করলেন।

সোভিয়েট ইউনিয়ন জার্মানীর সাম্রাজ্যবাদী নীতি সম্পর্কে ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশগুলিকে বার বার সচেতন ক'রে দিল। কিন্তু সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রকে ধ্বংস করাই তাঁর উদ্দেশ্য, হিটলার এই কথা বার বার প্রচার করায় ইংলণ্ড ও ফ্রান্স সোভিয়েট ইউনিয়নের সতর্কবাণীতে কর্ণপাত করল না। হিটলারের সম্বন্ধে তোষণ-নীতি অবলম্বন করল। এই সুযোগে হিটলার জার্মানীকে সামরিক দিক থেকে আরও শক্তিশালী ক'রে তুললেন।

**জাতিসংঘ :** যুদ্ধের ফলে অসংখ্য মানুষের মৃত্যু, বিপুল ধন-সম্পত্তির ধ্বংস এবং মানুষের দুঃখ-দুর্দশা মানুষকে স্থায়ী শান্তির জন্য ব্যাকুল করে তুলেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট **উড্রো উইলসন** তাঁর ১৪ দফা দাবিতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা, ভবিষ্যতে যুদ্ধ নিবারণ এবং রাষ্ট্রগুলির বিরোধ মীমাংসার জন্য **লীগ অব নেশন্স্ বা জাতিসংঘ** প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাব অনুযায়ী ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠা হয়। এর সদর কার্যালয় হয় সুইজারল্যাণ্ডের জেনেভা। প্রথমে ৪২টি রাষ্ট্র নিয়ে জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠা হয়। পরে এর সদস্যসংখ্যা ৬০-এর বেশি হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসনের প্রস্তাব অনুসারে জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠা হ'লেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এতে যোগ দেয় নি। জাতিসংঘের দুর্বলতার এটি একটি প্রধান কারণ। দি হেগে একটি আন্তর্জাতিক আদালতও প্রতিষ্ঠিত হয়। এর কাজ ছিল বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধের বিচার করা। অর্থনৈতিক ও শ্রমিক-সমস্যা সমাধানের জন্য একটি আন্তর্জাতিক শ্রমিকসংঘও প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিশ্বে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য জাতিসংঘ চেষ্টা করে। কিন্তু শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি নিজ নিজ স্বার্থরক্ষার জন্য জাতিসংঘের নীতি ও নির্দেশ অমান্য করায় জাতিসংঘের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে জাপান মাঞ্চুরিয়া বা ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ইটালি আবিসিনিয়া আক্রমণ করলে জাতিসংঘ তার সমালোচনা ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানী ও জাপান জাতিসংঘ

ত্যাগ করে। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের পর ইটালি আর জাতিসংঘের অধিবেশনে যোগ দেয় না। এইভাবে জাতিসংঘ নামমাত্র প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

## প্রশ্নাবলী

১। প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে কারা যোগ দিয়েছিল এবং কি কি নীতি ঘোষিত হয়েছিল ?

২। উড্রো উইলসন কে ? তাঁর চৌদ্দ দফা প্রস্তাব সম্পর্কে কি জান ?

৩। প্যারিসে শান্তি সম্মেলনের ফলে যেসব সন্ধি হয়েছিল, সেগুলির ফলে ইউরোপের রাজ্যগুলি কিভাবে পুনর্গঠিত হয়েছিল ?

৪। ফাসিবাদ কি ? কেন ফাসিবাদ বলা হয় ? প্রথমে ফাসিবাদের অভ্যুত্থান কিভাবে ইটালিতে হয় ?

৫। জার্মানীতে নাৎসীবাদের অভ্যুত্থান সম্পর্কে কি জান লিখ ?

৬। জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠা ও তার ব্যর্থতা সম্পর্কে কি জান ?

৭। সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর শান্তি সম্মেলন কোথায় ও কত খ্রীষ্টাব্দে হয়েছিল ?

(খ) ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে কে কে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন ?

(গ) কার প্রস্তাব অনুসারে জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ?

(ঘ) কত খ্রীষ্টাব্দে ইটালি আবিসিনিয়া অধিকার করেছিল ?

(ঙ) কত খ্রীষ্টাব্দে জার্মানী, অষ্ট্রিয়া ও চেকোস্লোভাকিয়া অধিকার করেছিল ?

(চ) কত খ্রীষ্টাব্দে হিটলার জার্মানীর চ্যান্সেলর হয়েছিলেন ?

(ছ) কোন্ কোন্ রাষ্ট্র নিয়ে অক্ষশক্তি গঠিত হয়েছিল ?

## পঞ্চদশ অধ্যায়

# দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

নাৎসী জার্মানী যুদ্ধের জন্যই প্রস্তুতি হচ্ছিল এবং ভার্সাই সন্ধির মাত্র বিশ বৎসরের মধ্যে সামরিক শক্তিতে দুর্ধর্ষ হয়ে উঠেছিল এবং ইটালি ও জাপানের সঙ্গে মৈত্রী করেছিল। জাপান প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্র পক্ষে যোগ দিয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধের পর বিজয়ী রাষ্ট্ররূপে চীনের শানটুং ছাড়া আর কিছুই সে পায় নি। তাই সে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছিল। দেশে ইটালি ও জার্মানীর অনুসরণে ফাসিবাদ প্রবর্তন করেছিল এবং একটি উগ্র সাম্রাজ্যবাদী দেশরূপে দেখা দিয়েছিল।

জার্মানী, ইটালি ও জাপানের এই যুদ্ধ প্রস্তুতি কমিউনিজ্‌ম্ ও ওকমিউনিস্ট সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে হচ্ছে, এই ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি তোষণ নীতি অবলম্বন করেছিল। কিন্তু পোল্যাণ্ডে অবস্থিত ডানজিগ বন্দর নিয়ে পোল্যাণ্ডের সঙ্গে জার্মানীর বিরোধ বাধল। জার্মানী ডানজিগ অধিকার করতে চাইলে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স পোল্যাণ্ডের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তি করল এবং সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিল যে, জার্মানী যদি ডানজিগ অধিকারের চেষ্টা করে, তবে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স তার প্রতিরোধ করবে। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে হিটলার হঠাৎ ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে অনাক্রমণ-চুক্তি করলেন। কেবল কমিউনিজমের বিরোধিতা নয়, সাম্রাজ্যবিস্তারই যে হিটলারের লক্ষ্য, তা এখন সুস্পষ্ট হয়ে উঠল।

সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি ক'রেই হিটলার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করলেন (১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ খ্রীঃ)। পোল্যাণ্ডের সঙ্গে মৈত্র-চুক্তি অনুসারে ৩রা সেপ্টেম্বর ইংলণ্ড ও ফ্রান্স জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। জার্মানী 'বিদ্যুৎ বেগে আক্রমণ ও অধিকারে'র কৌশল অবলম্বন ক'রে কয়েকদিনের মধ্যেই পশ্চিম পোল্যাণ্ড অধিকার ক'রে নিল। সোভিয়েট ইউনিয়ন পূর্ব পোল্যাণ্ড

অধিকার করল। হিটলার দ্রুত ডেনমার্ক, নরওয়ে ও সুইডেন অধিকার ক'রে নিলেন। তারপর নাৎসী বাহিনী ঝটিকা বেগে হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামের মধ্য দিয়ে ফ্রান্সে ঢুকে পড়ল। এখন ইটালিও ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল (১৯৪০ খ্রীঃ)। কয়েক দিনের মধ্যে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস ও সমগ্র উত্তর ফ্রান্স জার্মানীর অধিকারে গেল। ফ্রান্সের সৈন্যবাহিনী ও নৌবহর জার্মানীর অধিকারে গেল। এখন একা ইংলণ্ডকে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাতে হ'ল। হিটলার প্রচণ্ড বিমান আক্রমণে বৃটেনের শহর, বন্দর, কল-কারখানা, পথঘাট, যোগাযোগ-ব্যবস্থা ধ্বংস ক'রে দিতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু ইংলণ্ড পরাজয় স্বীকার করল না। নূতন প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল ঘোষণা করলেন, ইংলণ্ড ধ্বংস হবে, তবু পরাজয় স্বীকার করবে না। ইংলণ্ডের নৌবহর ও ট্যাঙ্ক বাহিনী আফ্রিকায়, গ্রীসে ও ভূমধ্যসাগরে ইটালি ও জার্মানীর সঙ্গে প্রচণ্ড সংগ্রাম চালাল। জাপান এই সুযোগে চীনে ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য অগ্রসর হ'ল। জাপান এজন্য ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি করল।



উইনস্টন চার্চিল

হিটলার এই সময়ে একটি প্রকাণ্ড ভুল করলেন। তিনি ভেবেছিলেন, দুর্বল সোভিয়েট ইউনিয়নকে দ্রুত আক্রমণে পরাজিত ক'রে তার কল-কারখানা, খনি ও কৃষিক্ষেত্র নিজের কাজে লাগাবেন। তাই তিনি ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে হঠাৎ সোভিয়েট ইউনিয়ন আক্রমণ করলেন। কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়ন এই আক্রমণের জন্য

প্রস্তুতই ছিল। নেপোলিয়নের সময়ে রাশিয়া যা করেছিল, সোভিয়েট সরকার-ও তাই করলেন। পোড়া মাটির নীতি অনুসরণ ক'রে কল-কারখানাসহ দ্রুত পশ্চাদপসারণ ক'রে নাৎসী বাহিনীকে দেশের অভ্যন্তরে টেনে আনলেন। তারপর সোভিয়েট বাহিনী লেনিনগ্রাদ, মস্কো, রস্তভ ও স্তালিনগ্রাদে প্রচণ্ড বিক্রমে জার্মান বাহিনীর প্রতিরোধ করল। গেরিলা ও বিমান আক্রমণে জার্মান বাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। এখন জার্মানীকে দক্ষিণ ইংলণ্ড ও উত্তরে সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হ'ল।

গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ফাসিবাদের এই বর্বর আক্রমণ মাকিন যুক্ত-রাষ্ট্রকে সচেতন ক'রে তুলেছিল। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী **উইনস্টন চার্চিল** ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট **ফ্রাংক্লিন রুজভেল্ট** নিউফাউণ্ড-ল্যাণ্ডের অদূরে একটি জাহাজে মিলিত হয়ে পৃথিবীর জাতি-সমূহের স্বাধীনতা, স্বাধিকার ও ভবিষ্যৎ শান্তি প্রতিষ্ঠার কয়েকটি মূলনীতি ঘোষণা করলেন। এই মূলনীতিগুলি **আটলাণ্টিক সনদ** নামে পরিচিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্রুত সামরিক সজ্জা চালিয়েছিল এবং ফাসিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'ল।


ফ্রাংকৃলিন রুজভেল্ট

জাপানের নৌ-সেনাপতি **তোজো** ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। তিনি প্রশান্ত মহাসাগরে জাপ নৌবহরের ব্যাপক সমাবেশ ও আনাগোনা ঘটালে রুজভেল্ট তার প্রতিবাদ জানালেন। কিন্তু জাপান সে প্রতিবাদে কর্ণপাত না ক'রে পার্ল হারবারে মার্কিন নৌবহরের উপর আক্রমণ চালাল (ডিসেম্বর, ১৯৪১ খ্রীঃ)। ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। এইভাবে

ইউরোপে, আফ্রিকায়, এশিয়ায়, আমেরিকায়, সারা বিশ্বে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ল।

যুদ্ধ চলল কল-কারখানায়, কৃষিক্ষেত্রে, বিজ্ঞানীর গবেষণাগারে। বহু ভয়ংকর মারণাস্ত্র ও ক্ষেপণাস্ত্র আবিষ্কৃত হ'ল। আরও ভয়ংকর মারণাস্ত্র ও ক্ষেপণাস্ত্র আবিষ্কারের জন্য গবেষণা চলল। ভয়ংকরতায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পৃথিবীর সকল যুদ্ধকে ছাড়িয়ে গেল।

১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দেও অক্ষশক্তি প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ করল। কিন্তু ইংলণ্ড, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তাদের মিত্র রাষ্ট্র-গুলির মিলিত চেষ্টার বিরুদ্ধে ক্রমেই তারা দুর্বল হয়ে পড়ল। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে মিত্রশক্তি আফ্রিকায় চূড়ান্তভাবে অক্ষশক্তিকে পরাজিত করল। নাৎসী বাহিনী স্তালিনগ্রাদে আত্মসমর্পণ করল। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে সোভিয়েট বাহিনী বিভিন্ন রণক্ষেত্রে নাৎসী বাহিনীকে পরাজিত ক'রে পোল্যাণ্ডে এসে পেঁীছল। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি ইটালি আত্মসমর্পণ করল। মুসোলিনি ইটালির জনতার হস্তে ছিন্নভিন্ন হয়ে নিহত হলেন। সোভিয়েট বাহিনীর অগ্রগতির ফলে রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, যুগোস্লাভিয়া, আলবেনিয়া, হাঙ্গেরি প্রভৃতি দেশে নাৎসীবিরোধী প্রতিরোধ প্রবল হয়ে উঠল এবং নাৎসী বাহিনী ঐসব স্থান থেকে বিতাড়িত হ'ল। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়ন যুক্তভাবে জার্মানীকে আক্রমণ করল। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে সোভিয়েট বাহিনী জার্মানীর রাজধানী বার্লিন ঘিরে ফেললে, হিটলার আত্মহত্যা করলেন। জার্মানী আত্মসমর্পণ করল ( মে, ১৯৪৫ খ্রীঃ )।

জাপান তবুও যুদ্ধ বন্ধ করল না। এই সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আণবিক বোমা আবিষ্কার করেছিল। ৬ই ও ৯ই আগস্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকির ওপর আণবিক বোমা ফেলে শহর দুটিকে উড়িয়ে দিল। ফলে জাপান আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হ'ল। এইভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হ'ল।

## প্রশ্নাবলী

১। কিভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘোষিত হ'ল ?

২। জার্মানীর সোভিয়েট আক্রমণ পর্যন্ত যুদ্ধের বিবরণ দাও।

৩। হিটলার যুদ্ধের সময়ে কি ভুল করেছিলেন ? তার ফল কি হয়েছিল ?

৪। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেন ও কিভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগ দিয়েছিল ?

৫। ইটালি ও জার্মানীর আত্মসমর্পণ সম্পর্কে যা জান লেখ।

৬। জাপানের আত্মসমর্পণ সম্পর্কে যা জান লেখ।

৭। সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) ইংলণ্ড ও ফ্রান্স জার্মানীর বিরুদ্ধে কেন যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল ?

(খ) সোভিয়েট ইউনিয়ন নাৎসী জার্মানীর সঙ্গে কেন অনাক্রমণ চুক্তি করেছিল ?

(গ) কত খ্রীষ্টাব্দে হিটলার সোভিয়েট ইউনিয়ন আক্রমণ করেছিলেন ?

(ঘ) কত খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগ দিয়েছিল ?

(ঙ) কিভাবে মুসোলিনীর মৃত্যু হয়েছিল ?

(চ) কিভাবে হিটলারের মৃত্যু হয়েছিল ?

(ছ) আটলাণ্টিক সনদ কি ?

(জ) কোথায় কোন্ রাষ্ট্র সর্বপ্রথম আণবিক বোমা ফেলেছিল ?

(ঝ) কত থেকে কত খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলেছিল ?

---

## ষোড়শ অধ্যায়

## ভারতবর্ষ ( ১৯১৪—১৯৪৭ খ্রীঃ )

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধল। ভারতীয় রাজনীতিতে আবার জোয়ার এল। লোকমান্য তিলক এতদিন মান্দালয় জেলে নির্বাসিত জীবন যাপন করছিলেন, তিনি ফিরে এলেন। তিনি এখন চরমপন্থী রাজনীতি ছেড়ে হোম রুল বা স্বায়ত্তশাসনের জন্য প্রচার শুরু করেছিলেন। ইংলণ্ডের বিখ্যাত ভারতহিতৈষী মহিলা মিসেস অ্যানি

বেসান্ট-ও এদেশে হোম রুলের জন্য প্রচার চালাচ্ছিলেন। নরমপন্থীরা স্বায়ত্তশাসনের সমর্থক হওয়ায় এখন কংগ্রেসে আর নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের দ্বন্দ্ব ছিল না, কংগ্রেস এক হয়েছিল।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে **মুসলিম লীগ** নামে মুসলমানদের একটি রাজনৈতিক সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সংস্থা ইংরেজদের তোষণ করত এবং কংগ্রেসকে হিন্দুদের প্রতিষ্ঠান ব'লে প্রচার চালাত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে জার্মানীর পক্ষে যোগ দিয়েছিল। তুরস্কের স্থলতান ছিলেন মুসলমানদের **খলিফা** বা ধর্মনেতা। তুরস্কের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ চলায় মুসলমানরা ইংরেজদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছিল এবং মুসলিম লীগ ইংরেজ তোষণের পথ ছেড়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কথা ভাবছিল। তাই ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে মুসলিম লীগ এক যোগে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য কংগ্রেসের সঙ্গে একটি চুক্তি করল।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে আরও একটি ঘটনা ঘটল। মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসে যোগ দিলেন। মহাত্মা গান্ধীর পুরো নাম মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। তিনি ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে পোরবন্দরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।


মহাত্মা গান্ধী

বিলাতে গিয়ে তিনি ব্যারিস্টার হন এবং স্বদেশে ফিরে এলে দক্ষিণ আফ্রিকায় কিছু ভারতীয় ব্যবসায়ীর মামলা চালাবার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকায় যান। দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সরকার ভারতীয়দের কৃষ্ণাঙ্গ বলে খুবই ঘৃণা করত এবং তাদের উপর নানাভাবে অবিচার ও অত্যাচার চালাত। গান্ধীজী শ্বেতাঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের ঐক্যবদ্ধ ক'রে তোলেন। ভারতীয়রা ছিল নিরস্ত্র ও দুর্বল ; তাই তিনি শক্তিমান সশস্ত্র শ্বেতাঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে

সংগ্রামের জন্য অহিংস পন্থা অবলম্বন করেন। তাঁর এই অহিংস পন্থা **সত্যাগ্রহ** নামে পরিচিত। অহিংস পন্থায় সংগ্রাম চালিয়ে তিনি বিজয়ী হন এবং শ্বেতাঙ্গ সরকারকে কৃষ্ণাঙ্গদের বহু ন্যায্য দাবী মেনে নিতে বাধ্য করেন। গান্ধীজী ভারতে ফিরে নিরস্ত্র ভারতবাসীদেরও অহিংস সংগ্রামে উদ্‌বুদ্ধ করলেন। অল্পকালের মধ্যেই তিনি ভারতের শ্রেষ্ঠ নেতা হয়ে উঠলেন। গান্ধী অহিংসায় বিশ্বাসী হ'লেও, বিপন্ন শত্রু ইংরেজদের যুদ্ধে সাহায্য করেন।

ভারতীয় নেতাদের আশা ছিল, যুদ্ধশেষে ইংরেজরা ভারতীয়দের স্বায়ত্তশাসনের দাবি মেনে নেবে। যুদ্ধের শেষে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতসচিব মন্টেগু ও ভারতের বড় লাট লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড ভারতবর্ষের শাসনব্যবস্থার কিছু সংস্কার সাধন করলেন। এই শাসন-সংস্কার তাঁদের নাম অনুসারে **মণ্ট-ফোর্ড** শাসন-সংস্কার নামে পরিচিত। এই শাসন-সংস্কারে বড়লাটের শাসন-পরিষদে আরও একজন ভারতীয় সদস্য নেওয়া হ'ল এবং কেন্দ্র ও প্রদেশের আইন-সভাগুলিতে নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যা মনোনীত সদস্যের চেয়ে বাড়ানো হ'ল। প্রদেশে গভর্নরের শাসন-পরিষদ রইল। এই শাসন-পরিষদের হাতেই প্রদেশের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি রইল। গভর্নর আইনসভার সদস্যদের মধ্য থেকে তাঁর মন্ত্রিসভা নির্বাচিত করবেন এবং ঐ মন্ত্রি-সভার হাতে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতির মতো সাধারণ বিষয় থাকবে। এই শাসন-সংস্কারে কংগ্রেস সন্তুষ্ট হ'ল না, প্রকৃত স্বায়ত্তশাসন দাবি করল।

**অসহযোগ আন্দোলন :** যুদ্ধের ফলে দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থা চরমে পৌঁছেছিল। তাই দেশবাসীর মনে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল। এই বিক্ষোভ দমনের জন্য ইংরেজ সরকার এই সময় বিচারপতি **রাউলাটকে** দিয়ে একটি বিল আনাল। এই বিল **রাউলাট বিল** নামে পরিচিত। এতে বিনা বিচারে ভারতীয়দের আটক করার ব্যবস্থা রইল। এই বিলের বিরুদ্ধে ভারতবাসী প্রতিবাদ জানাল। গান্ধীজী সারা দেশে হরতাল ডাকলেন। হরতালের সময় পুলিস গুলি

চালাল। তাতে দিল্লীতে, বোম্বাইয়ে ও অমৃতসরে বহু লোক মারা গেল। সরকার সামরিক আইন জারি ক'রে পাঞ্জাবের উপর অকথ্য অত্যাচার করল। তাতেই সে ক্ষান্ত হ'ল না, অমৃতসরে **জালিয়ান-ওয়ালাবাগ** নামে এক প্রাচীরবেষ্টিত ময়দানে বৈশাখী পূর্ণিমার মেলায় সমবেত নিরীহ নরনারী ও শিশুর উপর গুলি চালাল। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে প্রায় ছ'শ লোক নিহত ও বহু হাজার লোক আহত হ'ল। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কথা যখন জানা গেল, তখন সারা ভারত ঘৃণায় ও ক্ষোভে ফেটে পড়ল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক মিত্রশক্তির হাতে পরাজিত হয়েছিল। তাই ইংলণ্ড ও মিত্রশক্তির অন্যান্য রাষ্ট্র তুরস্কের স্থলতানকে তাঁর সাম্রাজ্য থেকে বঞ্চিত করেছিল। খালিফার প্রতি এই অবিচারের বিরুদ্ধে মুসলিম লীগ **খিলাফত** আন্দোলন শুরু করল।

ইংরেজ সরকারের এইসব অবিচার, অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য গান্ধীজী **অসহযোগ** আন্দোলনের ডাক দিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের মূলকথা হ'ল ইংরেজ সরকারের সঙ্গে কোনও প্রকারে সহযোগিতা করা চলবে না। খিলাফত আন্দোলনকেও অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করা হ'ল।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজী **অহিংস অসহযোগ** আন্দোলন শুরু করলেন। তিনি ইংরেজ সরকারের সঙ্গে সকল প্রকার সহযোগিতা বন্ধ ক'রে বৃটিশ শাসনকে অচল ক'রে দেওয়ার সংকল্প নিলেন। এতদিন কংগ্রেসের আন্দোলন সমাজের শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এখন গান্ধীজীর নেতৃত্বে কৃষক, শ্রমিক, সকল শ্রেণীর মানুষই এই সংগ্রামে কংগ্রেসের পতাকাতলে সমবেত হ'ল। উকিল-ব্যারিস্টাররা বিচারালয় বর্জন করলেন। ছাত্ররা স্কুল-কলেজ পরিত্যাগ করল; দেশের সর্বত্র ধর্মঘট পালিত হ'ল। বিলাতী বস্ত্র এবং বিলাতী দ্রব্য বর্জন ক'রে দেশীয় বস্তু গ্রহণের ধুম পড়ে গেল। স্থানে স্থানে বিলাতী কাপড় ও বিদেশী পোশাক রাশি ক'রে পোড়ানো হল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু প্রভৃতি বহু

নেতা গ্রেপ্তার হলেন। হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক কারারুদ্ধ হ'ল। সরকার কঠোর দমননীতি চালাল। জনসাধারণের মধ্যে ক্রমেই উত্তেজনা দেখা দিল। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে যুক্তপ্রদেশের গোরখপুরের কাছে **চৌরিচৌরা** নামে এক স্থানে উত্তেজিত জনতা থানা পুড়িয়ে দিল এবং প্রায় ২২ জন পুলিশকে হত্যা করল। আন্দোলন হিংসার পথ নিচ্ছে দেখে, গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার ক'রে নিলেন। আন্দোলন থেমে গেলে ইংরেজ সরকার গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করল। বিচারে তাঁর ছ বছরের কারাদণ্ড হ'ল। অবশ্য, কিছুদিন পরেই তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহৃত হওয়ায় স্বাধীনতা আন্দোলনের গতি সাময়িকভাবে মন্দীভূত হ'ল। ইতিমধ্যে তুরস্কের স্থলতানকে সিংহাসনচ্যুত ক'রে মুস্তাফা কামাল পাশা তুরস্কে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাই মুসলিম লীগও ইংরেজ বিরোধিতার পথ ত্যাগ করল। খিলাফত আন্দোলন বন্ধ হয়েছিল। এখন তারা সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াতে লাগল। উত্তর ভারতের নানা জায়গায় হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও হ'ল।

গান্ধীজী হঠাৎ অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার ক'রে নেওয়ায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, পণ্ডিত মতিলাল নেহ্রু প্রভৃতি নেতারা আইনসভায় প্রবেশ ক'রে সরকারের কাজে বাধা সৃষ্টির নীতি নিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে তাঁরা **স্বরাজ্য দল** নামে একটি দল গঠন করলেন। এই দলের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভায় প্রবেশ ক'রে সরকারের কাজের বিরোধিতা করতে থাকেন এবং সরকারের কাজের অন্যায় ও অযৌক্তিক দিকগুলি জনসাধারণের কাছে তুলে ধরেন। তাতে সরকার খুবই বিব্রত বোধ করল। কিন্তু এতে ভারতবাসীর স্বায়ত্তশাসনের দাবি পূর্ণ হল না।

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের রাজনৈতিক দলগুলি দিল্লিতে ভারতের ভাবী শাসনতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনার জন্য পণ্ডিত মতিলাল নেহ্রুর নেতৃত্বে একটি কমিটি নিয়োগ করেন। ঐ কমিটির রিপোর্টে পূর্ণ

স্বাধীনতার পরিবর্তে ডোমিনিয়ন স্টেটাস বা স্বায়ত্তশাসন দাবি করা হয়। কিন্তু জহরলাল নেহরু ও সুভাষচন্দ্রের মতো তরুণ নেতারা পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করেন। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে লাহোরে জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, তাতে কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করে।

**আইন অমান্য আন্দোলন** ঃ ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজী লবণ আইন অমান্য ক'রে এই আন্দোলনের সূচনা করলেন। জনসাধারণকে লবণের উপর কর দিতে হত। লবণ তৈরী করাও বে-আইনী ছিল। গান্ধীজী আরব সাগরের তীরে ডাণ্ডিতে লবণ তৈরী করে লবণ আইন অমান্য করলেন। গান্ধীজীর লবণ আইন অমান্য করার সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশে লবণ তৈরী ক'রে আইন অমান্য করা শুরু হ'ল। সেই সঙ্গে চলল হরতাল, মিছিল, পিকেটিং ও বিদেশী বর্জন। ঘরের মেয়েরাও এবার এই আন্দোলনে অংশ নিল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে দুর্ধর্ষ পাঠানরাও অহিংস মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে এই আন্দোলনে অংশ নিল। সরকারও চূড়ান্ত দমননীতির আশ্রয় নিল। বড় বড় নেতারা সকলে কারারুদ্ধ হলেন। জরুরী আইন, ঘোষিত হ'ল। সারা দেশে প্রায় এক লক্ষ স্বেচ্ছাসেবক বন্দী হলেন—লাঠি ও গুলি চলল। পুলিসের গুলিতে শতাধিক লোক মরল, কয়েক হাজার লোক আহত হ'ল।

যখন আন্দোলন চলছিল, তখন ইংলণ্ডে একটি গোল-টেবিল বৈঠক বসল। ঐ বৈঠকে কংগ্রেস যোগদান না করায় বৈঠক ব্যর্থ হ'ল। গান্ধীজীসহ বড় বড় কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি দেওয়া হ'ল এবং বড় লার্ট লর্ড আরউইন গান্ধীজীর সঙ্গে একটা চুক্তি করলেন। ঐ চুক্তি অনুসারে সরকার রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিল ও দমননীতি বন্ধ রাখল, কংগ্রেসও আন্দোলন বন্ধ রাখল। কংগ্রেস এবার গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দিতে স্বীকৃত হ'ল। কংগ্রেসের এক-মাত্র প্রতিনিধিরূপে গান্ধীজী গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দিতে বিলাতে গেলেন। কিন্তু মুসলমান প্রতিনিধিরা সাম্প্রদায়িক দাবি

উথাপন করায় কোন মীমাংসা হ'ল না। রিক্তহস্তে গান্ধীজী দেশে ফিরে এলেন।

গান্ধীজী ফেরার সঙ্গে সঙ্গে আবার আন্দোলন শুরু হ'ল। গান্ধীজী ফেরার আগেই ইংরেজ সরকার দমননীতি শুরু করেছিল। জওহরলাল ও খান আবদুর গফুর খানকে গ্রেপ্তার করেছিল। বাংলাদেশ, যুক্তপ্রদেশ ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে নৃশংস অত্যাচার চালিয়েছিল। আন্দোলন আবার শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দমননীতি কঠোর থেকে কঠোরতর ক'রে তুলল। গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করা হ'ল। লাঠি, গুলি, জেল, জরিমানা, ধরপাকড় ব্যাপকভাবে চলল। দেশের জনসাধারণও ক্রমেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। দেশে আবার সন্ত্রাসবাদীরা সক্রিয় হয়ে উঠলেন। বাংলাদেশে সূর্য সেন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ক'রে ইংরেজদের সঙ্গে সশস্ত্র লড়াই করলেন। বিনয়-বাদল-দীনেশের হস্তে ইংরেজরা ও পদস্থ কর্মচারীরা নিহত হ'ল। পাঞ্জাবের ভকত সিংহ অভিযুক্ত হয়ে ফাঁসিতে প্রাণ দিলেন। ইংরেজরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। গান্ধীজী সন্ত্রাসবাদের প্রতিবাদে অনশন করায় সরকার তাঁকে মুক্তি দিল। আইন অমান্য আন্দোলনে ভাটা পড়েছিল। তাই কংগ্রেস আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিল।

**কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ ঃ** বৃটিশ সরকার কঠোর দমননীতি চালালেও ভারতবাসীকে শান্ত করার জন্য ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারত-শাসন আইন পাস করে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করল। এতে ভারতবর্ষকে ১১টি প্রদেশে ভাগ করা হ'ল। প্রদেশগুলিতে দায়িত্বশীল সরকার গঠনের সুযোগ দেওয়া হ'ল। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্রে ঐরূপ দায়িত্বশীল সরকার গঠনের সুযোগ না দেওয়ায় কংগ্রেস এই আইনের যুক্তরাষ্ট্রীয় অংশ গ্রহণ করল না। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ভিত্তিতে মুসলমান, বর্ণহিন্দু, তপশিলী হিন্দু প্রভৃতির জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা চালু হ'ল। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে এই শাসন-সংস্কার অনুসারে দেশে যে নির্বাচন হ'ল, তাতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে কংগ্রেস নয়টি প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠিত হ'ল। কেবলমাত্র পাঞ্জাব ও বাংলাদেশে

মুসলিম লীগের নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠিত হ'ল। কংগ্রেস বিপুল সংখ্যা-গরিষ্ঠতা পাওয়ায় কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে তিক্ততা তীব্রতর হয়ে উঠল। মুসলিম লীগ কংগ্রেস শাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হ'ল এবং মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র পাকিস্তানের দাবি তুলল।

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হ'ল। বড়লাট লর্ড লিনলিথ্‌গো কংগ্রেসের মতামত না নিয়েই ভারতকে যুদ্ধরত দেশ ব'লে ঘোষণা করলেন। এই যুদ্ধে কংগ্রেস ফাসিস্ট ও নাৎসী শক্তির বিরোধী ছিল। কিন্তু সরকার জনসাধারণের প্রতিনিধিদের মতামত না নিয়ে জনসাধারণের ঘাড়ে যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করল এবং সরকারের এই সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের ফলে এই যুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলে ঘোষণা ক'রে যুদ্ধে অসহযোগিতার নীতি অবলম্বন করল। সরকারী নীতির প্রতিবাদে এবং স্বাধীনতার দাবিতে কংগ্রেস সত্যাগ্রহের পথ নিল।

**ভারত ছাড় আন্দোলন:** এদিকে জাপান ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। জাপানী সৈন্য দ্রুত দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে মালয় ও ব্রহ্মদেশ অধিকার ক'রে নিয়ে ভারতের নিকটে এসে পেঁছিল। এখন ইংরেজ সরকার জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য ভারতবাসীর সমর্থন লাভের আশায় রাজনৈতিক আপোস-মীমাংসা করতে চাইল। বৃটিশ মন্ত্রীসভার অন্যতম মন্ত্রী **স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স্** আপোস-আলোচনার জন্য ভারতে এলেন। তিনি ভারতের স্বাধীনতার কথা কিছু বললেন না। তিনি বললেন, যুদ্ধের পরে ভারতের ভাবী সংবিধান রচনার জন্য একটি গণ-পরিষদ গঠন করা হবে। সেই সংবিধান অনুসারে যে নূতন রাষ্ট্র হবে, তাতে ভারতের কোন অংশ ইচ্ছা করলে যোগ না দিতেও পারবে। এতে পাকিস্তানের কথা আভাসে বলা হলেও স্পষ্টভাবে তা বলা হ'ল না। সেজন্য মুসলিম লীগ এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করল। পাকিস্তানের কথা আভাসে বলায় ও স্বাধীনতার কথা কিছু না বলায় কংগ্রেস এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স্ ব্যর্থ হয়ে দেশে ফিরলেন।

ইংরেজরা ভারতকে জাপানের হাত থেকে রক্ষার ধুয়ো তুলেছিল। গান্ধীজী বললেন, ভারতের সঙ্গে জাপানের বিবাদ নেই, জাপানের বিবাদ ইংলণ্ডের সঙ্গে। ইংরেজরা ভারত ছেড়ে গেলে জাপান ভারত আক্রমণ করবে না। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে গান্ধীজীর নেতৃত্বে বোম্বাই অধিবেশনে কংগ্রেস 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব গ্রহণ করল। সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজীসহ জওহরলাল নেহরু, আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ সব বড় নেতা বন্দী হলেন। কংগ্রেস বেআইনী ঘোষিত হ'ল। নেতাদের গ্রেপ্তারের সংবাদে সারা দেশে প্রচণ্ড উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল এবং গণবিদ্রোহ দেখা দিল। বিদ্রোহীরা রেলস্টেশন, ডাকঘর, থানা পুড়িয়ে দিল। টেলিগ্রাফের তার কেটে, রাস্তাঘাট নষ্ট ও অবরোধ ক'রে যোগাযোগ-ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করল। কোথাও কোথাও স্বাধীন সরকারও গড়ে তুলল। পুলিশ ও সেনাবাহিনী বেপরোয়া গুলি চালিয়ে বহু লোককে হত্যা ও জখম করল। বহু লোককে জেলে আটক করল, পাইকারী জরিমানা বসালো, নৃশংস অত্যাচার চালাল এবং শেষ পর্যন্ত তারা কঠোর হস্তে এই আন্দোলন দমন করল। কিন্তু দেশবাসী ভয়ংকরভাবে বৃটিশবিরোধী হয়ে উঠল।

**আজাদ হিন্দ ফৌজ :** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গোড়াতেই সুভাষচন্দ্র বসুকে তাঁর স্বগৃহে অন্তরীণ করে রাখা হয়েছিল। তিনি গোপনে আফগানিস্থান ও রাশিয়ার পথে জার্মানীতে চলে যান এবং জার্মানী থেকে সাবমেরিনে ক'রে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এসে পৌঁছেন। ইতিমধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাপান-প্রবাসী রাসবিহারী বসু জাপানের হাতে বন্দী বৃটিশ বাহিনীর বন্দী সৈনিক এবং স্থানীয় ভারতীয় যুবকদের নিয়ে **আজাদ হিন্দ ফৌজ** নামে এক সৈন্যবাহিনী গড়ে



নেতাজী সুভাষচন্দ্র

তুলেছিলেন। সুভাষচন্দ্র এসে পৌঁছলে তিনি তাঁর হাতেই এই সৈন্যবাহিনীর ভার দিলেন। সুভাষচন্দ্র এই সৈন্যবাহিনী সুসংগঠিত ও শক্তিশালী ক'রে তুললেন। তিনি আজাদ হিন্দ্ সরকার নামে স্বাধীন ভারতের একটি প্রবাসী সরকার-ও গঠন করলেন। তিনি **নেতাজী** নামে পরিচিত হলেন। জাপান সরকার তাঁকে অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ দিয়ে সাহায্য করতে লাগল। এরপর আরম্ভ হ'ল তাঁর বিখ্যাত **দিল্লী চলো** অভিযান। বৃটিশ বাহিনীকে পরাজিত করে তিনি মনিপুরের রাজধানী ইম্ফল অধিকার করলেন। আজাদ হিন্দ্ ফৌজ আসামের কোহিমা পর্যন্ত অগ্রসর হ'ল। কিন্তু এই সময় যুদ্ধে জাপান হীনবল হয়ে পড়ায় সাহায্য বন্ধ করল। অস্ত্রশস্ত্র ও রসদের অভাব সত্ত্বেও আজাদ হিন্দ্ ফৌজ প্রচণ্ড বিক্রমে লড়াই ক'রে শেষে বৃটিশ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করল।

ইংরেজ সরকার আজাদ হিন্দ্ ফৌজের বন্দী সৈনিকদের বিচারের ব্যবস্থা করলে সারা দেশে উত্তেজনার সৃষ্টি হ'ল। এই দেশ-প্রেমিক সৈনিকদের বীরত্ব ভারতবাসীকে সশস্ত্র সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করল। ভারতীয় নৌবাহিনীতে বিদ্রোহ দেখা দিল। ভারতীয় স্থল ও বিমান বাহিনীতেও বিদ্রোহের পূর্ব লক্ষণ দেখা গেল। ইংরেজ সরকার ভীত হল। তারা বুঝল, ভারতবর্ষকে আর পদানত রাখা সম্ভব হবে না।

**ক্ষমতা হস্তান্তর ও স্বাধীনতা লাভঃ** ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হ'ল। যুদ্ধশেষে ইংলণ্ডে যে সাধারণ নির্বাচন হ'ল, তাতে শ্রমিক দল জয়ী হ'ল। শ্রমিক দলের প্রধানমন্ত্রী ক্লেমেন্ট এটলি প্রধানমন্ত্রী হলেন। ১৯৪৫-৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতেও সাধারণ নির্বাচন হ'ল। কংগ্রেস প্রায় সব ক'টি অমুসলমান আসন পেল, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে বেশির ভাগ মুসলমান আসনও পেল। কংগ্রেস নয়টি প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠন করল।

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য তাঁর তিনজন মন্ত্রীকে ভারতে পাঠালেন। তাঁরা ভাবী সংবিধান গঠনের জন্য একটি **গণ-পরিষদ ও অন্তর্বর্তী সরকার** গঠনের কথা বললেন।

গণপরিষদের নির্বাচনে কংগ্রেস ২১০টি সাধারণ আসনের মধ্যে ১৯৯টি এবং মুসলিম লীগে ৭৮টি মুসলিম আসনের মধ্যে ৭৩টি পেল। গণ-পরিষদে কংগ্রেসে সংখ্যাগরিষ্ঠাতা দেখে মুসলিম লীগ গণ-পরিষদে যোগ দিতে চাইল না। তারা পাকিস্তানের দাবিতে **প্রত্যক্ষ সংগ্রাম** ঘোষণা করল। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নামে কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধল। দাঙ্গা পূর্ববাংলা, ত্রিপুরা, বিহার, যুক্তপ্রদেশ, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে ছড়িয়ে পড়ল। হত্যা ও ধ্বংসের তাণ্ডব চলল। বহু হিন্দু ও মুসলমান নিহত হ'ল, বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি ও ঘর-বাড়ি ধ্বংস হ'ল।


জওহরলাল নেহ্রু

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কেন্দ্রে জওহরলাল নেহ্রুর নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হ'ল। মুসলিম লীগ প্রথমে অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দিতে অসম্মত হ'লেও, পরে যোগ দিল। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় **বড়লাট লর্ড মাউন্টব্যাটেন** ঘোষণা করলেন যে, ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের মধ্যেই ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে। এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করল। কংগ্রেস বাধ্য হ'য়ে দেশবিভাগ মেনে নিল। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে বড়লাট লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারত-বিভাগের পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করলেন। এই মাসে বৃটিশ পার্লামেন্ট একটি আইন পাস করল। ঐ আইন অনুসারে ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হল। আসামের শ্রীহট্ট সহ পূর্ববাংলা, পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ নিয়ে গঠিত হ'ল **পাকিস্থান**। অবশিষ্ট অংশ নিয়ে গঠিত হ'ল **ভারত**। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট ভারত ও পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করল।

## প্রশ্নাবলী

১। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ভারতীয় রাজনীতির অবস্থা কেমন ছিল ?

২। মুসলীম লীগ ইংরেজ-বিরোধিতার পথ কেন নিয়েছিল এবং কেন ঐ পথ ত্যাগ করেছিল ?

৩। অসহযোগ আন্দোলনের বিবরণ দাও।

৪। আইন অমান্য আন্দোলনের বিবরণ দাও।

৫। ভারত ছাড় আন্দোলন সম্পর্কে কি জান ?

৬। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কিভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর হ'ল ? তার কাহিনী লেখ।

৭। আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ও জনমনে তার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে যা জান লিখ।

৮। টীকা লিখ :

(ক) রাউলাট বিল ; (খ) জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড ;
(গ) মণ্টফোর্ড সংস্কার ; (ঘ) ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ভারত-শাসন আইন ;
(ঙ) আগস্ট-বিদ্রোহ ; (চ) আজাদ হিন্দ্ ফৌজ।

৯। সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) কত খ্রীষ্টাব্দ থেকে কত খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অসহযোগ আন্দোলন হয়েছিল ?

(খ) কত খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি ঘোষণা করে ?

(গ) কত খ্রীষ্টাব্দে আগস্ট-বিদ্রোহ হয় ?

(ঘ) কত খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস প্রথম প্রাদেশিক মন্ত্রিসভায় মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে এবং ত্যাগ করে ?

## সপ্তদশ অধ্যায়

# চীনের বিপ্লব

### [ ক ]

ইউ-য়ান সি-কাইকে চীনা প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি ছিলেন ক্ষমতালোভী। তিনি সামরিক একনায়ক হ'তে চাইলেন। তিনি ডাঃ সান ইয়াৎ-সেনের কুয়ো-মিন-তাং পার্টিকে বেআইনী ক'রে দিলেন। ডাঃ সান ইয়াৎ-সেন দক্ষিণ চীনে ক্যান্টনে আবার অভ্যুত্থান ঘটালেন। কিন্তু সে অভ্যুত্থান ব্যর্থ হ'লে তিনি বিদেশে পালিয়ে গেলেন।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধলে জাপান মিত্রপক্ষে যোগ দিল। চীনের শান্-টুং প্রদেশে ছিল জার্মানীর আধিপত্য। জাপান শান-টুংয়ে জার্মানীকে পরাজিত ক'রে শান্-টুং অধিকার করল। এখন সে ইউ-য়ান সি-কাইকে সম্রাট হ'তে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিল এবং চীনের কাছে ২১ দফা দাবি পেশ করল। ইউ-য়ান সি-কাই জাপানের কয়েক দফা দাবি মেনে নিলেন এবং বাকী দাবিগুলি সম্পর্কে আলোচনা চলতে লাগল। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে ইউ-য়ান সি-কাই নিজেকে সম্রাট ব'লে ঘোষণা করলেন। কিন্তু ঐ বৎসরই তাঁর মৃত্যু হ'ল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে মিত্রপক্ষ শান্-টুংয়ে জাপানের অধিকার স্বীকার ক'রে নিল, কিন্তু তার দাবিগুলি সম্পর্কে কোন আলোচনা করল না। এতে জাপান মিত্রপক্ষের প্রতি ক্রুদ্ধ হ'ল। তাই সে পরবর্তী বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির বিরুদ্ধেই যোগ দিয়েছিল।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ সান ইয়াৎ-সেন আবার দক্ষিণ চীনে অভ্যুত্থান ঘটিয়ে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করলেন। তিনি কুয়ো-মিন-তাং দলের আদর্শরূপে তিনটি মূল নীতি প্রচার করলেন—স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও জনসাধারণের জীবিকার অধিকার। তিনি কুয়ো-মিন-তাং দলকে শক্তিশালী করতে চেষ্টা করলেন এবং চীনা প্রজাতন্ত্রকে সুরক্ষিত করার জন্য ইংলণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য চাইলেন। ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাঁকে সাহায্য দিল না। কিন্তু

লেনিন তাঁকে সাহায্য দিতে চাইলেন। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যে সোভিয়েট যুদ্ধবিশারদের দ্বারা শিক্ষা দেওয়ার জন্য চীনে সামরিক শিক্ষালয় খোলা হ'ল। এইভাবে অল্পকালের মধ্যে কুয়ো-মিন্-তাংয়ের একটি সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনীও গড়ে উঠল।

দক্ষিণ চীনে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হ'লেও উত্তর চীনে ঐসময় **তু-চুন** নামে পরিচিত যোদ্ধ-সর্দারের দল আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। তাঁরা রাজধানী পিকিং অধিকারের জন্য নিজেদের মধ্যে ক্রমাগত যুদ্ধ করছিলেন। যোদ্ধ-সর্দার চ্যাং ৎসো-লিন ও তাঁর পুত্র চ্যাং হ্সুয়ে লিয়াং মাঞ্চুরিয়া অধিকার করেছিলেন।

কুয়ো-মিন-তাং দলে একদিকে যেমন দরিদ্র কৃষক, শ্রমিক ও জনসাধারণ ছিল, তেমনি অন্যদিকে ছিল ধনী জমিদার, ব্যবসায়ী ও মিল-মালিক। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে চীনে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। কমিউনিস্টরা কুয়ো-মিন-তাংয়ের মধ্যেই ছিলেন। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে ডাং সান ইয়াৎ-সেনের মৃত্যু হ'ল। এখন কুয়ো-মিন-তাং দলের প্রধান নেতা হলেন ডাঃ সান ইয়াৎ-সেনের শ্যালীপতি চিয়াং কাইশেক। তিনি ধনী, জমিদার, ব্যবসায়ী ও মিল-মালিকদের দ্বারা প্রভাবিত হ'তে লাগলেন এবং ডাঃ সান ইয়াৎ-সেনের নীতির কথা ভুলে গেলেন। এই নিয়ে কুয়ো-মিন্-তাং দলে বামপন্থীদের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ হ'ল। কুয়ো-মিন্-তাং বাহিনী আগেই হ্যাংচাউ অধিকার করেছিল। এখন চিয়াং কাইশেক নানকিং অধিকার করলেন এবং নিজেকে চীনা প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট ব'লে ঘোষণা করলেন। নানকিং হ'ল তাঁর রাজধানী। বামপন্থীরা কুয়ো-মিন্-তাং থেকে বিতাড়িত হলেন।

চিয়াং কাইশেকের কুয়ো-মিন-তাং সরকার দরিদ্র জনসাধারণের কোন সমস্যার সমাধান করতে পারল না। কমিউনিস্ট পার্টি ডাঃ সান ইয়াৎ-সেনের ত্রিনীতিকেই তুলে ধরেছিল। তাই দলে দলে দরিদ্র জনসাধারণ কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিল এবং **মাও জে দং** প্রভৃতি নেতাদের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টি শক্তিশালী হয়ে উঠল। তারা

হোনান ও কিয়াংসি প্রদেশের এক সুবিস্তৃত অঞ্চলে অধিকার বিস্তার করল।

চিয়াং কাইশেক নিজেকে চীনা প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট বলে ঘোষণা করলেও তখন চীনের ছিল ছিন্নভিন্ন অবস্থা। উত্তর চীনে যোদ্ধসর্দাররা আধিপত্য করেছিলেন, মধ্য চীন ছিল কমিউনিস্ট অধিকারে, দক্ষিণ চীনে চলছিল অরাজকতা। এই অবস্থায় চিয়াং কাইশেক কমিউনিস্টদেরই শত্রু বলে মনে করলেন এবং কমিউনিস্টদের উপর প্রবল আক্রমণ চালাতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত চিয়াং কাইশেকের সৈন্যবাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধ অসম্ভব জেনে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ লক্ষ কমিউনিস্ট সপরিবারে আসবাব, তৈজসপত্র, খাদ্য ও গৃহপালিত পশুপক্ষী সঙ্গে নিয়ে বহু দুস্তর নদ-নদী, গিরিকান্তার ও বাধাবিপত্তি অতিক্রম ক'রে প্রায় ছ হাজার মাইল দূরে কান্ স্থ ও শেন্সি প্রদেশে চলে গেলেন।

এদিকে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে জাপান মাঞ্চুরিয়া অধিকার ক'রে সেখানে মাঞ্চুকুয়ো নামে একটি তাঁবেদার সরকার গঠন করল। যোদ্ধ-সর্দার চ্যাং হ্ স্থয়ে লিয়াং মাঞ্চুরিয়া থেকে বিতাড়িত হয়ে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি স্থকৌশলে চিয়াং কাইশেককে অপহরণ ক'রে আনলেন এবং কমিউনিস্টদের সঙ্গে একযোগে জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য চিয়াং কাইশেককে একটি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করালেন।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে জাপান জাতিসংঘের সদস্যপদ ত্যাগ করে চীনের বিরুদ্ধে নির্লজ্জ আক্রমণ শুরু করেছিল। জাপান মাঞ্চুরিয়ার সংলগ্ন হোপে প্রদেশ অধিকার করল। চীনের উপর প্রচণ্ড বোমা বর্ষণ করতে লাগল। চীনের সমগ্র উপকূলভাগে অবরোধ-ব্যবস্থা গড়ে তুলল। নানকিংয়ের উপর বোমাবর্ষণ করতে লাগল। চিয়াং কাইশেক নানকিং থেকে চীনের অভ্যন্তরে চুংকিয়ে রাজধানী সরিয়ে আনলেন। উত্তরে মাঞ্চুরিয়া থেকে ক্যান্টন পর্যন্ত বিস্তৃত চীনের সমুদ্র-উপকূলবর্তী সমস্ত অঞ্চল জাপানের অধিকারে গেল। কুয়ো-মিন্-তাং ও কমিউনিস্টরা প্রাণপন-চেষ্টায় জাপানের বর্বর আক্রমণ ঠেকাতে লাগল। ১৯৩৯

খ্রীষ্টাব্দে এল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। জাপান ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল।

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে জাপান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত হ'ল এবং চীন থেকেও বিতাড়িত হ'ল। জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় কুয়ো-মিন্-তাং ও কমিউনিস্টদের মধ্যে যুদ্ধবিরতি ঘটলেও বিশ্বযুদ্ধ শেষে তাদের মধ্যে আবার যুদ্ধ শুরু হ'ল। কুয়োমিন্-তাং সরকারের দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচার ও কুশাসনে সাধারণ মানুষের দৈন্য-দুর্দশার সীমা ছিল না। তারা কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থক হয়ে উঠল। যুদ্ধের সময়ে কমিউনিস্টরা প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করেছিল এবং কমিউনিস্টরা যুদ্ধবিদ্যায় সুশিক্ষিত ও সুসজ্জিত হয়ে উঠেছিল। তাই যুদ্ধের পর যুদ্ধে কুয়ো-মিন-তাং বাহিনী কমিউনিস্ট বাহিনীর কাছে হারতে লাগল। শহরের পর শহর, প্রদেশের পর প্রদেশ কমিউনিস্টদের অধিকারে গেল। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে মাও জে দং-এর নেতৃত্বে চীনে গণপ্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হ'ল। ঐ বৎসরের শেষাশেষি চিয়াং কাইশেক দলবল নিয়ে চীনের মূল ভূখণ্ড থেকে ফরমোজা দ্বীপে (তাই-ওয়ানে) চলে গেলেন। ফরমোজা দ্বীপ ছাড়া সমগ্র চীনে কমিউনিস্ট শাসন প্রবর্তিত হ'ল।

## প্রশ্নাবলী

১। ইউ-য়ান-সি-কাই কে ছিলেন? তাঁর বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে কি জান?

২। জাপানের সঙ্গে চীনের যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৩। কুয়ো-মিন্-তাংয়ের সঙ্গে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সম্পর্কের বিবরণ দাও।

৪। চীনে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা ও সংগ্রাম এবং চীনে গণপ্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার কাহিনী লিখ।

৫। সংক্ষেপে উত্তর দাও:

(ক) ইউ-য়ান-সি কাই কত খ্রীষ্টাব্দে নিজেকে চীনের সম্রাট বলে ঘোষণা করেছিলেন?

(খ) কত খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ সান ইয়াৎ-সেনের মৃত্যু হয়েছিল ?

(গ) জাপানের বিরুদ্ধে কমিউনিস্টদের সঙ্গে একযোগে যুদ্ধের জন্ম চিয়াং কাইশেককে কে চুক্তিবদ্ধ করিয়েছিলেন ?

(ঘ) কমিউনিস্ট বিপ্লবের সময় চীনে কমিউনিস্টদের প্রধান নেতা কে ছিলেন ?

---

## অষ্টাদশ অধ্যায়

# ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের পর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিপ্লব

## [ খ ]

**ইন্দোচীন ঃ** উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ফ্রান্স চীনের দুর্বলতার সুযোগে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় একটি সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল। এই সাম্রাজ্য **ইন্দোচীন** নামে পরিচিত। এর মধ্যে ভিয়েটনাম, লাওস ও কাম্বোডিয়া রাজ্যগুলি ছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে জাপান ইন্দোচীন পদদলিত ক'রে মালয় ও ব্রহ্মদেশে অভিযান করেছিল। ফ্রান্সের দুর্বলতার সুযোগে ইন্দোচীনে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গ'ড়ে উঠেছিল। এই আন্দোলনের মধ্যে কমিউনিস্টরাও ছিলেন। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান পরাজিত হ'লে ফ্রান্স আবার ইন্দোচীনে আধিপত্য বিস্তার করতে চাইল। ফলে ফ্রান্স ও ইন্দোচীনের মধ্যে যুদ্ধ বাধল। এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিশ্বজনমত গড়ে উঠল। তবু যুদ্ধ ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চলল। অবশেষে ভারতের চেষ্টায় জেনেভা সম্মেলনে একটি চুক্তি অনুসারে এই যুদ্ধের অবসান ঘটল।

চুক্তি অনুসারে স্থির হয় যে, লাওস ও কাম্বোডিয়ায় অবাধ নির্বাচন হবে এবং নির্বাচনের ভিত্তিতে স্বাধীন সরকার গঠিত হবে। ভারতের নেতৃত্বে গঠিত একটি কমিশনের তদারকিতে লাওস ও কাম্বোডিয়ায় নির্বাচন হয় এবং নির্বাচনের ভিত্তিতে স্বাধীন সরকার গঠিত হয়। ফরাসী বাহিনী লাওস ও কাম্বোডিয়া ত্যাগ করে।

কিন্তু ভিয়েটনাম নিয়ে সমস্যা দেখা দিল। ভিয়েটনামের উত্তরাংশে **হো চি মিনের** নেতৃত্বে কমিউনিস্টরা খুবই শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। তারা ভিয়েটনামের উত্তরাংশে কমিউনিস্ট সরকার গঠন করেছিল। দক্ষিণ-অংশে **বাও দাই ও দিয়েন-দিয়েমের** নেতৃত্বে ফরাসী-সমর্থিত সরকার গঠিত হয়েছিল। জেনেভা চুক্তিতে অবাধ নির্বাচনের দ্বারা উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েটনামের মিলন ও ঐক্যবদ্ধ ভিয়েটনামে জনপ্রিয় সরকার প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছিল। দক্ষিণ ভিয়েটনামেও কমিউনিস্টরা প্রবল ছিল। তাই বাও দাই বা দিয়েন-দিয়েম নির্বাচনে রাজী হলেন না।

উত্তর ভিয়েটনাম দক্ষিণ ভিয়েটনামকে আক্রমণ করবে, এই অজুহাতে দক্ষিণ ভিয়েটনাম আমেরিকার সাহায্য চাইল। কমিউ-নিস্টদের সম্প্রসারণ-রোধের জন্য আমেরিকা অস্ত্রশস্ত্র, পরামর্শদাতা ও সৈন্য দিয়ে ভিয়েটনামকে সাহায্য করতে লাগল। উত্তর ভিয়েটনামের কমিউনিস্ট রাষ্ট্রকে রক্ষার জন্য সেভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র ও চীন সাহায্য দিতে লাগল। এইভাবে ভিয়েটনাম একটি দীর্ঘস্থায়ী রণক্ষেত্র হয়ে উঠল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েটনাম যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল। বিদেশে যুদ্ধে বহু মার্কিন সৈন্য নিহত হওয়ায় আমেরিকায় বিক্ষোভ দেখা দেয়। অবশেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সৈন্য প্রত্যাহার করে এবং দক্ষিণ ভিয়েটনামও কমিউনিস্ট অধিকারে যায়। এইভাবে উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েটনাম ঐক্যবদ্ধ হয়।

লাওস এবং কাম্বোডিয়াতেও দীর্ঘদিন ধরে কমিউনিস্টরা সংগ্রাম চালাচ্ছিল। পরে লাওস ও কাম্বোডিয়াতেও কমিউনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

**ব্রহ্মদেশ** : ব্রহ্মদেশ বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তা জাপানের পদানত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান পরাজিত হ'লে ব্রহ্মদেশে স্বাধীনতা আন্দোলন প্রবলতর হয়ে ওঠে। বৃটিশ সরকার ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেওয়ার সময় ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশকেও স্বাধীনতা দেয়।

**মালয়েশিয়া ঃ** মালয় উপদ্বীপের ন'টি রাজ্য এবং পেনাং ও মালাক্কা নিয়ে মালয়েশিয়া গঠিত। মালয়েশিয়া বৃটিশ শাসনাধীনে ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে জাপান মালয়েশিয়া অধিকার করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ের ফলে জাপান মালয়েশিয়া ত্যাগ করল। বৃটেন আবার মালয়েশিয়ায় আধিপত্য বিস্তার করল। মালয়েশিয়াবাসী এর বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম শুরু করল। অবশেষে, ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে মালয়েশিয়া স্বাধীনতা পায়। মালয়েশিয়ায় স্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

**ইন্দোনেশিয়া ঃ** সপ্তদশ শতাব্দীতে হল্যাণ্ড পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের যবদ্বীপ, সুমাত্রা, বলী, মোলাক্কাস ও বোর্নিও দ্বীপের কিছু অংশ অধিকার ক'রে এখানে একটি ওলন্দাজ সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল। প্রায় সাড়ে তিন শ বছর ওলন্দাজরা এখানে রাজত্ব করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ওলন্দাজ ও মার্কিন বাহিনীর প্রতিরোধ সত্ত্বেও জাপান ইন্দোনেশিয়া অধিকার করে (১৯৪২ খ্রীঃ)। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে জাপানের পরাজয়ের পর ওলন্দাজরা আবার ইন্দোনেশিয়ায় প্রাধান্য বিস্তার করতে চায়। কিন্তু ইন্দোনেশীয়রা ওলন্দাজদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাতে থাকে। ওলন্দাজদের সঙ্গে ইন্দোনেশীয়দের যুদ্ধ চলে। ভারত এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায় এবং ভারতের চেষ্টায় ইন্দোনেশিয়ার প্রশ্ন সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জে উত্থাপিত হয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নির্দেশে ওলন্দাজরা এই যুদ্ধ বন্ধ ক'রে ইন্দোনেশিয়া ত্যাগ করে। এইভাবে স্বাধীন ইন্দোনেশিয়া রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ঘটে।

## প্রশ্নাবলী

১। ভিয়েটনামে বিপ্লবের কাহিনী সংক্ষেপে লেখ।

২। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রহ্মদেশ, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা লাভের বিবরণ দাও।

৩। সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ

(ক) হো চি মিন্ কে ?

(খ) ইন্দোনেশিয়া কত খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীনতা লাভ করে ?

(গ) ব্রহ্মদেশ কত খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীনতা লাভ করে ?

## উনবিংশ অধ্যায়

# জাতীয়তাবাদের বিকাশ : আটলাণ্টিক সনদ : সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলার সময়ে ইংলণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশগুলি প্রচার করছিল যে, জার্মানী, ইটালি ও জাপান ফাসিবাদী দেশ ; এরা সাম্রাজ্যবাদী, এরা অপর দেশের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে না। এরা মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারে বিশ্বাস করে না। এদের বিরুদ্ধে মিত্রশক্তির যুদ্ধ স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের যুদ্ধ। মিত্রশক্তির এই প্রচার পরাধীন দেশের মানুষকে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছিল। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশগুলির সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দেশগুলিতে স্বাধীনতা সংগ্রাম তীব্রতর হয়েছিল। দৃষ্টান্ত আমাদের ভারতবর্ষ।

যুদ্ধের সময়ে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি তাদের অধীন দেশগুলির ধনসম্পদ ও জনবল দেশবাসীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও ব্যবহার করেছিল। পরাধীন দেশগুলিতে যেমন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছিল, তেমন খাদ্যাভাব ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব ঘটেছিল। অনেক সময় শত্রু-বিমান পরাধীন দেশগুলির সঙ্গে শত্রুতা না থাকা সত্ত্বেও বোমাবর্ষণ করছিল, নির্বিচারে মৃত্যু ও ধ্বংস ঘটাচ্ছিল। এইসব নানা কারণে পরাধীন দেশগুলিতে অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল।

**আটলাণ্টিক সনদ :** ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে যখন ইংলণ্ড কমিউনিস্ট ও নাৎসী বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করছিল, তখন নিউ-ফাউণ্ডল্যাণ্ডের অদূরে আটলাণ্টিক মহাসাগরের বক্ষে ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী **উইনস্টন চার্চিল** ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট **ফ্রাংকলিন রুজভেল্ট** মিলিত হয়েছিলেন। তাঁরা তাঁদের মতাদর্শ

সম্পর্কে একটি যৌথ বিবৃতি দেন। এই বিবৃতিতে কতকগুলি মূলনীতি তুলে ধরা হয়। এই মূল নীতিগুলিই **আটলাণ্টিক সনদ** নামে পরিচিত। এতে বলা হয়, ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অপরের দেশ অধিকার বা অপরের দেশে প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা করবে না; স্থানীয় অধিবাসীদের ইচ্ছা ছাড়া কোনও দেশের আঞ্চলিক পরিবর্তন ঘটাবে না; সকল দেশকে আপন আপন ইচ্ছামতো যে কোন প্রকার শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করতে দেবে; বিজয়ী ও বিজিত সকল দেশকেই ব্যবসায়িক ও অর্থনৈতিক উন্নতির সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা দেবে ইত্যাদি। এই সনদে সকল দেশের মানুষের স্বাধীনতা ও জাতিসমূহের স্বাধিকারকে স্বীকার ক'রে নেওয়া হয়। এই সনদের ফলশ্রুতি রূপেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সৃষ্টি হয়।

**সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ**ঃ পৃথিবীতে যুদ্ধ নিবারণ ও স্থায়ী শান্তিরক্ষার জন্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে **জাতিসংঘ** প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তেমনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলার সময়েই ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সূচনা হয়। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদ রচিত হয়। এইভাবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠা ঘটে। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে এর সদস্য-সংখ্যা ছিল প্রায় ৬০। এখন প্রায় সকল স্বাধীন দেশই এর সদস্য।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ **সাধারণ পরিষদ, নিরাপত্তা পরিষদ, আন্তর্জাতিক আদালত,** আন্তর্জাতিক **শ্রমিক সংগঠন, শিক্ষা-বিজ্ঞান-সংস্কৃতি সংস্থা, কৃষি সংস্থা** প্রভৃতি নানা বিভাগে বিভক্ত। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে একটি **সচিবালয় বা সদর দপ্তর** আছে। এই সদর দপ্তর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক সহরে অবস্থিত। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কার্য পরিচালনা করেন **প্রধান সচিব**। জাতিসংঘের মতোই এরও আন্তর্জাতিক আদালত দি হেগে অবস্থিত।

সকল সদস্য-রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের নিয়ে সাধারণ পরিষদ গঠিত। সাধারণ পরিষদের ১৫টি সদস্য-রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদ গঠিত। এই সদস্যদের মধ্যে পাঁচজন স্থায়ী সদস্য—এঁরা মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও চীনের প্রতিনিধি। বাকী দশজন সদস্য পর্যায়ক্রমে সাধারণ পরিষদ থেকে তিন বছরের জন্য নির্বাচিত হন। নিরাপত্তা পরিষদে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে হ'লে পাঁচজন স্থায়ী-সদস্যেরই সম্মতি লাগে। কোন একজন স্থায়ী সদস্য অসম্মতি প্রকাশ করলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় না। নিরাপত্তা পরিষদ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সর্বাধিক শক্তিশালী শাখা। যুদ্ধ-নিবারণ, পরদেশ আক্রমণে বাধাদান, শান্তিরক্ষা প্রভৃতি এর কাজ। জাতিসংঘের নিজস্ব সৈন্যবাহিনী না থাকায় আক্রমণকারী বা যুধ্যমান দেশকে সে যুদ্ধ থেকে বিরত করতে পারত না। কিন্তু নিরাপত্তা পরিষদের নিজস্ব সৈন্যবাহিনী আছে এবং তা বিবাদমান দেশগুলিতে শান্তিরক্ষার কাজে প্রায়ই ব্যবহৃত হয়।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ জাতিসমূহের উন্নতিকল্পে নানারূপ সাহায্য দেয়। শিক্ষা-সংস্কৃতির বিস্তার, সুস্থ জীবন ও সমাজ গঠন প্রভৃতির কাজেও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ আত্মনিয়োগ করে।

## প্রশ্নাবলী

১। আটলান্টিক সনদ বলতে কি বোঝ? ঐ সনদের কয়েকটি প্রধান মূলনীতি সম্পর্কে লেখ।

২। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠা ও সংগঠন সম্পর্কে যা জান লেখ।

৩। নিরাপত্তা পরিষদের গঠন ও কার্যাবলীর বিবরণ দাও।

৪। সংক্ষেপে উত্তর দাও:

(ক) আটলান্টিক সনদ কোথায় কত খ্রীষ্টাব্দে কাদের দ্বারা ঘোষিত হয়েছিল?

(খ) নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য-সংখ্যা এবং স্থায়ী সদস্য-সংখ্যা কত?

(গ) নিরাপত্তা পরিষদে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য অবশ্য-প্রয়োজনীয় কি?

———